দিলীপকুমার রায়

অঘটনের শোভাযাত্রা

অঘটনের শোভাযাত্রা

অঘটনের সূত্রপাত

করুণা অলৌকিকী

আমাদের চোখে দেখা জগতের আড়ালে আর এক বৃহৎ জগৎ আছে। সে জগতের সন্ধান আমরা বড় একটা রাখি না, এমনকি সে জগতের অস্তিত্বেও আমাদের গভীর সংশয় দেখা যায়। কিন্তু সে জগতের স্পর্শ যাঁরা পান, তাঁরা অবিশ্বাসীর চোখের সামনে থেকে কখনো কখনো অপরিচয়ের আবরণখানা সরিয়ে দেন। তখন আমাদের বহু পোষিত সংশয়-গ্রন্থি সহসা ছিন্ন হয়ে যায়। আমরা সবিস্ময়ে দেখি আমাদের ঘিরে অঘটনের কি বিচিত্রা লীলা!

এই গ্রন্থের তিনটি কাহিনীই আমাদের অবিশ্বাসের ভিত্তিমূলকে নাড়া দিয়ে জানায়, আমাদের জ্ঞানের গণ্ডীর বাইরে এক বিপুল শক্তি রয়েছে, যা অলক্ষ্যে থেকে আমাদের সমগ্র জীবনের উপর তার গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

AGHATANER SOVAJATRA
AGHATANER SUTRAPAT
KARUNA ALOUKIKI
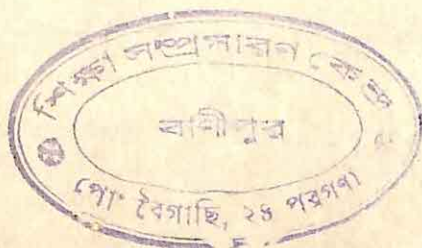
দিলীপকুমার রায়ের

॥ অন্যান্য গ্রন্থ ॥

রমন্যাস

অঘটন আজো ঘটে। অভাবনীয়। অঘটনের ঘটা।
অঘটনের পূর্বরাগ। গল্পরাগমালা*। প্রেমল বৈরাগী*।

উপন্যাস

ভাবি এক হয় আর। দোটানা। দ্বিচারিণী। তরঙ্গরোধিবে কে।
দোলা। ধূসরে রঙিন। ছায়ার আলো।

নাটক

ভিখারিণী রাজকন্যা মীরাবাই। আপদ*। জলাতঙ্ক*।
শাদাকালো*। শ্রীচৈতন্য। মীরা বৃন্দাবনে।

কবিতা

অনামী। মধুমুরলী*। কৃষ্ণ কথা কাহিনী

প্রবন্ধাদি

মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল। তীর্থংকর। স্মৃতিচারণ [দুই খণ্ডে]।
দেশে দেশে চলি উড়ে। ভ্রাম্যমাণ। সাঙ্গীতিকী। ছান্দসিকী*।

স্বরলিপি

সুরবিহার [দুই খণ্ডে]। দ্বিজেন্দ্র গীতি। হাসির গানের স্বরলিপি।

* চিহ্নিত গ্রন্থগুলি যন্ত্রস্থ বা শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হবে।

দিলীপকুমার রায়

অঘটনের শোভাযাত্রা
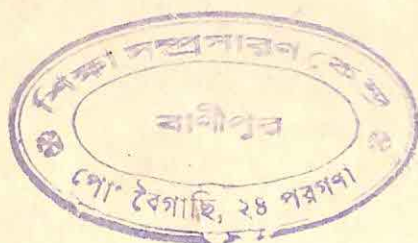
অঘটনের সূত্রপাত

করুণা অলৌকিকী

উৎসর্গ

শ্রীমৎ অনির্বাণ পূজনীয়েষু,

করে আপনার দিতে চাই উপহার
সত্যভিত্তি বিচিত্র এ-কাহিনী।
আশা রাখি— যিনি রসিক ভাবুক যোগী
একাধারে, স্নেহভরে পড়িবেন তিনি।

গল্পের এই আছে এক মহাগুণ :
প্রতি চরিত্রে তাহার পাঠক পায়।
আপনারে খুঁজে যেন। দিদিমার কাছে
তাই প্রতি শিশু গল্প শুনিতে চায়।

শুনি বীরবাণী উঠি বীরত্বে ত্বলি'।
প্রেমীর ব্যথায় ঝরাই নয়নধারা।
ভক্তের স্তব শুনিয়া ভক্তিরাগে
অন্তর হয় উছাসে আত্মহারা।

পাপী-তাপীদেরও আঁকার সার্থকতা
আছে কথিকায় : কালের পটে উজলি'
ওঠে বরেণ্য আলো-ছবি, বেসুরার
ঝন্‌ঝনে আরো মধুর বাজে মুরলী।

শুধু তাই নয়—মলিন পাপী-তাপীও
বহে নির্মল পুণ্য-জীবন-তৃষা।
দীনহীন দুরাচারেরো কান্নাবুকে
ফোটে তাই মহাজনের মন্ত্রদিশা।

এ যে নয় শুধু কথার-কথা—এ-যুগে
কার কাছে ব্যথা-ক্লিষ্ট শুনিবে হায়—
যদি ভাগবত সাধক কৃপার বাণী
তার সাধনার অঙ্গীকারে না গায় ?

এই সাধনার প্রবাহ চিরন্তন
দেশে দেশে বয় দুরাশী-সাধক-প্রাণে—
মন্দিরে যার নারায়ণ নানারূপে
অঘটনী জ্যোতি জ্বালেন করুণাদানে।

বহুমুখী অপরূপ তাঁর রূপলীলা !
অমূর্ত হয় মূর্ত ক্ষণে ক্ষণে
কত ভাবে রঙে গন্ধে ছন্দে রসে—
কে পেয়েছে তার অন্ত বিশ্লেষণে ?

বুদ্ধিবাদীর সীমিত তর্কলোকে
কতটুকু আলো ধরা দেয় অধরার—
যে-আলোর এক কণা চুমি' কোটি কোটি
রবি শশি তারা অসাঙ্গ-ঝঙ্কার ?

সে-আলোকণারি বরে কোটি কোটি জীব
দেদীপ্যমান হয়েছে ম্লান ধরায় ;
মহাব্যোমে কোটি কোটি নীহারিকা জ্বালে
যে-বিভু সেই তো মর্ত্য মানসে ভায়।

কত অচিন্ত্য রূপে সে কান্তি ধরে
বুদ্ধি প্রতিভা কোথা পাবে তল তার ?
মনীষা কেবল পারে কৃতার্থ হ'তে
নমি' শ্রদ্ধায় গীতার অঙ্গীকার :

'যে বিগ্রহেই চায় জীব পূজা দিতে
ভক্তি কমল ধূপ দীপ সৌরভে,
তার সে-শ্রদ্ধা আমিই নিত্য করি
কৃপায় আমার অচলা সগৌরবে।'

১৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ স্নেহার্থী দিলীপ
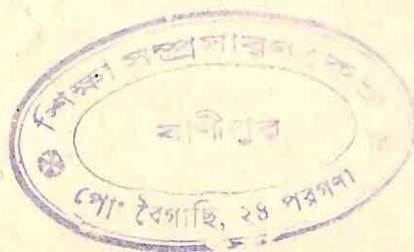
ভূমিকা

"অঘটনের শোভাযাত্রা" শিরোনামাটি বরণ করেছি খানিকটা ধ্বনিমাধুর্যের জন্যেও বটে। কারণ অঘটনের পর্যায়ে আমার যে-তিনটি কাহিনী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে (অঘটন আজো ঘটে, অভাবনীয় ও অঘটনের ঘটা) সে তিনটি পর্বে অঘটনের শোভাযাত্রাই আঁকা হয়েছে। বর্তমান পর্বের নাম প্রথমে দিয়েছিলাম "অঘটনের জের"—একটি ছোট গল্পে। পরে একে নবজন্ম দিই এক অভিনব প্রেরণায়—যার ভিত্তি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি—একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ এ-ধরণের কাহিনী লিখতে কেউ ভরসা পেতেই পারে না আন্তর উপলব্ধির 'পরে অটুট আস্থা না থাকলে। শুধু কল্পনার 'পরে যার ভর সে বাইরের সমর্থনের মুখাপেক্ষী না হ'য়েই পারে না, সাত পাঁচ ভাবে—লোকের কাছে অসম্ভব ব'লে ডিশমিশ হবে না তো ? কিন্তু যে জেনেছে এ-উপলব্ধির ভিত্তিকে মজবুৎ ব'লে, সে অবিশ্বাসীর জেরায় ভয় পায় না। সে বলে এক বিখ্যাত ধর্ম-মনীষীর ভাষায় : "Why should we regard human nature as most itself when it is least inspired ?"* এ-সাধু 'চ্যালেঞ্জ'-টির ভাষ্য—মানুষের চেতনায় আলো নামবার আগে সে জীব ও জীবনকে আবছা গড়পড়তা ও তুচ্ছ এই তিনরূপে দেখলেও সে-দেখাকে প্রামাণ্য বলা চলে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষীণদৃষ্টি মানুষ অবশ্য তাদের নিজের দৃষ্টিলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে

---

* MYSTICISM IN RELIGION by Deane Inge, Chapter IV.

বলবেই (এবং ব'লেও থাকে) যে, বেশির ভাগ লোকের উপলব্ধি দর্শন প্রত্যয়ই নির্ভরযোগ্য – majority must be granted—এই-ই তো ডিমক্রাসির মুখর রায়। কিন্তু এ-রায়ের ভার থাকলেও না আছে উজ্জ্বলতার ধার না প্রেরণার সেই আনন্দময় দীপ্তি যে শুধু যে দেখিয়ে দিতে পারে কিসে হয় তাই নয়, অঘটনকে আবাহন ক'রে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। এ-দীপ্তির এজাহার এই যে, ঠাকুর তাঁর বাহ্য জগতকে নিয়মের নিগড়ে বাঁধলেও তিনি নিজে সব নিয়মের বাইরে। খৃষ্টদেব একথা বলেছিলেন তাঁর একটি বহু-উদ্ধৃত গভীর বাণীতে —যে, মানুষের কাছে যা অসাধ্য তা ভগবানের কাছে সুসাধ্য ব'লেই তিনি ভগবান্: "With God all things are possible."

কিন্তু প্রেরণাহীন লৌকিক চেতনায় দৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয় ব'লে দেখতে পাওয়া যায় না যা প্রেরণাদীপ্ত অলৌকিক চেতনায় স্পষ্ট দেখা যায়। এর একটি নাম "দর্শন"। তাই যাঁরা দেখেছেন তাঁরা অবিশ্বাসীর বাঁকা হাসি শুনে পাল্টা সোজা হাসেন, বলেন: "ওরা জানে না তাই মানে না।"

ধর্মস্য তত্ত্ব যে গুহায় নিহিত রয়ে গেছে তার একটি কারণ এই-ই—অর্থাৎ যে-উপলব্ধি অমূল্য সুন্দর শিব সত্য তাকে ধর্মে-অবিশ্বাসী বা গড়পড়তা মানুষ অনাদর করে ব'লেই ধার্মিকেরা বলেন—কাজ কি এর ওর তার কাছে দরবার ক'রে—থাকি নিজের অন্তরের অন্দর মহলে বহাল তবিয়তে—"আপনাতে মন আপনি থেকো —যেও নাকো কারো ঘরে।" এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন—যাঁরা সত্যান্বেষী গরজ তাঁদেরই, তাই তাঁরাই আমাদের খুঁজবেন, ওরফে কালিদাসের ভাষায়: "ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ"— রত্ন কাউকে খোঁজে না রত্নকেই মানুষ খোঁজে, না খুঁজলে মেলে না।

বটে। কিন্তু যুগধর্মও বদলায় যুগে যুগে। তাই এ-যুগে নানা অধ্যাত্ম উপলব্ধির গূঢ় বাণী গুহা ছেড়ে লোকালয়ে জ্বালাচ্ছে দীপালিকা। বেশি নয়, তবু কয়েকটি মনোহর দীপালি জ্বলেছে এদেশে ওদেশে—নানা সাধু সন্তের জীবনী দর্শনাদির মাধ্যমে। এদের মধ্যে জনশ্রুতি ও কল্পনার প্রক্ষিপ্ত এজাহারও আছে মানি, কিন্তু সে-সব বাদ দিলেও যা থাকে তা এতই অকাট্য ও আনন্দময় যে পড়তে পড়তে মন প্রাণ গান গেয়ে ওঠে ভাবতে যে, যা থাকার কথা নয় তা সত্যিই আছে।

অঘটন আজো ঘটে-র প্রথম পর্বে এবং তার পরে পর পর আরো তুটি পর্বে আমি এই জাতীয় দর্শনাদির কিছু সাক্ষ্য পেশ করবার চেষ্টা করেছি রমন্যাসের মাধ্যমে। (রমন্যাস বলতে আমি বুঝছি সত্যভিত্তি অঘটনী কাহিনী) অনেকের কাছে সে-এজাহার নামঞ্জুর হয়েছে, হ'তে বাধ্য। কিন্তু আবার বহু জিজ্ঞাসু আমাকে লিখেছেন যে, তাঁরা শুধু প্রেরণা নয় পথের পাথেয় পেয়েছেন জেনে যে, ডাকার মতন ডাকলে এ-যুগেও ভাগবতী কৃপা সাড়া দেয়, কাছে এসে তোলে, বাঁচায়, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে—দরকার হ'লে অঘটনের নক্ষত্র-দিশা জেলে। এই জাতের জিজ্ঞাসুরা মূলতঃ বিশ্বাসবাদী বটে—কিন্তু অসম্ভবকে সত্য ব'লে মেনে নেওয়ার পরেও তাঁরা খুশী হনই হন যখন দেখেন যে, না দেখেও যাকে বিশ্বাস করেছেন তাকে দেখে চিনেছেন এমন লোক এ-নাস্তিক বৈজ্ঞানিক যুগেও মেলে। এই শ্রেণীর সাধকের সাধনারই আরো কিছু সংবাদ পেশ করেছি 'অঘটনের শোভাযাত্রা'য়।

আর একটি কথা। যাঁরা বলেন হিন্দুদের বহু দেববাদ (Polytheism) স্রেফ কবিকল্পনা বা কুসংস্কার, তাঁরা সরাসর এমন রায় দেন—না দেখে, না জেনে, না

চেখে। যাঁরা দেখেছেন, জেনেছেন, চেখেছেন তাঁদের এজাহার—"এক বহু হয়েছেন শুধু জীবলোকে নয়, দেবলোকেও বটে।" এই বহুজন্মাকেই উপনিষদে আবাহন করা হয়েছে এই ব'লে ঃ "য একোবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণান অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি" —অর্থাৎ যিনি এক ও নিরঙ তিনি তাঁর গূঢ় লীলার পোষ্টাই করতে তাঁর বহুমুখী শক্তির যাদুতে রঙে রঙে সৃষ্টি ছেয়ে ফেলেছেন। ডীন ইঞ্জ বলেছেন কি সাধে : "Myth is the poetry of religion, and poetry, not science, in the natural language of religion."

এ-উক্তিটি চিরন্তন সত্য ব'লেই যুগে যুগে নানা সাধকের কাছে নানা দেবতা আসেন এক দেবদেবেরই রূপায়ণের কোনো অগাধ অভিপ্রায়ের বাহন হ'য়ে। কিন্তু যাঁরা একমেবাদ্বিতীয়ম্-কে ছেড়ে তাঁর দেববিভূতি-দের ডাকেন তাঁরাও একনাথের এ-প্রতিভূদের মধ্যে দিয়ে তাঁকেই চান—না চেয়ে উপায় নেই ব'লে—সব নদী সাগরে গিয়েই মেশে ব'লে—all roads lead to Rome ব'লে। ভাগবতে অক্রূর এই পরম সত্যটিকে বড় সুন্দর ক'রে বলেছেন :

সর্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব দেবমহেশ্বরম্।
যেপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো॥
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বৎ ত্বাং গতয়োন্ততঃ॥

অর্থাৎ

যেথা যে-দেবেই করি কেন পূজা প্রভু,
যে-রূপায়ণেই কল্পি তোমারে ভবে,
সব পূজা ধায় তোমারি চরণে তবু—
সকল দেবতা তোমারি অংশ যবে।

গিরিনন্দিনী বারিদবাহিনী নদী
সিন্ধুর কোলে চিরসমাপ্তি লভে,
সব বেদবিধি, দেবগণ নিরবধি
তেমনি অন্তে তব বুকে লীন হবে।

হিন্দুধর্মের এই ঔদার্য সত্যিই বিস্ময়কর। হিন্দু সাধক-সংসদে প্রতি অধিকারীর জন্যেই আলাদা ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, কাউকেই বলা হয়নি যে, আর সবাইএর মতন না চললে সে অধঃপাতে যাবেই যাবে। শুধু তাই নয়, একের ইষ্ট অন্যের উপাস্য না হ'লেও উভয়েই পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে পারে, এমন কি গুরুভাইও হতে পারে—অর্থাৎ গুরু এক, কিন্তু ইষ্ট আলাদা। ভগবান্‌কে নিয়ে এত বিচিত্রভাবে সাধনা আর কোন দেশের তপস্যার ইতিহাসে পাওয়া যায় না একথা নিঃসংশয়েই বলা যেতে পারে। এ কথাও সর্বজন-স্বীকৃত যে, ভক্তের প্রেম-নেত্রের সামনে ইষ্ট যে-রঙে রঙিয়ে ওঠেন সে-রঙের সত্যাসত্য-বিচার সে-ভক্তের পক্ষে সম্ভব নয় যার ইষ্ট আলাদা।

পরিশেষে শুধু আর একটি কথা বলতে চাই। আমার লক্ষ্য গল্প বলা না হ'লেও গল্পকে যখনই শিল্প হিসেবে বরণ করেছি তখন তার রসের বিচার পাঠক করবেন নিঃস্পৃহভাবে এটুকু আশা পোষণ করব। শিল্প বলতে আমি বুঝছি চরিত্র চিত্রণ, গল্পের গাঁথুনি (প্লট), ভাষার সাবলীলতা, তর্কাতর্কির চমক, নাটকীয় সংঘাত এই সব। আমার বলবার উদ্দেশ্য—যাঁরা ধর্ম মানেন না তাঁদের কাছেও এসব কাহিনী গল্প হিসাবে রসোত্তীর্ণ ব'লে গণ্য হ'তে পারে এবং হ'লে আমি সুখী হব বলা বাহুল্য। ইতি। লেখক—

পুনশ্চ।

রমন্যাস পর্যায়ে আমি আজ পর্যন্ত (১৫ অগ্রহায়ণ

১৩৭৩) যে-কয়টি কাহিনী লিখেছি অনেকেই তার খবর চান ধর্ম তথা অঘটনের কথা শুনতে আনন্দ পান ব'লে। তাঁদের জন্যে বলি—অঘটনী রমন্যাসগুলি এই পর্যায়ে পাঠ্য :

১। অঘটন আজো ঘটে

২। অভাবনীয়

৩। অঘটনের ঘটা

৪। অঘটনের শোভাযাত্রা
অঘটনের সূত্রপাত
করুণা অলৌকিকী—নিবন্ধ } এক খণ্ডে

৫। অঘটনের পূর্বরাগ

৬। অঘটনের হাসিরাশি
অঘটনে অশ্রুবাঁশি } এক খণ্ডে

৭। গল্পরাগমালা—৮টি গল্প
স্বামী প্রেমানন্দ—নাটক } এক খণ্ডে

৮। প্রেমল বৈরাগী

অঘটনের পূর্বরাগ পর্যন্ত পুস্তকাকারে বেরিয়েছে—অঘটনে হাসিরাশি—জনসেবক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে অঘটনে অশ্রুবাঁশি—উত্তরায় প্রকাশিত হচ্ছে প্রতি মাস প্রেমল বৈরাগী—ভারতবর্ষে প্রকাশিত হচ্ছে প্রতি মাস এগুলিও যথাকালে পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ করবে বলাই বাহুল্য।

এক
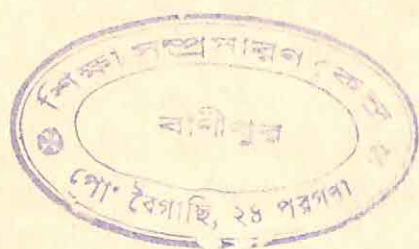
গ্লস্টারশয়ারে অসিত ও তপতী আরো দুসপ্তাহ থেকে গেল বার্বারা ও তার দিদি সোফিয়ার অনুরোধে। সোফিয়ার মত 'হোস্টেস' পেলে কেই বা বিদায় নিতে চায়? দুই বোনের আনন্দ ধরে না। আরো গল্প করবে, গান শুনবে, তর্ক ফাঁদবে। সময়ের পাখা উঠবে বৈকি! সোফিয়ার চোখে জল আসে—বলল: 'দাদা, ধন্যবাদ আমরা সহজেই দিই এদেশে, কিন্তু হয়েছে কি জানেন? চলতে ফিরতে পুনরুক্তি করতে করতে কথাটার ধার ক্ষয়ে গেছে।'

অসিত হেসে বলল: 'ধন্যবাদ কে কাকে দিচ্ছে, দিদি! তবু যদি থ্যাঙ্কস্ দিতেই হয় তবে বলতে হয়—The shoe is on the other foot: আমরা দুজনে এ-কয়দিন কী আনন্দেই যে কাটিয়েছি—ভজন ভোজন তথা কথন হসনে! দরদী না পেলে কি হয় এমন বহুমুখী মঞ্জরণ? ষাটের কোঠায় পৌঁছে মন যেন—কী বলব?—একটা বাংলা কীর্তনে আছে: 'শুষ্ক তরু মঞ্জরিল'। আর এ-অঘটন ঘটল কার দাক্ষিণ্যরসে বলো তো, দিদি?'

সোফিয়া হাসিমুখে বলল: 'একটু ভুল হল দাদা! আপনারি তো মুখে শুনেছি যে, যোগীদের মনতরুর মূল আকাশে, কাজেই সে রস টানে তো নিজের মাটি থেকে না, ঊর্ধ্বের আলোকলোক থেকে। কথাটা সত্যি নিশ্চয়ই, নৈলে কি আপনি দিনের পর দিন এত উড়ন্ত অমৃতফল বিলোতে পারতেন রকমারি কাহিনীর? আর সে কত রং ঢং আপনার অভিজ্ঞতার। ভাবতে সত্যই অবাক হতে হয়। আমাদেরও তো মিথলজি আছে দাদা। কিন্তু আপনাদের হিন্দু মিথলজির মতন এত রস রূপ রং রেখা—এত হাসি কান্নার আলো ছায়ার সম্পদ আর কোন্ ধর্মের পৌরাণিক রাজকোষে মেলে?'

বার্বারা বলল : 'যা বলেছিস সোফি ! আর কল্পনা ? আমি তো সময়ে সময়ে ভাবতে ভাবতে প্রায় উদ্ভ্রান্ত মতন হয়ে পড়ি—বিশেষ, —অসিতের দিকে চেয়ে—'আপনাদের দেবলোকের প্যানথিয়নের বৈচিত্র্যে।' হঠাৎ হেসে : 'ধরুন না কেন—ঐ গণেশের কথা !—না হাতী না মানুষ—অথচ দুয়ের মিলনে দাঁড়ালো কি না এক দেবতা ! আর কোন্ দেশের মাটিতে এ হেন উদ্ভট চীজ গজাতে পারত বলুন তো ?' বলেই হেসে কুটিকুটি।

অসিত হাসল না, টুকল : 'আমাদের একটি ঘরোয়া প্রবচনে বলে দিদি—যত হাসি তত কান্না। বিশেষ গণেশ ঠাকুরকে নিয়ে বেশি হাসাহাসি করার প্রত্যবায় আছে—এ শুধু আমার কথা নয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্য তাঁকে 'বিঘ্নপরিখণ্ডনচণ্ডদণ্ড' উপাধি দিয়েছেন অর্থাৎ কিনা দরকার হলে বিঘ্নহন্তা হয়ে ভক্তকে বাঁচাতে তিনি দণ্ডধারী হতে পারেন।'

সোফিয়া চোখ বড় বড় করে বলল : 'ভক্ত ? আপনি কি সত্যিই বলতে চান দাদা যে, গণেশও সাক্ষাৎ দেবতা, ঠাকুর, যাঁর ভক্ত আছে ? তাঁর ছবি দেখে আমার তো মনে হয়েছিল ফ্যান্টাস্টিক—উদ্ভট ঠাট্টা !'

অসিত শান্ত সুরে বলল : 'ঠাকুর বলতে তুমি ঠিক কী বোঝো না বললে এ-প্রশ্নের উত্তর দিই কেমন করে ?'

সোফিয়া একটু বিপন্ন মতন হয়ে বলল : 'কী বুঝি ?··বুঝি··· ডেফিনিশন দেওয়া হয়ত একটু শক্ত···তবে হ্যাঁ, বলব—ঠাকুরের কয়েকটা ক্ষমতা থাকাই চাই—দুঃখে শান্তি দেওয়ার, দুর্দিনে ত্রাণ করার, তৃষ্ণায় জল দেওয়ার, আর··আর পৃথ্বীমুখী মনকে উর্ধ্বমুখী করার।' বার্বারাকে, 'কী বলিস তুই ?'

বার্বারা সায় দিতে অসিত বলল : 'সাবাস ! যেহেতু তোমাদের এ-সংজ্ঞা অনুসারে আমাদের গণেশ ঠাকুরকে একেবারে ডাকসাইটে দেবতা বলা চলে বৈকি। কারণ বহু সাধকের প্রার্থনায় তিনি সাড়া

দিয়ে তাদের দেখা দিয়েছেন বিঘ্নহন্তা হয়ে, অশান্তকে শান্তি দিয়ে, আর্তকে মুক্তি দিয়ে, নাস্তিককে ভক্তি দিয়ে। গণেশ পুরাণের একটি বিখ্যাত স্তবে আছে—শোনো।' বলে গুন গুন ক'রে গায়ঃ

'যতো বুদ্ধিরজ্ঞাননাশো মুমুক্ষো
যতঃ সম্পদো ভক্ত সন্তোষিকা স্যুঃ
যতো বিঘ্ননাশো যতঃ কার্যসিদ্ধিঃ
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥

অর্থাৎ যাঁর প্রসাদে মুক্তি ও জ্ঞানলাভ হয়, ভক্তের মনের মতন সম্পদ লাভ হয়, পথের বাধা কাটে ও কার্য সিদ্ধি হয় সেই গণেশদেবকে ঋষিরাও প্রণাম করেন। কী চমৎকার ভাব বলো তো স্তবটির? এর নাম যদি দেবতা না হয় তবে দেবতা কী বস্তু শুনি?'

সোফিয়া (একটু ইতস্ততঃ করে): 'কিছু যদি মনে না করেন দাদা—'

অসিত (হেসে): 'আর একটি প্রশ্নবাণ তো? এত আদর-যত্নের পর সইবে। আমাদের একটি ঘরোয়া প্রবচন আছেঃ পেটে খেলে পিঠে সয়—তাই নির্ভয়ে শুরু করো প্রশ্ন তীরন্দাজি।'

সোফিয়া (একটু ভেবে): 'কি জানেন দাদা? দেবতা শুনলেই আমাদের খ্রীষ্টান মন তো—ধরে নেয় এঞ্জেল আর্কেঞ্জেল জাতীয় কোনো অপরূপ সুন্দর দেবদূত হবে। আমাদের মহাকবি মিলটন কি অকারণেই বলেছিলেনঃ

'Beauty is Nature's brag and must be shown—
Where most may wonder at the workmanship?'

তাই—মানে, 'সাক্ষাৎ ভগবান আপনাদের গণেশের মতন কুৎ—অর্থাৎ অসুন্দর কাঠামোয় রূপ ধরেছেন ভাবতে কেমন যেন বাজে।'

অসিত (মৃদু হেসে): 'অসুন্দর বিশেষণটাকে তলব করেই দয়ে মজলে দিদি! কারণ এ-সংশয়কুটিল জগতে কোন্‌টা সুন্দর আর কোন্‌টা অসুন্দর—এ-দুর্দান্ত তর্কের কোনো নিষ্পত্তিই আজো হয় নি।

তোমাদেরই এক দিকপাল সৌন্দর্যতাত্ত্বিক জি. ই. মূর তাঁর Principia Ethica-তে লিখেছেন একজায়গায় যে, কল্পনা করো এক চরম সুন্দর জগৎ, তার পাশে রাখো এক অতি কুৎসিত জগতকে। পাশাপাশি দেখে তোমার যাই কেন না মনে হোক, যুক্তি দিতে পারো কি—কেন সুন্দর জগৎটির টিঁকে থাকা উচিত, কুৎসিৎটির নয়?'

সোফিয়া (বিস্মিত) : 'আপনি বলেন কি দাদা? কোন্‌টা সুন্দর আর কোন্‌টা অসুন্দর তাও বলা যায় না? কীট্‌স্ কি বাজে কথা বলেছেন যে, 'Beauty is truth, truth beauty'—that is all ye know on earth, and all ye need to know? এ যে স্বতঃসিদ্ধ সত্য।'

অসিত (আরো হেসে) : 'এবার আরো অথই জলে পড়লে দিদি। নাচার! এও কি তোমার অজানা যে, নানা স্বতঃসিদ্ধ সত্যের ভিৎ টলিয়েই তোমাদের বিখ্যাত বিজ্ঞানের জ্ঞানমহল আরো মজবুত বনেদ তৈরি করেছে? Ptolemy-র যুগে সবাই কি স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেয় নি যে, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমা করছেন সসম্ভ্রমে। আচ্ছা। তারপর কী হল! না Copernicus এসে বললেন উল্টোটাই সত্য। লোকে রেগে টং। তারপর? গ্যালিলিও তাঁকে সমর্থন করতে না করতে সবাই ক্ষেপে তাঁকে জেলে পাঠালেন। স্বতঃসিদ্ধ সত্যের হাল দেখ একবার। না, আরো আছে। অতঃপর আইনষ্টাইন এসে আরো এককাঠি এগিয়ে নিউটনের নানা স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বকে বাতিল করে গড়লেন রিলেটিভিটির নব স্বতঃসিদ্ধত্বের সূত্র। কে বলতে পারে এ-তত্ত্বও ফের বাতিল হবে না? না দিদি, এ আমার তর্কের জন্যে তর্ক নয়। ইতিহাস আর কিছু পারুক না পারুক একটা জিনিস দেখাতে পেরেছে যে, সুন্দর-অসুন্দর, পাপ-পুণ্য, মঙ্গল-অমঙ্গল বর্গীয় নানা স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বেরই পাঠ বদলে গেছে দেশকাল-পাত্রের ঘুরন্ত মঞ্চ একটু ঘুরতে না ঘুরতে। জর্মন দার্শনিকরা এর কারণ দর্শালেন Zeitgeist—অর্থাৎ যুগধর্মের—ব্যাখ্যা দিয়ে—মানে,

এক যুগের ধর্ম পরের যুগে অধর্ম বলে গণ্য হয় এই যুগধর্মের নববিধানে। শিল্পেও এইভাবে সব নীতিই—যথা aesthetics—চিরদিন পদ্মপত্রের জলের মতনই টলমল টলমল করে এসেছে—আজ একে সুন্দর বলে কাল ওকে। একটা উদাহরণ দেই, কে না জানে—যাকে বাইরের জগতে আমাদের চোখের কাছে কুৎসিত মনে হয়—কাব্য, নাটক বা চিত্রের জাদুতে এমন সুন্দর ছবি হয়ে ওঠে যে, মন মুগ্ধ না হয়েই পারে না। বেশি কথা কি, পদে পদেই কি দেখতে পাও না যে, দৃষ্টিভঙ্গি একটু বদলাতে না বদলাতে চোখের অভ্যস্ত রায় বিলকুল বদলে যায়? এক বিখ্যাত সার্জন কোনো রোগীর এক দগদগে বিষফোড়া দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেছিলেন: 'What a beautiful carbuncle!' রোসো, আমি ধূর্ত উকীলের মত তর্ক করে কালোকে সাদা দাঁড় করাতে চাইছি না। এ-সূত্রে আমি শুধু বলতে চাইছি যে, 'চর্মচক্ষে গণেশ ঠাকুরের যে-রূপ দেখা যায়, ধ্যাননেত্রে সে-রূপ দেখেন না তাঁর পূজারীরা। তাঁদের মুখে বারবারই শুনেছি যে, ধ্যানে তাঁরা সবাই তাঁর যে আনন্দ-রূপ দেখেছেন সে-রূপ দেখলে চোখ ফেরাতে পারা যায় না। এর একটা কারণ এই যে, ধ্যানদৃষ্টি আর সহজদৃষ্টির মধ্যে তফাৎ আশমানজমীন—ধ্যাননেত্রে এ সব মূর্তির মধ্যে যে জ্যোতির্ময় কান্তি ফুটে ওঠে চর্মচক্ষে সে-জ্যোতির আভাসও পাওয়া যায় না। আলোর প্রসাদে সাদামাটা জিনিসও অসামান্য দেখায় – চাঁদের আলোয় ম্লান ডোবা, জীর্ণ কুটির, শুকনো গাছও অপরূপ দেখায় তো প্রত্যহই। আমার একবার একটি অতি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল, বলি শোনো।'

বলে একটু থেমে: 'তোমাদেরই টেমস নদীতে একদা নৌকোয় চলেছিলাম বিকেলে। খানিকপরে সূর্য পাটে নামলেন। অমনি সে-রাঙা আলোয় নৌকা-স্টিমার-ভড়-কণ্টকিত টেমসের ঘোলা জলও হয়ে উঠল সে কী সুন্দর—মনে হল যেন হঠাৎ revolving stage-এর দৃশ্য বদল হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে। শ্রীহীন টেমস নদী লণ্ডনের

কাছেও যে এমন অপরূপ দেখাতে পারে আমি স্বচক্ষে না দেখলে ভাবতেও পারতাম না। অথচ একটিবার ভেবে দেখ—এই আশ্চর্য রূপান্তর হল কেন? না শুধু আলোর তির্যক ভঙ্গিতে—যার ফলে সে রঙিয়ে উঠে সর্বত্র ছড়িয়ে দিলো সে-রঙের ফাগ। ধ্যানে ভক্ত গুরুর বা ইষ্টের মূর্তি দেখে এক অধরা আলোয়, ওরফে দিব্য জ্যোতির পরিমণ্ডলে। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে যুগপৎ প্রেম উদয় হয়ে সে মূর্তিকে আরো রাঙিয়ে তোলে। কে না জানে—প্রেমের দৃষ্টি বিচারকের দৃষ্টির তোয়াক্কাও রাখে না! একটি গান শোনো—বিখ্যাত কবি হাফেজের—আমার অতি প্রিয় গান, তাই আমার অনুবাদটিও শোনাচ্ছি প্রথম শ্লোকটির—বলেই গুনগুন করে:

অগর্ আঁ তুর্কে শীরাজী বেদস্তারদ্ দিলেমারা
বখালে হিন্দুঅশ্ বখ্শম্ সমর্কন্দ ব বুখায়ারা

অর্থাৎ

আমার সেই অন্তরের কান্তা,
মিলন তার চায় উছল এই প্রাণ।
তিলের তার করতে তর্পণ দেই
সমর্কন্দ আর বুখায়ারায় দান॥

বলতে কি হাফেজ তাঁর প্রিয়ার গালের তিলেও যে অনুপম সৌন্দর্য দেখেছিলেন—যার দাম দিতে তিনি সমর্কন্দ ও বুখারা শহর দুটিও দান করতে রাজী ছিলেন—সে সৌন্দর্য প্রেমের দৃষ্টিতে দেখা বলেই কি বলবে তাকে অলীক সৌন্দর্য? আমার তো মনে হয় ঠিক উল্টো: অর্থাৎ প্রেমের চোখের রায়ই সৌন্দর্যের সম্বন্ধে অন্তিম রায়, নিষ্করুণ গড়পড়তা চোখের রায় নামঞ্জুর।'

দুই বোন খানিকক্ষণ মুখ নিচু করে ভাবে। তারপর সোফিয়া মুখ তুলে অসিতকে বলে: 'আপনি ভাবিয়ে দিলেন দাদা, মানতে হচ্ছে। কি বলিস বার্বারা?'

বার্বারা: 'দাদা কবে না ভাবান শুনি? ভাবতে ভাবতে মাথার

মধ্যে সব ফাঁকা হয়ে যায় যেন! কেবল দাদা, একটা কথা···ভক্তেরা ধ্যানের ধনকে প্রেমের দৃষ্টিতে সুন্দর দেখেন একথা মেনে নিয়েও কি বলা চলে না যে, এমন মূর্তিও আছে যা সাদা চোখে, বিচারকের দৃষ্টিতেও সুন্দর দেখায়? এ-হেন অপ্রতিবাদ্য সুন্দর বিগ্রহ ছেড়ে আপনাদের ভগবান কেন এমন কাঠামোয় আসেন যাকে শুধু প্রেমের দৃষ্টিতে বা ধ্যানের আলোয়ই সুন্দর দেখায়, নৈলে নয়?'

অসিত (হেসে): এ দুর্দান্ত প্রশ্নের উত্তর কেমন করে দিই দিদি—তাঁকে জিজ্ঞেস না করে? আর জিজ্ঞেস করলেই যে তিনি জবাবদিহি করবেন এমন ভরসাই বা কই? তাই সখেদেই মেনে নেব যে, তিনি কেন অমুক ভঙ্গিতে না চলে তমুক ভঙ্গিতে চলেন, আমরা কেউই জানি না। জানি হাড়ে হাড়ে শুধু একটি কথা যে, জগৎকে বুদ্ধি দিয়ে পুরোপুরি বুঝতে চাওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা। এ শুধু আমার কথা নয় দিদি, বিখ্যাত দার্শনিক ব্রাডলিও কেঁদে কবুল করেছেন যে, জগৎকে দুপা এগিয়ে যেই মনে হয় সৃষ্টিরহস্য একটু স্বচ্ছ হয়ে এল বা অমনি তৃতীয় পদক্ষেপ করতে না করতে—হুশ্! নিষ্ঠুর ঘন মেঘ এসে দৃশ্যটাকে আরো ঝাপসা করে দিয়ে যায়। মনের পদে পদে এই নাজেহাল হওয়ার কথা আমাদের দেশের ঋষি-কবি শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন বড় চমৎকার করে:

'Here where one knows not even the step in front
And Truth has her throne on the shadowy back
of doubt···

When all has been explained, nothing is known.'

সোফিয়া (ক্ষুণ্ণ সুরে): 'তাহলে কি এই সিদ্ধান্তকেই জ্ঞানের চরম রায় বলে মেনে নিতে হয় না দাদা যে, জগৎ বা জীবনকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করা নিছক বিড়ম্বনা?'

অসিত (ওর হাতে চাপড় দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে): 'একথা আমি কখন বললাম দিদি? বুদ্ধি মানেই তো বুঝবার যন্ত্র—কাজেই তাকে হাতে

পেয়েও কাজে লাগাব না কী দুঃখে ? যথার্থ জ্ঞানের বাণী শুধু এই যে, একটু বিনয়ী হয়ে বুঝবার চেষ্টা করা ভালো—মেনে নিয়ে যে, কোনো আধার কি যন্ত্রেরই সাধ্য অসীম নয়। পরমহংসদেবের উপমায়—একসের ঘটিতে চারসের জল ধরাবার চেষ্টা করাটাই হল অপচেষ্টা। অর্থাৎ, যতটা পারো বুঝবার চেষ্টা করবে বৈ কি, কিন্তু তারপরেই হাল ছেড়ে শরণ নাও তাঁর—যাঁর উৎসজ্যোতিকে আমাদের গায়ত্রী মন্ত্রে যুগ্ম উপাধি দিয়েছে—'জগতের চালক তথা বুদ্ধির সারথি।' মনে নেই—কালই আমি গাইছিলাম আমার একটি অতি প্রিয়গান যার শেষ কথা হচ্ছে 'আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে ?'

বার্বারা (খুশী) : 'মনের মেঘ কাটাবার আপনি ভারি চমৎকার উপায় বাৎলে দিলেন দাদা।'

সোফিয়া (প্রসন্ন কণ্ঠে) : 'সত্যি দাদা, ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাকে —আর এবার মামুলি নয়, আন্তরিক ধন্যবাদ।'

অসিত (হেসে) : 'পালটে আমিও ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, গণেশী মেঘে তোমাদের মনকে মেঘলা করে দেবার পর ফের সে-ছায়া তবু একটু সরাতে পারা গেছে। কেবল একটি কথা বলি এই প্রসঙ্গে ; আমরা এ যুগে বড় বেশি দুর্ভাবনা নিয়ে ঘর করতে ভালোবেসে ফেলেছি বলেই বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে ফেলি ঘড়ি ঘড়ি ! তাই হৃদয়ের এই গভীর বাণীতে কান দিই না যে, সবচেয়ে বড় সমস্যা এই বোঝাবুঝির সমস্যা নয়, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল—কী করে সেই সরল বিশ্বাস নম্র শ্রদ্ধা আসে যার বরে মেনে নেওয়া যায় তাঁদের কথা যাঁরা ভগবানকে দেখেছেন, জেনেছেন, চেখেছেন আমাদের চেয়ে ঢের বেশি কাছ থেকে। এ-শ্রদ্ধা বিশ্বাস এলে শুধু যে শান্তিলাভ হয় তাই নয়, বুদ্ধির একটা দুষ্পার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়—কাকে বলব সেই লাভ যার পরে আর কোনো লাভকে লাভই মনে হয় না ?—গীতার ভাষায়—'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' কারণ শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসার

সঙ্গে সঙ্গে চোখের ঠুলি খ'সে পড়েই পড়ে—যার ফলে দেখতে পাওয়া যায়ই যায় যে, জীবনের সব চেয়ে বড় লাভ হল ভগবানের দেখা পাওয়া, কি না তাঁর সঙ্গে পরম মিলন যার প্রসাদে দুঃখও আর দুঃখ থাকে না—সব কিছুর মধ্যেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় বলে। এই জন্যেই উপনিষদে বারবার বলেছে : 'য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি'—যেই তাঁকে জেনেছে, তাঁর সত্যরূপের অমৃতপান করেছে সেই জীবন্মুক্ত অমর হয়েছে। তাই গণেশ ঠাকুর দেখতে সুন্দর না উদ্ভট এ-প্রশ্ন সাধনা বা সিদ্ধির দিক থেকে অবান্তর। আসল প্রশ্ন হচ্ছে—প্রশ্ন না বলে নিকষ বলাই ভালো—তাঁকে জানলে চিনলে আমাদের জীবন সার্থক হয় কি না—তাঁর আলো আমাদের মধ্যে জন্ম নিলে আমাদের নবজন্ম হয়ে আমরা ধন্য হই কি না। এই কথা বলেছেন তোমাদের দেশেরই এক যোগী—Angelus Silesius :

'Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren
Und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren.'*

আমরাও এই কথাই বলি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে : 'তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র ছিলেন কিনা এ একটা প্রশ্নই নয়—প্রশ্ন হচ্ছে তোমার আঁধার রাতে তিনি আলো হয়ে তোমার বুকে জন্মাষ্টমীর দিশা দিতে পারেন কি না। প্রতি ইষ্টের সম্বন্ধেই একথা আছে অক্ষরে অক্ষরে—তোমার হৃদয়ে তিনি ঠাঁই পেলেন কি না। তা যদি না পান তবে পূজা পাঠ তন্ত্র মন্ত্র হাঁকডাক সবই ব্যর্থ।'

বার্বারা : 'আপনি এবার যা বললেন তাতে সোফির মতন বুদ্ধিবাদীরও আপত্তি থাকতে পারে না।'

সোফিয়া : 'মানি। কেবল (একটু থেমে ইতস্তত: করে) প্রশ্নটা

---

* ভগবান ঈশা যদি না জন্ম লভেন আলোর বীজের মত
হৃদয়ে তোমার প্রেমে,
রবে তুমি চির-অধন্য—যদি সহস্রবারও জন্ম তিনি
লভেন জেরুজালেমে।

তবু থাকেই থাকে—যে গণেশ ঠাকুরকে ডাকলে তিনি সাধকের হৃদয়ে সাড়া দিতে জন্মগ্রহণ করেন কি না। আপনি জানেন কি এমন কোনো সাধককে যিনি তাঁর দর্শনে কৃতকৃত্য হয়েছেন শুধু গণেশ ঠাকুরকে ডেকে ? দেখেছেন কোনো অঘটন তাঁর প্রসাদে ?'

অসিত বলল : 'তোমার তুটি প্রশ্নেরই উত্তর—"হ্যাঁ" (তপতীকে) তোমার অঘটনের কাহিনীটাই আগে বলি যদি অনুমতি দাও।'

বার্বারা (সবিস্ময়ে) : 'দিদি ! গণেশদেবের প্রসাদ কি তাঁকেও—'

অসিত : 'হ্যাঁ—তোমার দিদিটি হলেন প্রসাদের ক্ষেত্রে সর্বভুক্। এ-ও আর এক রহস্য। কেউ কেউ শুধু ব্রহ্মকে নিয়েই বুঁদ হয়ে থাকেন, কেউ বা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কেউ বা গুরু, কেউ বা শালগ্রাম —যার যেমন সংস্কার বা চাহিদা সেই অনুসারেই ঠাকুর তাঁর কাছে আসেন। ওর সংস্কার হয়ত সর্বদেববাদ, তাই সব দেবদেবীই ওর 'পরে খুশী হয়ে পোষ মেনে ওর কাছে ধরা দেন—যেন আপনা থেকেই।

সোফিয়া : 'ধরা দেন আপনা থেকেই ? মানে, না ডাকলেও ?'

অসিত (তপতীকে) : 'এ-প্রশ্নের উত্তর তুমি দিলেই ভালো হয়। কর্ত্রী যখন মজুদ, তখন মুখপাত্রের কী দরকার ?'

তপতী (হেসে ফেলে) : 'তোমাকে নিয়ে কে পারবে দাদা ? পাকে ফেলতে কি তোমার জুড়ি আছে ? (সোফিয়াকে) হ্যাঁ, অঘটনটা ঘটেছিল আমাকে নিয়েই, আর গণেশ ঠাকুরের মাধ্যমেই বটে। কী ভাবে বলি শোনো—যখন না বলে পার পাবার উপায় নেই।'

তখন আমরা পুনায়। হঠাৎ আমার বিষম অসুখ। কিছুই খেতে পারি না। হাঁপানি কাশি, তার উপর প্রত্যহ রক্তবমন। বিষম তুর্বল হয়ে পড়লাম। কিন্তু আশ্চর্য—গৃহবিগ্রহের পূজা করবার শক্তিটুকু ঠাকুর কেড়ে নেন নি! বিগ্রহ মানে—কৃষ্ণের। গণেশ ঠাকুরের কথা তখন মনেও হয় নি।

যখন দিন পনের বাদে শরীর আর বয় না এই অবস্থা—হঠাৎ

একদিন ধ্যানে দেখলাম গণেশ ঠাকুরকে। তিনি শুধু বললেন: 'আমি আছি মা-র পায়েই।'

দাদাকে বললাম। দাদা ভেবে পেলেন না—কেন গণেশ ঠাকুর আচমকা এসে এমন কথা বললেন। আমিও ভেবে-চিন্তে কুল-কিনারা না পেয়ে শুধু গৃহবিগ্রহ পূজা নিয়েই রইলাম। রক্তবমন আরো ঘন ঘন হতে থাকে। দাদা ভয় পেয়ে গেলেন, কিন্তু আমার ভয় এল না—কি জানি কেন? মনে হল—আমার ডাক এখনো আসে নি।

কিন্তু যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে ওঠে তখন মনে হয়—আপৎ শান্তি হওয়াই ভালো। কেনই বা বাঁচার চেষ্টা? তিনি যা করেন। বুকে যখন অসহ্য ব্যথা, আমার মনে কেন জানি না গুনগুনিয়ে উঠল মীরার একটি চরণ: "মন ভাবে জ্যুঁ রাখ্"—যেভাবে রাখতে চাও রাখো, ঠাকুর। অমনি হঠাৎ ঘর আলোয় ভরে গেল। সামনে ফের গণেশ ঠাকুর। আহা, সে কী অপরূপ মূর্তি! প্রতি অঙ্গ থেকে যেন জ্যোতি ঝরছে সৌন্দর্য ও প্রেম হয়ে গলে! বললেন ফের: "আমি আছি মা-র পায়েই।"

এবার দাদা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন: 'ইউরেকা! বুঝেছি। চলো খোঁজ করি গণপতি-মন্দিরের। চতুঃশৃঙ্গী মন্দিরের নিচেই হবে।'

চতুঃশৃঙ্গী দেবীর মন্দির পুনায় বিখ্যাত। জাগ্রত দেবী। পূজা পার্বণে হাজার হাজার ভক্ত যায় মানত দিতে। পাহাড়ের গায়ে মন্দিরটির চূড়ায় আলো জ্বলে। আমার খুব ভালো লাগে। সেদিন বেরুলাম সন্ধ্যাবেলায়। মন্দিরে সবে আলো জ্বলেছে। পাহাড়ের তলায় বিস্তর খোঁজ করে শেষে সত্যিই পাওয়া গেল এক ছোট্ট গণেশের মন্দির। দাদা আমাকে বললেন: 'যদি গণেশ ঠাকুর দর্শন দেন তো প্রার্থনা কোরো রোগমুক্তির। আমিও করব।' আমার মন কী এক মধুর আবেশে ছেয়ে গেল মন্দিরে ঢুকতে না ঢুকতে!

বিগ্রহের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ফের সেই প্রসন্ন দিব্য মূর্তি! আহা, সে কী আলোঘন কান্তি! কী রূপ, মরি মরি! ভাষায় বলব কেমন করে কী দেখলাম? মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটি চমৎকার গান শুনলাম—পূর্ণ আত্মসমর্পণের!

বাড়ী ফিরে দাদাকে বললাম। দাদা টুকে নিলেন—

(অসিতকে): 'গাও না দাদা!'

অসিত গায়:

'ইৎনী বিনতী সুনো হরীজী, বিনতি সুনো প্রভু মেরী:
অন্ত সময় মুখ নাম হো তেরা হৃদয় ছবী হো তেরী।
প্রাণ রহে য়া জায়ে তনসে,
শ্যাম নাম না জায়ে মনসে,
নৈন লগে হোঁ হরী চরণ সে শ্যামল অন্ত কি বেরী।
ইনো হী বর তুমসে পাঁউ:
শরণ বিনা মৈ কুছ নাহি চাহূঁ,
জো তূ করে মৈ ভলা মনাউঁ হো চরণোঁকী চেরী।
অন্ত সময় জো নিকট তু আয়ে,
শরণাগত য়হ মন হো জায়ে,
চরণধূল য়হ অঙ্গ লগায়ে, পলভী করে ন দেরী।'*

---

* আজ মিনতি আমার রাখো প্রিয়তম,
মিনতি রাখো আমারি:
যেন শেষ দিনে করি নাম মুখে,
ধরি হৃদয়ে ধ্যান তোমারি।
প্রাণ থাকুক দেহে কি বাহিরাক—নাম
তব যেন মন জপে অবিরাম,
শ্রীচরণে রয় লিপ্ত নয়ন সে-লগনে, কাণ্ডারী!

অসিত (গানটির মানে বুঝিয়ে দিয়ে) ঃ 'কী চমৎকার প্রার্থনা বলো তো দিদি! আর এই-ই হল আমাদের অন্তরের শেষ প্রার্থনা, অন্তিম লক্ষ্য ঃ যেন তোমার ইচ্ছাই হয় আমার ইচ্ছা—'Thy will be done, not mine.'

সোফিয়ার চোখ জলে ভরে এল, ব্লাউজের হাতায় চকিতে মুছে বলল গাঢ় কণ্ঠে ঃ 'সত্যি, দাদা।'

বার্বারা (একটু পরে মুখে হাসি টেনে) ঃ 'একটা কথা মনে হচ্ছিল, বলব দাদা?'

অসিত (হেসে) ঃ 'কী? গণেশের মন্দিরে কেন কৃষ্ণের চরণে প্রার্থনার গান বেজে উঠল?'

বার্বারা ঃ 'তাবলে অতটা অবোধ নই দাদা। অন্ততঃ এখন আর নই—আপনার মুখে দিনের পর দিন শুনে যে, দেবদেবীরা প্রত্যেকেই ভগবানের এক একটি রূপ বা বিভূতির বিকাশ—One of His countless aspects : না, আমার মনে এ যাত্রা প্রশ্ন জাগে নি, জেগেছিল স্বস্তি : যে, গণেশ ঠাকুর দিদির প্রার্থনায় কান দেন নি।'

অসিত (আশ্চর্য হয়ে) ঃ 'কান দেন নি! মানে?'

বার্বারা ঃ 'মানে, দিলে সরাসর কৃষ্ণের পরম পায়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিতেন আর কি—তাঁর মুখে এ গল্প আমরা আর শুনতে পেতাম না।'

অসিত ঃ 'ভুল হল দিদি। ঠাকুরের সাড়া দেবার হাজারো ছন্দ। তিনি কখনো প্রার্থীর কোনো বিশেষ আর্জি পূর্ণ করেন কল্পতরু হয়ে।

দিও এই বর বিনা তোমার শরণ
না চাই কিছুই যেন হে মোহন!
যাই কেন দাও বিধান, অধীনী ধরে যেন শিরে তারি।
তুমি দাঁড়াবে সেদিনে শিয়রে যখন,
রাঙা পায়ে যেন চাই হে শরণ;
চরণ ধূলি এ দেহে মেখে হই অপারের অভিসারী।

কখনো বা তার প্রার্থনাকে ভুল পথ থেকে ঠিক পথে চালান। কখনো এমনো হয়—যেমন এক্ষেত্রে হয়েছিল—যে, তিনি প্রার্থীর আত্ম-সমর্পণের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তার ভার নেন পুরোপুরি। তখন তিনি করেন কি? না, বলেন খুশী হয়েঃ "যখন আমার 'পরেই পুরোপুরি ছেড়ে দিলে—'রাখতে চাও রাখো, মারতে হয় মারো' বলে —তখন আমার উত্তর শোনোঃ বহুৎ আচ্ছা, যখন আমার উপরেই নির্ভর করলে, তখন ব্যবস্থাও আমি দেব, তোমার মরণের পথেই নবজীবন দিয়ে।" নয় কি তপতী?'

তপতী (সায় দিয়ে): 'আমি আরো একটু জুড়ে দিতে চাই যে, ঠাকুরের কাছে কেউ সত্যি আত্মসমর্পণ করলে যখন তিনি তার ভার নেন, তখন তিনি অনেক সময়েই তার নিয়তিও বদ্‌লে দেন— শুধু পরকালের পারানির ব্যবস্থা করেই নয়, ইহকালেই তাকে বাহন করে তার মধ্যে দিয়ে তাঁর আনন্দলীলার ঝর্ণা ঝরিয়ে। গণেশঠাকুর আমার একটি সঙ্কট সময়ে এসেছিলেন শুধু বিঘ্নহন্তা হয়ে আমার ফাঁড়া কাটাতেই নয়, কৃষ্ণলীলারই একটি নতুন রং ফলিয়ে তুলতে। তাই যেই আমি বললামঃ 'যদি মরণের বিধান দাও তো তাও আমি মাথা পেতে নেব ঠাকুর,' সেই ঠাকুরও যেন হেসে বললেনঃ 'কিন্তু আমি যে জীবনেরই দেবদূত, মরণের যমদূত তো নই।' ফলে হল কি, তাঁর মৃতসঞ্জীবনী করুণায় আমার মুমূর্ষু দেহে এল নবজীবন। তিনি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কী তাঁর ইচ্ছাঃ অর্থাৎ আমরা যেন তাঁর মন্দিরে আরো তারস্বরে গাই তাঁর করুণাই আমাদের ধারণ করে আছে ও তাঁর শরণ নিলে দরকার হলে সে আজো অঘটন ঘটাতে পারে মরন্তকে নব পরমায়ু দিয়ে। অর্থাৎ তিনি আমাদের দেবেন দৃষ্টিদান, আমরা করব তাঁর নামগান।'

বার্বারা (চোখ মুছে): 'কিন্তু একটা কথা দাদা, তাহলে কি বলবেন—প্রার্থনা করা ঠিক নয়—ঠাকুরের কাছে আত্মসমর্পণ করে তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা বলে চুপটি করে বসে থাকাই পন্থা?

অসিত (হেসে) ঃ 'ঠাকুরের ইচ্ছাকেই মেনে নিয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে চুপ করে বসে থাকা কি চাট্টিখানি কথা দিদি ? মোহন মহারাজ প্রায়ই বলতেন, একটি গল্প মনে পড়ে। দুই ভাইয়ের বনে না। এক জমি নিয়ে ঝগড়া। শুভার্থীরা সবাই বলল ঃ মোকদ্দমা না করে কাউকে সালিশ মানাই ভালো। দুইভাই গাঁয়ের মোড়লকে সালিশ মানল। বড় ভাই তাঁকে চিঠি লিখল ঃ 'জমি আমার এ রায় না দিলে আপনার ঘরে আগুন দেব।' ছোট ভাই বলল মুখের উপরই ঃ 'দাদাকে জমি দিলে ঠ্যাং ভেঙে দেব, সাবধান!' মোহন মহারাজ বলতেন হেসে ঃ "বাবা, আমরা ঠাকুরকে এই ভাবেই সালিশ মানি। সাড়ে পনেরো আনা ক্ষেত্রে ঃ আমার মন জুগিয়ে না চললে তাঁর ইচ্ছাকে খেদিয়ে দেব তাঁকে অপদেবতা নাম দিয়ে।" বলবে কি —এর নাম আত্মসমর্পণ ?'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। হাসি থামলে বার্বারা বলল ঃ 'মোহন মহারাজ কে দাদা ? তাঁর নাম তো কই আগে শুনি নি ?'

অসিত ঃ 'ভালোই হল ঠিক সময়েই তাঁর নামটা এসে গেছে। তোমার প্রথম প্রশ্ন ছিল—কোনো সাধুকে আমি দেখেছি কিনা যিনি গণেশ ঠাকুরকে বরণ করে মহাযোগী হয়েছেন ভগবানকে লাভ করে। আমি উত্তর দিয়েছিলাম—দেখেছি। মোহন মহারাজই সেই সাধু। তাঁর বিচিত্র জীবন-কাহিনী সব খুলে বলব আর একদিন। আজ বলি সংক্ষেপে গণেশ ঠাকুর কি ভাবে তাঁর জীবনে এসেছিলেন।

বার্বারা ঃ 'কোথায় থাকতেন তিনি ? হিমালয়ে ?'

অসিত ঃ 'না। নাসিকে তিনি থাকতেন তাঁর গুরুর আশ্রমে। গুরু তখন দেহরক্ষা করেছেন—তিনি ছিলেন তাঁর দুটি গুরুভাই ও একটি গুরুবোনকে নিয়ে।'

সোফিয়া ঃ 'তাঁর খোঁজ পেলেন কী করে ?'

অসিত (মৃদু হেসে) ঃ 'সে আর এক কাহিনী। আমার এক ইংরেজ বন্ধু এক মহাসাধিকার কাছে দীক্ষা নিয়ে সত্যিই বনে চলে

যান। আমি তাঁর ওখানে যাই সেই বনে তাঁর পুণ্যসঙ্গ পেতে। যাবার পথে ট্রেনে এক ধুরন্ধর পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা। তিনি শুনে বললেন আমাকে এক টিপ নস্যি নিয়ে যে, ম্লেচ্ছরা কেমন করে সিদ্ধিলাভ করবে শাস্ত্র না জেনে—তার উপর নারীকে গুরু করে—যে গুরুর পদবী পেতেই পারে না, বলে আমাদের শাস্ত্র। বন্ধুর কাছে পৌঁছিয়ে সেদিন সন্ধ্যায়ই একথা বলতে তিনি বললেন হেসে ঃ 'পণ্ডিতটি আসলে পণ্ডিতমূর্খ, তাই খবর রাখেন না তন্ত্রে নারীর স্থান কোথায়। আর তন্ত্র হল শাস্ত্রের শাস্ত্র সর্বদর্শনসার। শিব পার্বতীকে বলেছেন তন্ত্রে ঃ 'শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তি হাস্যায় কল্পতে'—অর্থাৎ শক্তিকে না জানলে মুক্তিপ্রয়াস হয়ে দাঁড়ায় হাসির কথা। বন্ধুর কাছে আরো শুনতাম উড্রফ সাহেবের তন্ত্রভক্তির ও নানা গভীর ব্যাখ্যার কথা। তাঁর কাছ থেকে ফিরে এসে তন্ত্র পড়া শুরু করলাম। বুদ্ধিবাদী ব্রাহ্ম আর দম্ভবাদী সাহেবদের নানা লেখায় তন্ত্রের নিন্দা পড়তে পড়তে তন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা প্রেজুডিস মতন মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তন্ত্র পড়া শুরু করতে না করতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমাদের সাধনার কত বিধিবিধানই যে তন্ত্র থেকে এসেছে—লীলাবাদ, মন্ত্রবাদ, গুরুবাদ, প্রতিমাবাদ, শিবশক্তিবাদ—কত কী!—একটি শ্লোক বিশেষ করেই মনে লাগল ঃ 'গুরৌ মানুষবুদ্ধিঞ্চ মন্ত্রে চাক্ষরভাবনাম্, প্রতিমায়াং শিলাজ্ঞানং কুর্বানো নরকং ব্রজেৎ'। অর্থাৎ গুরুতে মানুষ বুদ্ধি করতে নেই, মন্ত্রকে অক্ষর মনে করা ভুল, প্রতিমা জড় শিলা নয় নয় নয়। আমি ছেলেবেলা থেকে প্রতীকপূজার ভক্ত তো, তাই প্রতিমাপূজার স্বপক্ষে তন্ত্রের নানা জোরালো যুক্তি আমার মনকে যেন আবিষ্ট করে তুলল।

(থেমে) 'মরুক গে, তন্ত্রের কথা বলতে গেলে ফুরুবে না এক মাসেও। তাই বলি কেমন করে আমার সঙ্গে মহাতান্ত্রিক মোহন মহারাজের সঙ্গে দেখা হল।...হল কি, সেবার বম্বে এসে পৌঁছতেই তাঁর এক গুরুভাই চন্দুলালের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ এক মন্দিরে। সে

সেখানে আমার গান শুনে খুশী হয়ে এসে ধরল আমাকে : 'চলুন না নাসিকে—আমার গুরুভাই মোহন মহারাজ একজন মস্ত তান্ত্রিক তার উপর বাঙালী, আপনার মুখে শ্যামাসঙ্গীত শুনলে কী যে খুশী হবেন…' ইত্যাদি। আমি তো লাফিয়ে উঠলাম। আমি যে একজন তন্ত্রসাধকই খুঁজছিলাম। কী আশ্চর্য যোগাযোগ!

নাসিকে গিয়ে তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম—আরো তাঁর গণেশভক্তি দেখে। গণেশকে আমার কোনো কোনো মারাঠী বন্ধু ঘটা করেই পূজো করেন দেখেছিলাম, কিন্তু তাঁকে ইষ্টবরণ করে জীবন্মুক্তি লাভ করেছেন এমন কোনো পরম ভাগবতের দেখা এর আগে পাই নি। তাই বম্বে এলেই দুচারদিন করে মোহন মহারাজের অতিথি হয়ে তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনা করতাম পরমানন্দেই। কথা হত বিশেষ করে তন্ত্র সম্বন্ধে আর গণেশের সিদ্ধিদাত্রী শক্তি সম্বন্ধে। বলি—তাঁরই জবানীতে। কিন্তু আগে বলতে হবে একটু তাঁর জীবন চরিত।'

দুই

আমার পূর্বাশ্রমের নাম নাই বা বললাম—(বললেন মোহন মহারাজ) —আমার ভাইয়ের নামও বলব না—আমাদের ভিটেমাটির কথাও না। নামগুলি কেন বলতে চাই না—বুঝতেই তো পারো।

আমার পিতৃদেব—ধরো তাঁর নাম মহেশ—ছিলেন ধনীর সন্তান। ঠাকুরদাদা কাঠের ব্যবসায়ে বহু টাকা উপায় করতেন। দিলদরিয়া ছিলেন স্বভাবে, তবু আমি ও আমার ভাই অশোক তাঁর দেহান্তের পরে তিন লক্ষ করে টাকা পাই, মা পান এক লক্ষ।

বাবার আশৈশব ধর্মে ঝোঁক ছিল প্রবল। বলতে কি, তিনি ছিলেন ঝোঁকালো মানুষই বলব। তাই হঠাৎ হোমিওপ্যাথি ডিগ্রি নিয়ে আমেরিকা থেকে ফিরে পা—থুড়ি—তৃপ্তিপুর শহরে এসে বসলেন ডাক্তার হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালোপাথ ডাক্তারদের ঠেস দিয়ে বলা শুরু করলেন 'ওদের স্রেফ আসুরিক চিকিৎসা—মার মার কাট কাট। হোমিওপ্যাথিই হল হিন্দু আয়ুর্বেদের সগোত্র, অর্থাৎ ইনটুইটিভ।'

এ যুগে এধরনের অসমসাহসিক কথা বড় কেউ বলতে সাহস করে না। কিন্তু আমার পিতৃদেব ছিলেন এক বিচিত্র মানুষ ঃ যেমন বুদ্ধিমান তেমনি একগুঁয়ে। যা কিছুই ধরবেন—ধরবেন মোক্ষম আঁকড়ে, তারপর বুদ্ধি দিয়ে দেখাবেনই দেখাবেন যে, সত্যের এই একটিই পথ। বলবেন সঘনেই ঃ 'সহিষ্ণুতা ও নিরীহতা হল দুর্বলের সহজাত কবচকুণ্ডল—পুরুষকে হতে হবে মরদ—he must put all his eggs in one basket! সংঘাত? বাঃ, জীবনটাই তো একটা সংঘাত। বাঁচা মানেই তো প্রতিযোগিতা আর প্রতিযোগিতা খতিয়ে আইন মেনে যুদ্ধ ছাড়া আর কি?' আমি একবার হেসে বলেছিলাম ঃ 'তাহলে অ্যালোপাথ ডাক্তারেরা কী দোষ করল বাবা? তাদের

মূলমন্ত্রও তো রোগের বীজাণুদের সঙ্গে যুদ্ধ।' বাবা অমনি একটুও না দমে সম্পূর্ণ অন্য পথে ছোটালেন তাঁর সর্বগামী যুক্তিবাণকে—এইই ছিল তাঁর তর্কের রীতি—বলেন: 'তোমরা আমার একটা গোড়াকার কথাই ভুলে গেলে: যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মূলে আছে ডাক্তারের ইনটুইশন—স্বজ্ঞা। যুক্তির চৌহদ্দি ছোট্ট, স্বজ্ঞার ক্ষেত্র ব্যাপক। তাছাড়া অ্যালোপাথিতে রোগ সারায় বটে কিন্তু দাবিয়ে দিয়ে। আর কে না জানে—পুঁতে রাখার—সাপ্রেশনের—বিষময় ফল? ওরা টাইফয়েড সারালো তো হল নানা অঙ্গের পক্ষাঘাত। পক্ষাঘাত সারালো তো হল ক্যান্সারের সূত্রপাত। হোমিওপ্যাথি প্রকৃতির সহায়—অ্যালোপাথি চায় খোদার উপর খোদকারি করতে। আরে! কাটাকুটি মানেই তো ইস্তফা দেওয়া—স্বীকার করা যে, পারলাম না রোগ সারাতে। এ কেমন? না, ছেলে কথা শুনছে না, করো তাকে ত্যাজ্যপুত্র। বন্ধুরা সার্জারির নানা অকাট্য কীর্তির কথা বললে হেসে বলতেন: সাহেব পুরাণে বলে: 'One swallow does not make a summer.' তাছাড়া exceptions only prove the rule, জানো না কি? সার্জারির জয়ধ্বনি করবার আগে ওদের এক আধটা সুকীর্তির পাশাপাশি অজস্র কুকীর্তির ঠিক দাও তো—তবে না হিসেব পাবে খতিয়ে অ্যালোপাথিতে লাভের কোঠায় বেশি জমা হয়েছে না লোকসানের।' এমনি নাছোড়বান্দা মানুষ ছিলেন তিনি। সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

আমি দিনের পর দিন তাঁর এই ধরনের বহুরূপী যুক্তিতে চমকে উঠতে উঠতে শেষে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করা শুরু করলাম—খানিকটা আমার নিজের অজান্তেই বলব। তাই বুদ্ধির আমার ধার থাকা সত্ত্বেও এই দোমনা প্রভাবে প'ড়ে উড়ো তর্ককেই বরণ করতে শিখলাম। বেশি কোণঠাসা হয়ে পড়লে বলতাম: 'তা মানুষ হল স্বভাবে বহুমুখী, তাকে একরোখা করতে চেষ্টা করা ভুল। চলুক না সে নানা

পথে, পড়ুক না বিপাকে। চরিত্রের সমৃদ্ধি হয় তো এই উল্টো-পাল্টামির দানেই, যেমন বল বাড়ে বাধার সঙ্গে তাল ঠুকেই, যেমন কুস্তিতে।' মানুষ যুক্তি সাজাতে জানলে, নয়কে হয় করতে পারে—না জানে কে? কেবল দুঃখ এই যে, জীবন যুক্তির ধার ধারে না। তাই মানুষ এত অসঙ্গতিতে ভরা। বাবার ক্ষেত্রে হল কি, যুক্তিবাদী হয়েও তিনি রয়ে গেলেন ধর্মে অন্ধবিশ্বাসী—যদিও একথা তাঁকে বলে পার পাবার উপায় ছিল না। বন্ধুরা কেউ এই নিয়ে তাঁকে ঠেস দিয়ে কিছু বলতে না বলতে তিনি অম্লানবদনে বলতেন: 'বুদ্ধিবাদ তো বিশ্বাসের বিরোধী নয়। কেবল সে চায় চোখে দেখে তবে বিশ্বাস করতে—এই যা তফাৎ।' নাস্তিক বন্ধুরা যদি ঠাট্টা করে বলত: 'তুই কি বলতে চাস যে অনাদি অশেষ ভগবানকে চোখে দেখে তবে তুই আস্তিক নাম কিনেছিস?' বাবা অম্লানবদনে বলতেন: 'না। কিন্তু যদি বলি—দেখারও তো রকমফের আছে, তাহলে? যদি বলি—যাঁরা দেখেছেন বলছেন তাঁদের মাধ্যমে হয় প্রথম দেখা।' তাঁর এক কমিউনিস্ট বন্ধু একবার ঠাট্টা করে বলেছিল: 'এরই নাম নজিরবাদ authoritarianism—ওরফে অন্ধতার ওকালতি।' বাবা সমান হেসে বলতেন: ফুঃ! এ-যুক্তি মানলে তো সবই নজিরবাদ হয়ে দাঁড়ায়। তুই স্ট্যালিন সাহেবের নাম করতে না করতে গলদশ্রু হয়ে পড়িস। তোর যুক্তি মানলে তো বলা যায়—তিনি যে আছেন বলছিস এও তোর অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া কিছুই নয়।'

কমিউনিস্ট বন্ধুটি বললেন অবাক হয়ে: 'ধর্ম ধর্ম করে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি রে? স্ট্যালিন সাহেব আছেন বলি আমরা অন্ধ বিশ্বাস থেকে?'

বাবা বললেন: 'নয় তো কি? অমুক তমুকের অথরিটিতেই তো তুই মানছিস যে, তিনি আছেন?"

কমিউনিস্ট বন্ধু বললেন: 'বাজে বকিসনে। স্ট্যালিন ক্রেমলিনে থাকেন কে না জানে?'

বাবা হাসলেন : 'এ তো স্রেফ শোনা কথা। আমি যদি বলি—ক্রেমলিনে স্ট্যালিন সাহেব নেই, তিনি হচ্ছেন রটনা myth; প্রমাণ কর্ তিনি আছেন।'

কমিউনিস্ট বন্ধু হো হো করে হেসে বললেন : 'মধ্যম নারায়ণ তেল মাথায় দে আজ থেকেই। নৈলে তোকে যেতে হবে শেষে রাঁচি। ক্রেমলিনে গেলেই তাঁর দেখা পাওয়া যায় জেনেও যখন এ-অদ্ভুত যুক্তি তুই দিচ্ছিস তখন—তখন শুধু বলি বলিহারি।'

বাবা বললেন : 'বলিহারি তোর লজিককে—আমার নয়। আমাদের বন্ধু চম্পটি গিয়েছিলেন মস্কো। ক্রেমলিনে গিয়ে স্ট্যালিনের দেখা চেয়েছিলেন। তাতে তারা তাঁকে অর্ধচন্দ্র দেয় আর কি। তখন চম্পট দিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচে। তাঁর কাছে স্বকর্ণে শুনেছি একথা।'

কমিউনিস্ট বন্ধু বললেন : 'তুই কি বলতে চাস রে অর্বাচীন, যে যে-কেউ ক্রেমলিনে গেলেই স্ট্যালিনের দেখা পাবে? অত সস্তা নয়—দরখাস্ত করতে হবে, কারণ দেখাতে হবে—যেতে হবে তাঁর সেক্রেটারির কাছে—'

বাবা বললেন : 'এবার পথে এসো দাদা, পথে এসো। ভগবানের দেখা পেতে হলেও তাঁর প্রিয়পাত্র সেক্রেটারি অর্থাৎ মহাত্মাদের শরণ নিতে হবে—তাঁরা যেভাবে চলতে বলবেন সেভাবে চলতে হবে—এক কথায়, তীর্থপথের খবর নিয়ে সাবধানে যাত্রা করতে হবে, নৈলে খানায় পড়ে হাত পা ভাঙবে, কিম্বা মাঝ পথে রসদ ফুরিয়ে যাবে, কিম্বা হয়ত সামনে অনন্ত মরুভূমির প্রসার দেখে অবিশ্বাস আসবে, মনে হবে—শেষে সুধা-সরোবর আছে এইটাই হল মিথ্যা রটনা, সত্য কেবল—একটানা মরুভূমির পর মরুভূমি।'

বাবার এই ধরনের রকমারি উড়ো তর্ক শুনতে শুনতে যৌবনেই আমি এই জাতীয় কুযুক্তি জাহির করে গোঁফে চাড়া দিতে বেশ পাকা হয়ে উঠেছিলাম। তাই বাবার তর্কের জন্যেই তর্ক করার কথা বললাম একটু জাঁকিয়ে। কিন্তু এবার ফিরে আসি মূল গল্পের খেই ধরতে।

তিন

বাবা একবার নাসিকে গিয়েছিলেন কুম্ভ মেলায়—বললেন মোহন মহারাজ। সেখানে গণেশ বাবা নামে এক সাধুর কাছে তিনি দীক্ষা নেন। গণেশ ঠাকুরকে পূজো করতে করতেই তিনি গণেশবাবা উপাধি পেয়েছিলেন তাঁর এক কোঙ্কনী গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পরে।

গণেশবাবা বাবাকে গণেশমন্ত্রে দীক্ষা দেবার পর বললেন নাসিকেই প্র্যাকটিস করতে। বলেছি—বাবা ছিলেন একরোখা মানুষ। কোনো কিছু ধরলে ধরতেন মোক্ষম আঁকড়ে। গুরু খুঁজছিলেন তিনি দশ বারো বৎসর। শেষে যখন হঠাৎ মিলল সদ্‌গুরু, তাঁর মন প্রাণ সানন্দেই করল দণ্ডবৎ, বললেন করজোড়েঃ 'তাই হবে গুরুদেব। আপনার আদেশ আমার কাছে—ঈশ্বরের আদেশ।'

শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন প্রতি সাধকই ধর্মের পথে চলা শুরু করে সব প্রথম শ্রদ্ধা নিয়ে। তারপর দ্বিতীয় উল্লাসে সে করে সাধুসঙ্গ ওরফে গুরুসঙ্গ। তৃতীয় উল্লাসে সাধু বা গুরুর উপদেশে শুরু করে সাধনা। তারপরে, চতুর্থ পর্বে, আসে অনর্থ, সে-অনর্থ নিবৃত্তি হয়ও ঐ গুরুরই প্রসাদে। এখন, অনর্থ ওরফে বাধার রকমারি রূপ। অনেক সময়ে বাধার নিরসন হতে দেরিও হয়। কিন্তু গুরুভক্তি থাকলে বাধা কাটেই কাটে—যদিও অনেক সময়ে অভাবনীয় ভাবে। বাবার সাধনা শুরু হতে বাধা বা অনর্থ এল প্রথমেই আমার মা-র তরফ থেকে। মা কিছুতেই মানতে চাইলেন না গণেশকে। বললেন অবজ্ঞার সুরেইঃ 'গণেশ আবার একটা ঠাকুর না কি? হাতীমুখো উদ্ভট জীব···তুমি বল কি? মাথা খারাপ না হলে এ কেউ পারে?'

বাবা মাকে অনেক করে বোঝালেনঃ 'শিবকে ইষ্ট করেছ, তন্ত্রে আছে গণেশদেব এসেই শিবের সেক্রেটারি হয়ে আগাগোড়া তন্ত্র লিখেছিলেন।' কিন্তু মা কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। অগত্যা তিনি মাকে তৃপ্তিপুরের প্রাসাদে তাঁর এক বৃদ্ধা দিদির হেফাজতে রেখে সোজা নাসিকে এসে বসলেন তান্ত্রিক সাধনায়। আমি তখন সবে চোদ্দ পেরিয়ে পনেরোয় পা দিয়েছি, অশোকের বয়স তেরো।

চার

মোহন মহারাজ বললেনঃ

বাবা মা-র মধ্যে বেবনতি হলে সন্তানের বুদ্ধির সঙ্গে বেদনা বোধেরও বিকাশ হয় একটু জলদ চালেই। একে তোমাদের সাহেব পুরাণে বলে precocity. কথাটা মিথ্যা নয়, তাই আমি এই বয়সেই অনেক কিছু শিখেছিলাম যা অন্যথা এত কম বয়সে জেনে অকালপক্ক হয়ে উঠতে পারতাম না। ফলে হল কি, মার সঙ্গে বাবার তর্কতে আমি বাবার তরফেই লড়তাম রকমারি যুক্তি জাহির করে। কারণ মাকে আমি বেশি ভালোবাসলেও বাবাকে করতাম বেশি শ্রদ্ধা। তাই ক্রমশঃ আমি কেমন যেন একটা উভয় সংকটে পড়ে গেলাম— কার কাছছাড়া হব, মা-র না বাবার? অনেক ভেবেচিন্তে শেষে ঠিক করলাম যে, ফি বছর ছুটিটা কাটাব নাসিকে বাবার কাছে, বাকি সময়টা মা-র কাছে—তৃপ্তিপুরে। পূজাপার্বণে অবশ্য বাবা তৃপ্তিপুরে আসতেন তাই তখনও তাঁর সঙ্গ পেতাম। কিন্তু সেই সময়েই আবার বাধত বাবা-মার মধ্যে বিতর্ক।

এ বিতর্কের মূল কোথায় বুঝতে পারলাম ক্রমে ক্রমে। ব্যাপারটা এই যে গুরুদীক্ষা পাওয়ার পরে বাবা গুরুর আদেশে ব্রহ্মচর্য বরণ করেন। তন্ত্র সাধনায় অবশ্য ব্রহ্মচর্যের তেমন নাম ডাক নেই। তন্ত্রে

এমন কথাও বলা হয়েছে যে "পুত্রদারৈশ্চসম্পন্নো গুরুরাগম-সম্মতঃ" অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র আছে এমন গুরুই করা চাই। কিন্তু তন্ত্রে এমন কথাও আছে যে ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে শিবশক্তির সম্মেলন হয় না, সঙ্গমকেও অর্ঘ করে সমর্পণ করতে হবে জগন্মাতার চরণে—যে শুধু কামভোগের জন্যে স্ত্রীসহবাস করে সে রৌরব নরকে যায়। কিন্তু গণেশবাবা বাবাকে বললেন যে, স্ত্রীকে বরণ করা চলে তখনই যখন সে বিদ্যা স্ত্রী হয়ে সত্যিকার সহধর্মিণী হয়—শুধু শয্যাসঙ্গিনীই নয়। মা অবিদ্যা স্ত্রী সুতরাং তার সঙ্গ বর্জনীয়—বললেন গণেশবাবা। শুনে মা আরো মরীয়া হয়ে উঠলেন। তারপর সে নানা বিপর্যয়। শেষে মা বিষ খেলেন।

অতিকষ্টে বাঁচলেন বটে কিন্তু রইলেন মনমরা হয়ে। প্রায়ই করতেন কান্নাকাটি। কিন্তু উপায় কি ? গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পরে বাবার স্বভাব সত্যিই বদ্‌লে গিয়েছিল। ছিলেন উদ্ধত, হলেন নম্র। তৃপ্তিপুরে বলতেন: 'মানুষকে চলতে হবে বুদ্ধির কম্পাস মেনে।' গুরুদাস হওয়ার পর বলতেন: 'গুরৌ তুষ্টে শিবস্তুষ্ট' —গুরু তুষ্ট হলে তবে শিব তুষ্ট হন, নৈলে নয়।

তারপর তাঁর জীবনে আরো গভীর দুঃখ এল: যে অশোককে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন সেই অশোক মার দিকে হয়ে তাঁকে উদ্ধত চিঠি লেখা শুরু করল। বাবা মনঃকষ্ট পেলেও উত্তর দিতেন না আরো এই জন্যে যে, সে একুশ বৎসর বয়সে এম. এ. পাশ করেই কমিউনিস্ট পার্টিতে নাম লিখিয়ে বিয়ে করল এক চটকদার কমিউনিস্ট মেয়েকে। বছরখানেক পরে ছেলে হলে নাম দিল মনীষী। এর বারো বৎসর বাদে তৃপ্তিপুরে ব্যারিস্টার হয়ে যখন বেশ পসার জমেছে তখন তার পৃষ্ঠপোষক ব্যারিস্টার রবার্ট ব্লেকের প্রভাবে পড়ে অশোক মদ খেতে শুরু করল। মা এতে কষ্ট পেতেন কিন্তু অশোক বলত এসব বাজে প্রেজুডিস, মাত্রা রেখে একটু লালপানি খেলে শুধু যে ক্ষতি নেই তাই নয়, এটা কালচারের একটি প্রধান অঙ্গ। তার পর

তাঁরই কথায় বারো বৎসর বয়সে মনীষীকে পাঠিয়ে দিল লণ্ডনে এক নাস্তিক স্কুলে। তাকে বড় বড় চিঠি লিখত ঃ আমাদের দেশ ধর্ম ধর্ম করেই ডুবেছে। নৈলে কি বুদ্ধিমান মানুষেরও এমন মতিভ্রম হয়—হাতীমার্কা ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করে? কৃষ্ণ রাম শিব লক্ষ্মী দুর্গা তবু বোঝা যায়, কিন্তু অসভ্য কালী ও উদ্ভট গণেশকে বরণ করতে হলে আবার ফিরে অসভ্য হতে হয় 'আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও' প্রার্থনা করে—এই ধরনের সে আরো কত সাত সতেরো কালাপাহাড়ী কথা।

অশোক যখন মনীষীকে বিলেতে পাঠায় তখন আমার বয়স ছত্রিশ। বিলেতে ডিগ্রি নিয়ে এঞ্জিনিয়র হয়ে তৃপ্তিপুরে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টর হয়ে বেশ পসার জমিয়ে বসেছি। বাবার বয়স তখন সবে ষাট পেরিয়েছে। এমনি সময়ে তিনি খুব শক্ত অসুখে পড়লেন। পেটে ক্যান্সার। তার করলেন আমাকে গণেশবাবা।

আমি মাকে নিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু মাও তখন অসুস্থ। তাছাড়া—বললেন তিনি ঃ 'আমি গেলে হয়ত উল্টো উৎপত্তি হবে। আমার চক্ষুশূল ঐ হাতীমার্কা অপদেবতা। হ্যাঁ অপদেবতা ছাড়া আর কী? ওরই তো শাপে আমার মাথা খারাপ হয়েছিল। আবার তার শাপ মান্যি কুড়োতে চাই না। যার যা পথ। তোর বাবার পথ আমার কাছে বিপথ, তার মতিগতি সৃষ্টিছাড়া নৈলে কি অমন পালোয়ানের ক্যান্সার হত কখনো? আমি আজ কুড়ি বৎসর নিজেকে বিধবা মনে করেই এসেছি। কেন তাও তোর অজানা নেই। কাজেই আমাকে দিক্ করিস নি। যেতে হয় তুই একা যা। কেবল আমার মাথা খাস বাবা, শীগগির ফিরে আসিস। নৈলে হয়ত ও অপদেবতাটির ছোঁয়াচ কাটাতে পারবি না—তুইও ধরবি ঐ বিপথ। শাস্ত্রের কথায় তোর শ্রদ্ধা আছে—তাই বলছি শাস্ত্রে বলেছে মা বাপের চেয়েও বড়—পিতুরত্যধিকা মাতা। স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে স্বামীর ধর্মকর্ম হয়ত সম্ভব হতেও পারে, জানি না—ঐ জঘন্য তন্ত্রসাধনায় সবই সম্ভব।

কিন্তু মার মনে কষ্ট দিয়ে ছেলে বড় জোর বকধার্মিক হতে পারে, কিন্তু তার বেশি না—মনে রাখিস।'

দুঃখিনী মায়ের কথাগুলি আমার মনে দাগ কাটল। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, বাবার ছোঁয়াচে আপ্তবাক্যে আমার মনে শ্রদ্ধা এসে কায়েম হয়েছিল কৈশোরেই। তাছাড়া নাসিকে যখনই যেতাম, শুনতাম কেবল তন্ত্রশাস্ত্রের মহিমার কথা—গুরু মন্ত্র দীক্ষা শিব-শক্তি ··এই সবের জয় ধ্বনি। সংস্কৃতে নানা উদাত্ত শ্লোকও আমার মনকে আবিষ্ট করে তুলত—বিশেষ করে গণেশবাবার মুখে গণেশস্তোত্রঃ 'যতো ভাতি সর্বং ত্রিধা ভেদং ভিন্ন সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ'—অর্থাৎ যাঁর শক্তিবলে সত্ত্ব রজঃ তমঃ-র জগৎ ঝল্‌কে উঠেছে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

গোল বাধাল অশোক। বলল হেসেঃ 'শাস্ত্র? উনি তো কল্প-তরু রে দাদা, না জানে কে! যে যে-বিধানই চায় পায় হাতে হাতে মন্থ পড়না রে, দেখবি কি কাণ্ড! একে ছুঁয়েছ কি ডুবেছ, ওর ছায়া মাড়িয়েছ কি গেলে! তন্ত্র ঠাকুর আরো এক কাটি গেছেন। আমি পড়েছি রে পড়েছি—শুধু হো হো করে হাসতে। বলেছেন কি জানিস? বলছেন সঘনেঃ ব্রহ্মকে চাইবে কিন্তু ব্রহ্মচারী না হয়ে—আশ্রমী গুরুর পায়ে মাথা কুটে! সাবাস! আর গুরুর মহিমাও অপার। তাঁর দীক্ষা 'ভক্তিমুক্তিফলপ্রদা' অথচ 'জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরো গুর্বন্তরং ব্রজেৎ'—কি না, মৌমাছি যেমন ফুলে ফুলে মধু লুটতে যায় জ্ঞানার্থী শিষ্য তেমনি আজ এ গুরু কাল সে-গুরু করে ভবঘুরে হলে দেখতে দেখতে জ্ঞানী বনবেন। ভাবতে পারিস? অথচ এরই নাম অপৌরুষেয় তন্ত্র—যা পঞ্চানন শিবঠাকুরের মধ্যমুখ থেকে বেরিয়েছিল, হা হা হা।'

শুনতে শুনতে মনে খটকা লাগল। তাই তো—তন্ত্র তো দেখছি অসঙ্গতিতে ভরা। তাছাড়া মা যে গুরুজন পূজনীয়া এও তো অপ্রতি-বাদ্য। কাজেই ফের অনেক ভেবেচিন্তে শেষে স্থির করলাম—মা-র

কথা রাখব—বেশিদিন থাকব না নাসিকে, বিশেষ যখন মনের মধ্যে দোটানা রয়েছে। তন্ত্রে যদি ফের শ্রদ্ধা আসে—কাজ কি ও ফ্যাসাদে ?

কিন্তু নাসিকে পৌঁছে মুশকিল হল এই যে দেখলাম বাবাকে ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। অবস্থা শোচনীয়—কিছুই খেতে পারেন না। পেটে ক্যান্সার। অমন যে সহিষ্ণু বলিষ্ঠ মানুষ, ব্যথা উঠলে কাৎরান "গুরুদেব গুরুদেব ঠাকুর ঠাকুর" করে। অথচ কী আশ্চর্য ! বার-বারই দেখি—গুরুদেব এসে ঠাকুরের চরণামৃত দিতে না দিতে ব্যথা কমে যেত ! অশোককে লিখতাম এ-দৈনন্দিন আশ্চর্যের কথা। কিন্তু সে উত্তর দিত না। কেবল একবার তার করেছিলঃ 'All rubbish !' Sheer coincidence advertised as Divine Grace !'

কিন্তু গাজোয়ারি বিদ্রূপের ধার থাকলেও ভার নেই তো। একবার দুবার হলে বলা চলত কাকতালীয়—কোইন্সিডেন্স—কিন্তু বার বার সারলে যে প্রায় পরিসংখ্যান-সাব্যস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের কোঠায় পড়ে ! যাই হোক আমি সর্বদিক বাঁচিয়ে শেষটায় প্রার্থনা করতাম মা-র ইষ্ট শিবঠাকুরের কাছেঃ 'সংসার দুঃখ-গহনাৎ জগদীশ রক্ষ' —সংসারের ঘোর দুঃখ থেকে ত্রাণ কোরো ঠাকুর। গণেশকে লেলিয়ে দিও না, তুমিই এগিয়ে এস ভার নিতে।

তবু মাঝে মাঝে বাবার উপদেশে মার কথা ভুলে গিয়ে চলে যেতাম গণেশ বাবার ছোট্ট মন্দিরে। গণেশ ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে কেমন যেন মনের ভোল বদলে যেত ! তারপর যেই দেখতাম গণেশবাবার গাঢ়কণ্ঠে প্রার্থনা করতে করতে চোখের জলে বুক ভেসে যাওয়া—অমনি মনে জেগে উঠত কেমন যেন একটা নাম-না-জানা বিহ্বলতা যার সঙ্গে আনন্দ জড়িয়ে। অথচ গণেশ ঠাকুরকে তো তেমনি উদ্ভটই মনে হত। এর কারণ কী ভেবে না পেয়ে ফিরে বাবাকে নানা প্রশ্ন করতাম। বাবা বলতেন খুশী হয়েঃ

'তোর আশা আছে বাবা! এখন থাক কিছু দিন। এসব প্রশ্নেরই উত্তর পাবি সবুর করলে! জানিস তো সবুরেই মেওয়া ফলে?'

অমনি আমার মনে এক অনামা আশঙ্কা জেগে উঠত মা তো ঠিক উল্টো উপদেশই দিয়েছিলেন—বেশিদিন গণেশী আবহে না থাকতে। একথা মনে পড়তে না পড়তে আমার সবে-জেগে-ওঠা সব আনন্দের ভক্তির, পূজার সৌরভই উবে গিয়ে কেমন যেন একটা চাপা আক্রোশ জমে উঠত: ভগবান্ কেন এভাবে মানুষকে দোটানায় ফেলেন? তিনি কি জানেন না আমরা কী অসহায়? মনে পড়ত অশোকের একটি বিদ্রূপ: 'তুমি দাদা, অতি ঠুনকো—ঠিক বাবার মতনই কান-পাতলা। কিন্তু মানুষ হতে হলে দাঁড়াতে হবে সব আগে নিজের পায়ে। নৈলে যদুবাবু আমাদের নিয়ে যাবেন উত্তর দিকে মধুবাবু দক্ষিণ দিকে, সিধুবাবু পূব দিকে, রাধুবাবু পশ্চিম দিকে। কোথাওই পাবে না খুঁটি—কেবল কুয়াশার গোলক-ধাঁধায় হাতড়ে ঘুরে মরাই হবে সার।'

অশোকের তীরন্দাজি ছিল অব্যর্থ; সে জানত মোক্ষম আঁতে ঘা দিতে হয় কেমন করে। তাই আমি ওর কথায় আহত হয়ে জ্বলতাম মনে মনে, আর পণ নিতাম নতুন করে নিজের বুদ্ধিতেই চলব—তুক-তাক মন্ত্র তন্ত্র গুরু ফুরুর নয়।

কিন্তু সংশয়ের নানা রূপ। গুরুর উপদেশ মানলে মানুষ অকর্মা হয়ে যায়—অশোকের এ সাহেবি বুলি আমার মনকে শাসালেও নাসিকে বাবার দিকে যখনই চেয়ে দেখতাম তখনই যেন প্রায় থ' হয়ে যেতাম তাঁর চরিত্রের রূপান্তর দেখে। এই অসুখেও তিনি সমানে রোগী দেখতেন! শুয়ে থাকতেন হয়ত তিনদিন, কিন্তু তারপরই "জয়গুরু" বলে উঠে যথাবিধি নিত্যকার্য সমাপন করতেন—ধুঁকতে ধুঁকতে বটে, কিন্তু প্রসন্ন চিত্তেই বলব। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: 'কোথা থেকে আপনি এত কষ্ট সইবার শক্তি পেলেন বাবা? আপনি যে ছিলেন ডাকসাইটে অধীর। একটা ফোড়া হলেও

বাড়ী মাথায় করতেন!' বাবা হেসে বলেছিলেন: 'বাবা, আমার নব-জন্ম হয়েছে গুরুর প্রসাদে। নৈলে কি আর গণেশদেবের কৃপা পেতাম বাবা—না ভক্তের মতন শিবকথামৃত পান করতে সুযোগ পেতাম?' আমি একটু সকুণ্ঠেই বলেছিলাম: 'কিন্তু তন্ত্রকে মানি কেমন করে বাবা? পদে পদে যে উল্টো বিপদ!' বাবা হেসে বললেন: 'বই পড়ে কি জ্ঞান হয় বাবা? তন্ত্রে আছে শিব পার্বতীকে বলেছিলেন:

পুস্তকে লিখিতো মন্ত্রো যেন সুন্দরি জপতে,
ন তস্য জায়তে সিদ্ধি হানিরেব পদে পদে—

মানে বই কনসাল্ট করে মন্ত্র জপলে শুধু যে সিদ্ধিলাভ হয় না তাই নয় পদে পদে ক্ষতি হয়—শেষে আখের নষ্ট। তাই তো আমি চাই তুইও গুরুদেবের কাছে তান্ত্রিক দীক্ষা নে। তার পরেই দেখবি কেমন চোখ ফোটে রাতারাতি।'

শুনেই আমি পেছিয়ে গেলাম। তান্ত্রিক দীক্ষা। কী সর্বনাশ! এইভাবেই তো শনৈঃ শনৈঃ মতিচ্ছন্ন হয়। মনে প'ড়ে গেল মা-র কথা: 'অপদেবতারা তাদের ভুতুড়ে জলপড়া দিয়ে তুকতাক করে জানবি। তাই আর যাই করিস না কেন বাবা, ঐ হাড়ীমুখ দেঁতো দেবতার মন্দিরের ছায়াও মাড়াস নে মাড়াস নে। তান্ত্রিক ভেল্কি-ওয়ালাদের খপ্পরে পড়লে ভুগবি বলে দিলাম।'

মনে হল মা মিথ্যে বলেন নি, তাই এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফেরাই পন্থা। কিন্তু বাবা ক্যান্সারে কাতরাচ্ছেন তাঁকে ফেলে যাই-ই বা কেমন করে।

ভেবে চিন্তে শেষে গণেশ মন্দিরে যাওয়া ছেড়ে দিলাম। মন খুব খারাপ হত, কিন্তু জেদী ছিলাম তো, কিছুতেই ঘেঁসতাম না ওদিকে।

এমনি করে কিছুদিন কাটার পর অস্থির হয়ে উঠলাম। একদিন ভাবতে ভাবতে গোদাবরী গিয়েছি স্নান করতে। ওপারেই গণেশের মন্দির—কী যে ইচ্ছা করছে যেতে। কিন্তু তিন সত্যি করেছি: যাব

না, যাব না, যাব না। যদি পূজা-অর্চা করতে হয় শিবকে করব—তান্ত্রিক গুরু ও হাতীমার্কা গণেশকে দূর থেকে দণ্ডবৎ করাই ভালো।

ভাদ্র মাসের ভরা নদী, স্রোত প্রবল, ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে হঠাৎ পা পিছলে ভেসে গেলাম। তীরে অন্য স্নানার্থীরা চেঁচিয়ে উঠল কিন্তু সেই প্রবল স্রোতে কেউই সাহস পেল না সাঁতরে আমার পিছু নিতে।

এমন সময় গোলমাল শুনে মন্দির থেকে গণেশবাবা বেরিয়ে এসে আমাকে ভেসে যেতে দেখেই ঝাঁপ দিলেন। আমি অল্প অল্প সাঁতার জানতাম কিন্তু ভয়ে নার্ভাস হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম: 'বাঁচান গুরুদেব বাঁচান।' এই প্রথম তাকে গুরুদেব ডাকলাম।

গণেশবাবা চেঁচিয়ে বললেন: 'কোনো ভয় নেই বাবা! তোমার সামনেই ঐ বটগাছের শিকড় ঝুলছে, ধরো চেপে আমি এলাম বলে।' আমি চেয়ে দেখি সত্যিই একটি মোটা শিকড় জলের একহাত উপরে তুলছে। ভরসা পেয়ে তুহাত দিয়ে চেপে ধরলাম। মিনিট খানেক বাদেই গণেশবাবা সাঁতরে আমার কাছে এসে পড়ে উঠে সেই শিকড় ধরে আমাকে টেনে ওঠালেন। পাড়ে উঠেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হল দেখলাম—আমি গণেশ মন্দিরেই শুয়ে। গণেশ-বাবা সে সময়ে মন্দিরেই থাকতেন বিগ্রহের বাঁ পাশে একটি ছোট ঘরে, alcove-এ। বাবার টাকায় আশ্রম গড়ে উঠেছিল তাঁর মৃত্যুর পরে। তাঁর খড়ের বিছানায় আমাকে শুইয়ে তিনি হাতজোড় করে শুধু নাম করে চলেছেন: 'সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ।' শরীর থর থর করে কেঁপে উঠতেই চোখে পড়ল তাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তি ও কানে এল গান তো নয়ই এক আশ্চর্য ঝংকার। মনে হল যেন মন্দিরের প্রতি ইঁট কাঠও দোয়ার দিচ্ছে সে-স্তবে। যে দিকে চাই নীল আলোর ঝর্ণা! অসহ পুলকে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিল। হাত বাড়িয়ে গুরুদেবের পায়ে হাত রেখে কেঁদে বললাম: গুরুদেব, আমি

মহা পাপী—তাই আমাকে গণেশঠাকুর এ শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু আপনি সাধু মহাপুরুষ—আমাকে ক্ষমা না করলে আমার গতি কী হবে বলুন ?'

গণেশবাবা আমার মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ 'ঠাকুর আমার করুণাময়—স্কুলমাস্টার নন। শাস্তি বকশিস ধমকানি হাতছানি এসব হল কাঁচা মনের ব্যাকরণ! কর্মফলে মানুষ খানায় পড়ে যখন হাত পা ভাঙে তখন তিনি কতবারই তো ছুটে এসে ভাঙা হাত জুড়ে দিয়ে যান। তাছাড়া সংসারে পাপী কে নয় বাবা ? আর ভেবে দেখ—পাপী যদি আমরা না হতাম তা হলে তাপহারীর করুণার লীলার পোস্টাই হত কি ? তোমার লক্ষণ ভালো ছিল, বলেছি তো আমি প্রথম দিনই তোমাকে দেখে।' বলে মধুর হেসে ঃ 'তাই তো ঠাকুরের সঙ্গে যড় করে মা গোদাবরী সেটা কাটিয়ে দিলেন।'

গণেশবাবার খড়ের বিছানাতেই আমার দীক্ষা হল ঃ নব-নামকরণ হল মোহন দাস।

পাঁচ

বাড়ি ফিরে বাবাকে সব বলতে তিনি আশীর্বাদ করলেন প্রাণ খুলে। বললেন অনেক কথা, বিশেষ করে তাঁর নিজের সাধনার। সব বলা সম্ভব নয় তবে চুম্বকটুকু না বললেই নয়। বললেন ঃ

'আমি স্বপ্নে পেয়েছিলাম বাবা যে, ঠাকুর তোকে ডাকছেন। তার ওপর মনে আছে তোর নিশ্চয়ই যে, গুরুদেবও বলেছিলেন তোর লক্ষণ ভালো, কেবল একেলে সংস্কারের বিশেষ করে নাস্তিক অশোকের ছোঁয়াচে কিছু বাধা পথ আগলে দাঁড়িয়েছে তবে ঠাকুরের কৃপা যে একবার পায় তার অনর্থ নিবৃত্তির ভারও তিনিই নেন। তবে—বলেছিলেন গুরুদেব—তোকে আরো একটা বড় রকমের ঘা খেতে হবে। যারা কোনো কারণে নিজেকে তাঁর কাছে খুলে ধরতে না চায়, প্রস্তুত হওয়ার পরেও কোনো অবান্তর কারণে আটকে যায়, তাদের পথের বাধা দূর করতে ঠাকুরকে সময়ে সময়ে ঘা দিতে হয়—যেমন লোহাকে বেঁকাতে হলে পুড়িয়ে পিটোতে হয়। তবে আজ আমার সমস্ত ভাবনার নিরসন হয়েছে। কারণ আমার প্রধান ভাবনা, মানে বন্ধন, ছিলি তুই। এবার আমি স্বচ্ছন্দে পাড়ি দিতে পারব ওপারে তাঁর চরণে ঠাঁই পেতে। এতদিন যেতে পারি নি কেবল তোর জন্যই বাবা সত্যি বলছি।'

আমি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললাম ঃ অমন কথা কেন বলছেন বাবা? আপনার শরীর তো এখন ভালোর দিকে?

বাবা বললেন ঃ 'না বাবা, আমার ডাক এসেছে। আমি এতদিন শুধু মনের জোরেই তোকে খুঁটি করে দাঁড়িয়েছিলাম। অবশ্য এ-মনের জোরও দিয়েছিলেন ঠাকুরই। আলো হাওয়া শ্রদ্ধা শক্তি সব-কিছুর উৎস তো তিনিই। রাখতেও তিনি, মারতেও তিনি, ভোগাতেও তিনি, জোগাতেও তিনি, বাবা। আমার দিন ফুরিয়েছে। তবে গুরুর

কৃপায় এ-দেহের দুঃখ আমার দেহকে যন্ত্রণা দিলেও আমার অন্তরকে ছুঁতেও পারে নি। আমি যে গুরুর কৃপায় দেখতে পেয়েছি যে দেহ ও অন্তরাত্মা আলাদা।'

আমার গায়ে কাঁটা দিল, বললাম: 'দেখতে পেয়েছেন? সত্যি বলছেন?'

বাবা হাসলেন: 'সত্যে আঁট না থাকলে কি দেখবার মতন কিছুই দেখতে পাওয়া যায় বাবা? আর আমি শুধু যে এইটুকুই দেখেছি তা নয়। দেখেছি আরো অনেক কিছু। প্রত্যক্ষ করেছি যে, তাঁর করুণা আমাকে ধারণ করে আছে--যেদিন থেকে আমি গুরুমন্ত্র পেয়েছি। এইই হল সবার বড় দর্শনী, বাবা, কারণ এরই নাম সংশয়ের গ্রন্থি-মোচন। তাই তন্ত্রে বলেছে:

সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগর্তি কুণ্ডলী
তদা সর্বাণি পদ্মানি ভিদ্যন্তে গ্রন্থয়োঽপি চ—

অর্থাৎ গুরুর প্রসাদে কুলকুণ্ডলিনী জাগলে যখন ষটচক্রভেদ হয়, তখন সমস্ত বাধার গ্রন্থি খুলে গিয়ে মানুষ অমরের পদবী পায়। তোরও যেমনি এ-দর্শন হবে পাবি তুই জীবন্মুক্তির পরম স্বাদ। ওরে সে যে কী আনন্দ কেমন করে বোঝাবো তোকে বল্?' বলে মুখ টিপে হেসে জুড়ে দিলেন: 'আমি জানি—তন্ত্র সম্বন্ধে যারা না-পড়ে-পণ্ডিত তাদের নিন্দা শুনেই তোর মন বিগড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তন্ত্রের মহিমা ওরা কী বুঝবে বাবা? বুঝতে হলে সব আগে যাওয়া চাই কোনো সিদ্ধ তান্ত্রিকের কাছে। তাই তো আমি রাতদিন এত প্রার্থনা করেছিলাম যে, তুইও গুরুদেবের ছোঁয়া পেয়ে যেন জেগে উঠিস মায়ার ঘোর কাটিয়ে। আজ তুই এ-ছোঁয়া পেয়েছিস তাই আনন্দের আমার অবধি নেই, সত্যি বলছি বাবা। কারণ আজ তোর প্রথম হল সত্যিকার জন্ম—মায়ার কুঠরি থেকে জেগে উঠে পা বাড়ালি মায়াবীর বৈকুণ্ঠের দিকে। কেবল মনে রাখিস যে, শুধু গুরুর কৃপায়ই সংসারের ঝড়-তুফানে অকূলপাথারে কূল মিলতে পারে।'

আমি বললাম : 'কিন্তু গুরুর কৃপা নৈলে মেলে না কেন—একটু খুলে বলুন না।'

বাবা বললেন হেসে : 'সে অনেক কথা, যদি বলিও খুলে তুই বুঝতে পারবি না এখন। আমি চাই—তুই উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই সেই আলো পাস যার বরে সব সংশয় কাটে। তাই আজ শুধু আমি এইটুকু বলেই থামব যে, ঠাকুরের করুণা দৈবী বলেই তাকে বুঝতে গিয়ে যখন আমরা নাকাল হয়ে হাল ছেড়ে দিই তখনই গুরু আসেন সেই দৈবী অনুকম্পাকে আমাদের বুদ্ধির চৌহদ্দির মধ্যে টেনে আনতে। এক কথায়, গুরু আসেন ঠাকুরের মানবিক সংস্করণ হয়ে—কি না দেহের বর্ণমালায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে সুপাঠ্য হতে। দুঃখ এই যে, অশোকটা নাস্তিকতার বিপথে চলল ধর্ম গুরু সাধু শাস্ত্র সবকিছুকেই বাতিল করে দিয়ে। ওর অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে। ঠাকুর অনেকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। বারবার ডাক দেন "ওপথে যাসনে" বলে। কিন্তু আমাদের বিপথে পা বাড়াবার স্বাধীনতাও তো দিয়েছেন তিনিই, নইলে লীলার লক্ষ্যসিদ্ধি হবে কেমন করে? তাই তাঁকে অস্বীকার করারও অধিকার আমাদের মঞ্জুর। কেবল এ-নাস্তিক্যের কর্মফল ফলে চলতি কার্যকারণের বাঁধা নিয়মে—যেমনি আমরা করুণাকে অস্বীকার করে উদোম ছুটতে যাই আমাদের স্বেচ্ছাচারকে বরণ করে। অর্থাৎ তখন দুই আর দুইয়ে ফী বার চারই হয়—পাঁচ পেতে হলে করুণাকে ডাক পাড়তেই হবে, কেননা চলতি কার্যকারণের ধরাবাঁধা নিয়মকে উল্টে দেবার ক্ষমতা—ওরফে অঘটনী শক্তি—শুধু ভগবানের করুণায়ই আছে কোনো মানবিক শক্তির নেই। আমি একথা শিখেছি বাবা, বহু পোড় খেয়ে তবে। তাই চাই—তুই দেখে শিখিস, কারণ তাহলে ঠেকে শিখতে হবে না। অবশ্য ভগবানের করুণা আসার পরেও দুঃখ আসে, কিন্তু সেই সঙ্গে আসে আর একটা জিনিস—দিব্যদৃষ্টি—second sight, তাই দুঃখেরও চেহারা বদ্‌লে যায়। তন্ত্রে একটি গভীর শ্লোকে এই দিব্যদৃষ্টির ইঙ্গিত

আছে ঃ 'যৈরেব পতনং দ্রব্যৈঃ সিদ্ধিস্তৈরেব চোদিতা'—অর্থাৎ কিনা যারা আমাদের পেড়ে ফেলে, গুরুকৃপায় (ওরফে ভাগবতী কৃপায়) তারাই আমাদের সিদ্ধির ধাপে তুলে দেয়। বলতে কি, এইই হল করুণার সব চেয়ে বড় জাদুশক্তি—miracle—যে দুঃখকেও সুখের খেই ধরিয়ে দিতে পারে।

শুনে আমার বুকের মধ্যে শুধু চমক জাগা নয়—শান্তি বিছিয়ে গেল। কে যেন বলল ঃ 'তোমার আর ভয় নেই।' সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ আমার গান গেয়ে উঠল ঃ 'পেয়েছি, সদগুরুর আশ্রয় পেয়েছি।' কেবল একটি প্রশ্ন রইল। শুধালাম বাবাকে ঃ 'এ-দিব্যদৃষ্টি পাব কবে বাবা ?' তিনি বললেন হেসে ঃ 'সে তোর গুরুই বলে দেবেন ঠিক সময়ে! তুই শুধু তাঁর কথায় চলতে শেখ। প্রথমে নত হওয়া, তার পর মেনে চলা, সব শেষে আসবে গুরু ও ইষ্টকে অভিন্ন দেখতে পেয়ে গুরুর পায়ে আত্মসমর্পণ। সেইদিনই হবে বস্তুলাভ, পাবি দিব্যদৃষ্টি, আর এ-দৃষ্টি পেলে দেখতে পাবি—এ-দুনিয়ার চেহারাই বদলে যাবে।'

বলতে না বলতে তাঁর আশ্চর্য ভাবান্তর! চোখ জলে ভরে এল, কথা জড়িয়ে গেল, উত্তান নয়নে গৃহবিগ্রহ গণেশের দিকে চেয়ে গদ গদ স্বরে বললেন ঃ 'এই যে ঠাকুর। প্রণাম···আমার প্রার্থনা শুনেছ··· ওকে টেনে এনেছ···এবার আমাকে ঠাঁই দাও ঠাকুর। আমার কাজ ফুরিয়েছে···টেনে নাও···টেনে নাও।'

বলতে বলতে স্থির সমাধি···শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস। তারপর সব শেষ।

ছয়

অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধ শেষ হলে গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে আমি তৃপ্তিপুরে ফিরে গেলাম। আমার নাম ডাক হয়েছিল বড় এঞ্জিনিয়ার বলে। ফিরে দেখি কাজ জমেছে বিস্তর। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে ধ্যান জপ করবার বেশি সময় পেতাম না। কিন্তু আমার আর তুর্ভাবনা ছিল না। গুরুদেব আমাকে বলেছিলেনঃ 'যা, কাজ কর গিয়ে—কেবল মনে রাখিস কর্মযোগ। প্রতিকর্ম তাঁর কর্ম, তন্ত্রে বলেছে 'যৎ করোমি জগন্মাতাঃ তদেব তব পূজনম'—অর্থাৎ প্রতি কর্মকে দাঁড় করাতে হবে তাঁর প্রত্যক্ষ আরাধনা—প্রতি কাজ তাঁর কাজ, তাঁর জন্যেই করা। এ-কথাটি সর্বদা মনে রাখতে না পারলে কর্ম হয়ে দাঁড়ায় শুধু কর্মভোগ। তাই শিখতেই হবে কেমন করে কর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ রাখতে হয়—গীতা যোগকে 'কর্মের কৌশল' বলেছে—এ-সূত্রের ভাষ্য পেতে হবে তোর নিজের জীবনে। নৈলে এ থেকে যাবে শুধু কথার কথা। বুঝলি?'

মুখে তো বললামঃ 'বুঝেছি গুরুদেব।' কিন্তু ফিরে এসে পদে পদেই ঘা খেয়ে টের পাই যে, সত্যিকার বোঝা জানা চেনার এখনো অনেক বাকি। কেবল এক বাঁচোয়া ছিল—গুরুদেবকে চিঠি লিখলে শুধু যে উত্তর পেতাম তাই নয়—নানা সংকটে তাঁকে ডাকলে প্রায়ই স্বপ্নে তাঁর দর্শনও পেতাম আর সঙ্গে সঙ্গে সংকট না কাটলেও সংশয় কেটে যেত, তামাটে আঁধার হয়ে উঠত সোনালী আলো। কিন্তু এবার পিছিয়ে গিয়ে অশোকের কথা কিছু বলতেই হবে।

সাত

মোহন মহারাজ বললেন ঃ

বাবা বলেছিলেন বটে অশোকের অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে, কিন্তু তৃপ্তিপুরে দেড়বৎসর বাদে ফিরে দেখলাম ওর বোলবোলা— পসার চতুর্গুণ বেড়ে গেছে—পৃষ্ঠপোষক খোদ রবার্ট ব্লেক সাহেবের প্রসাদেই বলব। কারণ সে-যুগে সাহেব সুবো কারুর পিঠ চাপড়ালে সে সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়ত। তার ওপর, যে রবার্ট সাহেবের ইতিমধ্যে পাখা গজিয়েছিল, খেতাব পেয়েছিলেন স্যর, অশোক হয়ে দাঁড়াল তাঁর প্রিয় জুনিয়র, কাজেই পসার প্রতিপত্তি দেখতে দেখতে বানের জলের মতনই বেড়ে উঠল। ওর কপালের জোর আছে বলার পরেও শত্রুপক্ষকে স্বীকার করতে হত ও মেধাবী তথা পরিশ্রমী বটে। ও বলত হেসে ঃ 'সাহেব পুরাণে বলে—nothing succeeds like success রে দাদা! তাছাড়া আমার সীমন্তিনী চপলারও পয় আছে তো। আমাকে ঠেকায় কে?' এই ধরনের জাঁক শুনতে আমার একটুও ভালো লাগত না। বলতাম ওকে সাবধান করতে ঃ 'সাহেব পুরাণে একথাও বলে--pride goes before a fall!' ও দম্‌কা হেসে বলত ঃ 'ওসব হ'ল weakling দের philosophy আমি যে colossus রে, দাদা!'

কিন্তু ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে—বলে আমাদের ঘরোয়া প্রবচন। তাই ওর ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হল ওর ঐ পয়মন্ত স্ত্রীর চাল-চলন থেকেই। চপলা প্রথম থেকেই মা-কে সইতে পারত না—বিশেষ করে এই জন্যে যে, অশোকের চরিত্রের নানা গলদ থাকলেও মাতৃভক্তিতে ওর গলদ ছিল না বলেই চপলা যতবারই শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করত সে নিত মা-র দিক। এতে চপলা মর্মান্তিক দুঃখ পেয়ে

হাজার কান্নাকাটি করলেও অশোক কান দিত না, বলত: 'মা-র কাছে কেউ নয়।' শেষে শাশুড়ীকে কোনো মতেই অপদস্থ করতে না পেরে বৌ এম্‌নি মরীয়া হ'য়ে উঠল যে ঘরে অশান্তি হয়ে উঠল প্রায় দৈনন্দিন, আরো এইজন্যে যে, চপলার আক্রোশে আমিও সায় দিতে পারতাম না। ফলে দেখতে দেখতে দাঁড়াল যাকে বলে unequal fight: আর তিনজনের সঙ্গে একা লড়ে ও পেরে উঠবে কেমন করে?

তারপর সে অনেক কাণ্ড। সব বলার সময়ও নেই, দরকারও দেখি না। শুধু ব্যাপারটা ফেঁপে উঠে ফেটে পড়ল কী ভাবে বলি সংক্ষেপে।

বলেছি—মনীষীকে অশোক বিলেতে পাঠিয়েছিল এক নাস্তিক স্কুলে। মনীষী ছোটবেলা থেকেই ছিল ঠাকুরমার নেওটো। লণ্ডন থেকে সে প্রায়ই তাঁকে বড় বড় চিঠি লিখত, পাঠাত ছবিকার্ড, এ-ও-তা উপহার। মাঝে মাঝেই সে যখন তৃপ্তিপুরে ছুটিটা কাটাতে উড়ে আসত, তখন তার নানা গল্পের সব চেয়ে বড় শ্রোতা ছিল তার ঠাকুরমা, কারণ নাতি বলতে তিনি ছিলেন অজ্ঞান। চপলার সব চেয়ে অসহ হয়ে উঠল এই দৃশ্য: সংসারে যে ছেলে ছিল ওর নয়নমণি, সে-ও কি না শেষে হয়ে দাঁড়ালো এক যন্ত্রণা? ঠাকুরমার সঙ্গে মার ঝগড়ায় সেও কিনা হল বুড়ীর দিকে—মাকে ছেড়ে? কী করবে ও সত্যিই ভেবে পেত না—কেবল মনে মনে এ ও-তা মৎলব আঁটত কী করে মাকে অপদস্থ করবে। সময়ে সময়ে তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়েই তাঁর নামে অকথা কুকথা বলত চাকর-চাকরাণীর সাম্‌নে। কিন্তু হা অদৃষ্ট—যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর: নয়নমণি মনীষীই সব আগে প্রতিবাদ করত ঠাকুরমার হয়ে!

অশোকের দুঃখদুর্দৈব শুরু হল এই ভাবেই। শেষে যখন ক্রমশঃ তার অসহ্য হয়ে উঠল তখন সে মনীষীকে বিলেত থেকে ছুটিতে তৃপ্তিপুরে আনা ছেড়ে দিল। অথচ ছেলেকে না দেখেও থাকতে

পারত না বলে মাঝে মাঝে নিজেই যেত বিলেতে। চপলা তখন রাগ করে বাপের বাড়ী গিয়েই বা করবে কী? শাস্তি দেবে কাকে?

অশান্তি ঘনিয়ে উঠবার আরো কারণ ছিল। চপলা ছিল গরীব ঘরের মেয়ে—কাজেই হঠাৎ ধনী পরিবারে এসে স্বামীর অমিতব্যয় দেখে অস্বস্তি বোধ করত। স্বভাবে সে ছিল অত্যন্ত কৃপণ। তাই অশোককে বারবারই বারণ করত মাকে বা আমাকে এ-ও-তা উপহার দিতে। বলতে ভুলেছি—অশোক আমার পূজা অর্চাকে নেকনজরে দেখতে না পারলেও মানুষ বিচিত্র অসঙ্গতিতে ভরা তো—আমাকে ভালোবাসত। বাইরে সে রুক্ষ হলেও অন্তরে ছিল সত্যিই স্নেহপ্রবণ। তাছাড়া মুখে যাই বলুক না কেন, মনে মনে আমাকে সত্যিই সমীহ করত, আমার আড়ালে বলত বন্ধুমহলে প্রায়ই: 'আমার দাদা প্রতিভাধর—বিদ্যাবুদ্ধি কর্মনৈপুণ্য—কত বড় এঞ্জিনিয়র' ...ইত্যাদি। চপলা এ-ও সইতে পারত না। সে ছিল আঁকড়ে ধরা জাতের মেয়ে। যাকে সাহেবরা বলে possessive, তাই স্বামীর স্নেহ প্রীতির এক আনাও অপাত্রে অপব্যয় বরদাস্ত করতে পারত না। অশোক এতে আরো অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। অথচ স্ত্রী সুন্দরী, তাকে ছাড়তেও পারে না—আসক্তি ছিল তার এত প্রবল যে স্ত্রী বাপের বাড়ি দুচার দিনের জন্যে গেলেও উঠত উতলা হয়ে। চপলাও দেখে শুনে থেকে থেকে ঝোপ বুঝে কোপ মারত আরো জোরে—অর্থাৎ একটু বেবনতি হতে না হতে মুখ ভার করে বাপের বাড়ী চলে যেত। কিন্তু অশোকও ছাড়বার পাত্র নয়—সাজা দিত মনীষীকে ডেকে এনে। চপলা খবর পেয়ে ঈর্ষার জ্বালায় ফিরে আসত নৈলে পাছে 'ডাইনীর তুকতাকে' ছেলে পর হয়ে যায়। এক বিচিত্র পরিস্থিতি।

এইভাবে আরো চার বৎসর কাটার পর নিত্য অশান্তিতে অশোকের রক্তের চাপ বেড়ে গেল। আগেই বলেছি—সে স্যর রবার্টের পাল্লায় পড়ে মদ খাওয়া শুরু করেছিল। অশান্তি যত বাড়তে লাগল

তার মদের মাত্রাও বেড়ে চলল। শেষে মাথা ঘোরা শুরু হল। কিন্তু হলে হবে কি, মন খারাপ হলে সে কারুর নিষেধ শুনত না—মদের মাত্রা আরও চড়িয়ে দিত। মা মর্মান্তিক দুঃখ পেয়ে আরো রেগে বৌকে শাপমান্যি দিতেন ঃ ঘরভাঙানী বৌয়ের জন্যেই অশান্তি ভুলতে ছেলে মদ খায়—বলতেন উঠতে বসতে। চপলা আরো আগুন হয়ে উঠত, কখনো কখনো চলে যেত বাপের বাড়ী—তারপর সেই একই ড্রামার পুনরাবর্তন—ফিরতে হত—অশোকের সঙ্গে পুনর্মিলন হত চোখের জলে। দেহের আকর্ষণে, মাদকতার ক্ষণিক আহুতি—তারপরেই আবার ভিন্নরুচি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে জ্বলে ওঠা আগুনের ধোঁয়ায় গৃহস্থালীর হয়ে উঠা কুরুক্ষেত্র, রেডিও গ্রামোফোনে যেমন একই রেকর্ড বারবার বাজে।

শেষে একদিন ফাটল বোমা। উপলক্ষ্যটা যেমন সামান্য বিস্ফোরণটা হল তেমনি দারুণ।

আট

হল কি, চপলা সেবার অশোকের জন্মদিনে সত্যিই মিটমাট করতে চেয়ে কথা দিল—সে আর অশান্তি করবে না যদি মনীষী ফিরে আসে মাস খানেকের জন্যে। অশোক খুশী মনে মনীষীকে তার করতেই সে উড়ে এল আহ্লাদে আটখানা হয়ে। আর আসতে না আসতে হল কি—না, বলি যথাপর্যায়েই।

বলেছি মনীষী আমাকে ভালোবাসত প্রথম থেকেই, এবার হঠাৎ তার মনে কেন জানি না হঠাৎ ভক্তি এসে গেল। বলল : 'জ্যাঠামণি, আপনার মুখে যেন একটা আলো ফুটে উঠেছে। ব্যাপার কি?' আমি হেসে বললাম : 'গণেশঠাকুরকে সাধাসাধি করলে পাওয়া যায় রে—শুধু আলো নয়, শান্তি—যার এত অভাব এখানে। শুনে সে দ্বিধায় পড়ল বৈকি। কারণ আবাল্য নাস্তিকতায় দীক্ষিত হয়ে তার ধর্মে বিশ্বাস না থাকলেও আমার রূপান্তর তাকে সত্যিসত্যি ভাবিয়ে দিয়েছিল। সে ভাবতে একটু ভালোবাসত বলে হাতড়ে হাতড়েও আলো খুঁজত নিজের ঢঙে।

কিন্তু অনেকদিনের অভ্যাস তো, তার উপর বিলেতে নাস্তিক স্কুলে কেবলই শুনে এসেছে যে ভগবান হচ্ছেন কুসংস্কারের মিথ্যা জল্পনা, মনগড়া নানারঙের ইন্দ্রধনু। তাই মাঝে মাঝেই ঠাকুমাকে বলত এইসব কথা, আর তিনি ভয় পেয়ে ওর মুখ চেপে ধরতেন : 'ছি ছি মণি! অমন কথা বলতে নেই—অকল্যাণ হবে অশোকের।' মনীষী শুনে আরো হাসত। বলত 'অকল্যাণ করবেন কিনি ঠাকুমা? ঐ হাতীমার্কা ঠাকুর?' মা গণেশ ঠাকুরকে নেক নজরে না দেখলেও একটু একটু করে সমীহ করার কিনারায় এসেছিলেন। হাজার হোক হিন্দু গৃহিণী তো—দেবতা, গুরু, গোব্রাহ্মণ—এমন কি হাঁচি

টিকটিকিকেও অমান্য করতে তাঁর কেমন যেন ভয় ভয় করত। বিশেষ আদরের নাতি—কে জানে যদি অকল্যাণ হয়—কাজ কি? কাছে এসে প্রণাম নাই করলাম, দূর থেকে দণ্ডবৎ করতে বাধা কি? তাই মনীষীর মুখে এই ধরনের ব্যঙ্গবিদ্রূপ শুনলে তার মুখ চেপে ধরতেন—'চুপ চুপ! জ্যেঠামণি রাগ করবেন—জানিসই তো ভাই, তিনি কী বিষম বদ্‌রাগী···'

তাছাড়া অশোকের জন্মদিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গিয়ে ঘরে শান্তি আসুক এ তিনিও সত্যিই চেয়েছিলেন—বিশেষ করে চপলা কথা দেওয়ার পরে—যে, সে আর ঝগড়া-ঝাঁটি করবে না। তাই সেদিন ভোরে উঠে গঙ্গাস্নান করে নিজের ঘরে শিবঠাকুরের পায়ে মাথা রেখে প্রার্থনা করলেন: 'অনেক ভুগেছি ঠাকুর, এবার রেহাই দাও—দুর্ভাবনার ভার আর সইছে না···বিশেষ করে মণি-র জন্যে—'

এম্‌নি সময়ে মনীষী এসে হাজির।

'কী করছ ঠাকুমা?'

'আয় দাদু আয়—তোর জন্যেই প্রার্থনা করছিলাম রে.—যেন অকল্যাণ তোর ছায়াও না মাড়াতে পারে।'

মনীষী একগাল হেসে বলল: 'কিন্তু তাহলে তো শিবঠাকুরের কাছে দরবার করে লাভ হবে না। অকল্যাণকে খেদাতে মজুদ আছেন তো ঐ হাতীমার্কা দেঁতো ঠাকুরটি। জ্যেঠামণির মুখে শোনো নি—উনি বড় যে-সে রোজা নন—ডাকতে না ডাকতে ভূত ছাড়ান—সব বাধা বিঘ্ন কাটাতে ওঁর মতন ওস্তাদ অপদেবতা না কি আর দুটি নেই।'

মা সভয়ে মনীষীর মুখ চেপে ধরে বললেন 'চুপ চুপ। জ্যেঠামণি স্নানের ঘরে। যদি শুনতে পান রক্ষে রাখবেন না।'

মনীষী মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে বলল: 'না, ঠাকুমা, ভয় নেই, জ্যেঠামণি গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছেন। শুনতে পাবেন না।'

কিন্তু হবি তো হ আমি ঠিক সেই সময়েই গঙ্গাস্নান করে ফিরছি। মা-র কাছে এসব শুনেছিলাম পরে। কিন্তু গঙ্গাস্নান করে ফিরতেই কানে এল একথা। দুই আর দুইয়ে চার জুড়ে বুঝতে দেরি হল না কী ব্যাপার ঃ মনীষী হাতীমার্কা ঠাকুরকে ঠেস দিয়ে কিছু বলছে।

মনটা গঙ্গাস্নান করে গঙ্গাজল হয়ে এসেছিল প্রায়—এমনি সময়ে মনীষীর হাসি শুনে তার ঠাট্টা কল্পনা করে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। 'সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ' জপ করতে করতে নিজেকে ঠাণ্ডা করলাম কোনোমতে। ভাবলাম ঠাকুরকে ঃ 'বিঘ্ন কাটাও ঠাকুর, আর ভুগিও না। ভয় করে সত্যিই।'

কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয় বলে আমাদের একটি ঘরোয়া প্রবচন আছে। এইজন্যে আমাদের শাস্ত্রে পই পই করে মানা করেছে ভয়কে আমল দিতে। উপনিষদে বলেছে বড় গলা করেই 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'—অর্থাৎ আনন্দকে যিনি ব্রহ্ম বলে চিনেছেন তাঁর আর ভয় থাকে না। আমিও জপ করতে লাগলাম চণ্ডীর প্রার্থনা 'ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি' —ভয় থেকে আমাদের বাঁচাও মা বাঁচাও।

এমনি সময়ে হঠাৎ পাশের ঘর থেকে মনীষীর উচ্ছল হাসি কানে এল। সে ছড়া বাঁধতে পারত ইংরাজীতে—বিলেতে স্কুলে এজন্যে তার একটু নামডাকও হয়েছিল। শুনলাম সে বলছে ঃ 'জানো ঠাকুমা, তোমার চুপ চুপ শুনতে না শুনতে এসে গেল ইনস্পিরেশন। আমি বিলেতে একটা খুকুমণির ছড়া শিখেছিলাম, ভারি চমৎকার সুর—সেই সুরে বাঁধলাম ঃ

'O elephant God, how do you laugh
Or sneeze when you take a pinch of snuff ?'

আমি আর সামলাতে পারলাম না। তক্ষুণি উঠে গিয়ে ওকে ধমকালাম ঃ 'আর কোনোদিন যেন না শুনি এ-গান। খবর্দার!'

গুরুদেব প্রায়ই বলতেন: 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' অর্থাৎ শুভ সংকল্পের পথ আগলে দাঁড়ায় হাজারো বাধা। তাই তো গণেশ ঠাকুরের এত প্রতিপত্তি—বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে যা চাই তা হাতে হাতে জুগিয়ে দিতে তাঁর আর জুড়ি নেই।

কিন্তু তাঁকে হেনস্থা করলে, সাবধান, বিঘ্ন কেটেও কাটবে না। 'এ কুসংস্কার নয় নয় নয় বাবা' বলতেন তিনি বড় গলা করেই। আমাদের ধর্মে উদ্ভট অনেক কিছু ঠাঁই পেয়েছে উদ্ভট কল্পনার মধ্যে দিয়ে নানা গভীর সত্যের দেখা পাওয়া যায় বলেই। স্বামী বিবেকানন্দও বলতেন পৌরাণিকী কথাকাহিনী জনশ্রুতিদেরকে ইতিহাস বা বুদ্ধি দিয়ে কষতে গেলে ভুল হবে—মনের মধ্যে দিয়ে এদেরকে ভেসে যেতে দাও, তবে বুঝবে এদের গভীর তাৎপর্য।*

কিন্তু এ-যুগে এধরনের গভীর কথা শুনলে লোকে হাল্কা হাসি হেসে ভাবে খুব বাহাদুরি হল। কাজেই অশোক-মনীষী-চপলাদের দোষ দিই-ই বা কেমন করে? যুগধর্ম কাটানো তো সহজ নয়। তাই মিথ্যে খেদ করা রেখে বলি যা ঘটল—পরে যা যা শুনেছিলাম।

মনীষী ছিল বিষম অভিমানী। ওর মা-র কাছ থেকেই পেয়েছিল এই প্রবল স্পর্শকাতরতা। ও ভেবেছিল আমি গঙ্গাস্নান থেকে ফিরি নি। যদি জানত আমি পাশের ঘরে তাহলে কখনই ছড়া কাটত না গণেশ ঠাকুরকে নিয়ে হাসাহাসি করে। এ-ও ও জানত যে ওর ঠাকুমা ওকে বাঁচাতে চেয়েই বলেছিলেন অশোকের জন্মদিনে মুখ সামলে কথা কইতে। কিন্তু আমার তাড়া খেয়ে ও সব ভুলে গেল। সোজা চলে গেল চপলার কাছে—পাশের ঘরেই।

---

* "Come not to mythology with ideas of history and reasoning. Let it flow as a current through your mind; let it be whirled as a candle before your eyes without asking who holds the candle: and you will get the circle......" INSPIRED TALKS... *Vivekananda.*

চপলা শুনেই দারুণ রেগে উঠল। সে জানত যে, আমি পাশের ঘরে মা-র সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করছি। তাই আরো রুখে উঠে বলল চেঁচিয়েই: 'তোর জ্যেঠামণির কথা ধরিসনে বাবা। পঞ্চাশেই ভীমরতি হয়েছে তাঁর। তাছাড়া জানিস তো—পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়? যেমন মা তেমনি ছেলে হবে তো।'

শুনেই মার রাগ চড়ে গেল। তক্ষুণি অশোকের ঘরে হানা দিয়ে সব বলে কেঁদে ফেললেন: 'ও হবার নয় বাবা। বৌমার না আছে মাথার ঠিক, না কথার। আমি চলে যাব আজই নাসিক—গণেশবাবার আশ্রমে। তুই বৌ নিয়ে সুখে ঘর কর। তেলে জলে মিশ খায় না তো।'...

আমি মা-র পিছনেই ছিলাম। এগিয়ে এসে বললাম: 'মা ঠিকই বলেছেন অশোক। এ হবার নয়। বৌমা বাগ মানবার পাত্রী নন। তাই আমি আজই বিকেলের ট্রেনে নাসিক রওনা হব মাকে নিয়ে।'

অশোকের মুখ কালো হয়ে গেল। জন্মদিনে এমন সীন হবে ও ভাবতে পারে নি—বিশেষ চপলার কথা দেওয়ার পরে যে সে আর অশান্তি করবে না রাগারাগি করে। ও উঠে তার ঘরে গিয়ে বলল: 'কী বাধিয়েছ আবার?'

আমরা অশোকের পিছনে পিছনে গিয়েছিলাম। আমাদের দেখে চপলা যেন ক্ষেপে গেল। বলল: 'বাধিয়েছেন কিনি? জিজ্ঞাসা করো না তোমার ছেলেকে।'

মা বললেন: 'ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না বৌমা, আমরা চলে যাচ্ছি—আপদ বিদায় হবে আজই বিকেলে। চাও তো এখুনি চলে যাই স্টেশনে।'

অশোক মাকে হাত তুলে থামিয়ে বলল: 'যাবে কোথায় মা! বাড়ী যে তোমার।'

চপলা বলল: 'একা তোমার মার!'

অশোক বলল ঃ 'হ্যাঁ, আইন তাই বলে। তোমার হবে আমরা সবাই মরে গেলে তবে। তার আগে নয়।'

মা বললেন কেঁদে উঠে 'তোর জন্মদিনে এমন কথা বলে বাবা ?'

চপলা টুকল ঃ 'বলতে হয়েছে আপনারই গুণে মা। আমার ছেলেকে শাসন করবার আপনারা কে ? ও একটা ছড়া কেটেছে— এই নিয়ে তিলকে তাল করল কে শুনি !'

আমি বললাম ঃ 'বৌমা, তুমি কমিউনিস্টের মেয়ে তাই বলে ভগবানকে নিয়ে হাসি ঠাট্টার অপরাধের নাম তিলকে তাল করা। আর একথা শুধু যে আমরা জানি তাই নয়, তোমার মডেল সাহেব মেমরাও জানেন—বলেন এর নাম ব্লাসফেমি।'

চপলা রুখে উঠে বলল ঃ 'ভগবানই বটে ! আহা, কী রূপের ছিরি রে ! আর নোংরা চণ্ড তান্ত্রিকদের চেয়ে নাস্তিক কমিউনিস্টরা ঢের ভালো। তাই তো তারা এত বড় হয়েছে।

অশোক বলল ঃ 'চুপ করো। আমার জন্মদিনে আমি চাই না ফের কুরুক্ষেত্র। অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি অশান্তিতে অশান্তিতে। তুমি যদি কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারো—'

চপলা বলল ঃ 'তাহলে তাড়িয়ে দেবে এই তো, বাড়ী যখন তোমার মা-র ? তাই হোক। আমি-ই চলে যাব আমার বাপের বাড়ী। কেবল একটি কথা বলি ঃ অশান্তিতে তুমি কতটুকুই বা ভোগো ? ঝক্কি পোহাতে হয় আমাকেই—শত্রুদের নিয়ে ঘর করতে। বলেই মনীষীকে বলল ঃ 'একটা ট্যাক্সি ডাক এক্ষুণি। সকালের প্লেনেই উড়ে চলে যাব—কলম্বো।' বলেই অশোককে বলে ঃ 'তাঁকে তুমি একটা টেলিগ্রাম করে দাও। তুমিও জুড়োও, আমারও হাড় জুড়োক।'

অশোক বলল ঃ 'কী পাগলামি করছ—আমার জন্মদিনে— '

চপলা চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদে ফেলল ঃ 'জন্মদিন বলেইতো চলে যেতে চাইছি—যাতে—যাতে তোমার আপনার লোকেরা সবাই

তোমাকে নিয়ে হৈ চৈ করতে পারেন। আসল কথা, ঐ দেঁতো ঠাকুরটি যেখানে সর্বেসর্বা সেখানে আমার স্থান নেই। কারণ এখানে বিঘ্ন তো আমিই। তাই মানে মানে আমার সরে যাওয়াই ভালো।'

আমি তখন এগিয়ে এসে বললাম : 'না বৌমা, তুমিই থাকো—আমরাই বিদায় হচ্ছি। মা, তুমি তৈরী হয়ে নাও—বোধহয় দুপুরেও একটা গাড়ি আছে। যত শীঘ্র যাওয়া যায় ততই ভালো।'

অশোক বলল : 'না দাদা, মাকে নিয়ে আমার জন্মদিনে তুমি চলে যাবে এ হতেই পারে না।'

চপলা ঝঙ্কার দিয়ে বসল : 'বটেই তো। মা—মা—মা—মা—মা—স্বর্গাদপি গরীয়সী! ভক্তির বালাই নিয়ে মরি। কে বলে ঘোর কলি—যেখানে মা-র নামে ছেলে কথায় কথায় কেঁদে ভাসিয়ে দেয়—স্ত্রীকে অপমান করে উঠতে বসতে। যা মণি, ডাক ট্যাক্সি।'

বলেই উঠে বাথরুমে ঢুকে শব্দ করেই খিল দিল।

আমি অশোককে বললাম : 'আমরা যাচ্ছি ভাই। তুমি বৌমাকে একটু বুঝিয়ে বলো—'

অশোক ম্লান হেসে বলল : 'ও যখন রাগে দাদা, তখন ওকে বোঝানো, আর মৌচাকে ঢিল মারার পরে মৌমাছিদের শান্ত করা—এ-দুই সমান সম্ভব। ও আগে একটু ঠাণ্ডা হোক, তারপর দেখা যাবে। কিন্তু তুমি যদি মাকে নিয়ে চলে যাও তো আমি গঙ্গায় ডুবে মরব—বলে রাখছি।'

মা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন : 'এমন কথা বলে বাবা, জন্মদিনে!'

মনীষীও কেঁদে বলল : 'আর কখনো এমন কাজ করব না ঠাকুমা' বলেই তাঁকে জড়িয়ে ধরল। আমি ওর মাথায় হাত রেখে বললাম : 'ঠিক আছে। কেবল মা-র জন্যে ট্যাক্সি ডাকিস নি বুঝলি?'

তারপর সে এক ড্রামা! ড্রামাই বটে: মা অশোককে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদেন আর ও-ও কাঁদে মনীষী দেয় দোয়ার। শেষে আমারও চোখে জল এল, আমি আমার ঘরে ফিরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা শুরু করলাম। একটু পরে নীল আলোয় ঘর ছেয়ে গেল। মনে শান্তি ফিরে এল। বললাম সোচ্ছ্বাসে: 'সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ...'

* * * *

কিন্তু ঢিল পুকুরের জলে পড়লে বৃত্ত বড় হতে হতে যতক্ষণ না পাড়ে গিয়ে ঠেকে ততক্ষণ থামে না তো। একেই আমরা বলি কর্মফলের জের। মনীষীর ঐ ছড়ার অপকর্মে যে-ঢেউ উঠল তার শেষ বৃত্ত হল চপলার ট্যাক্সি না পেয়ে প্রস্থান লেডী রবার্টের কাছে। তাঁর বাড়ীটা ছিল সাম্‌নেই, রাস্তার ওপারে। সেখানে থেকে আমাদের না বলে সে উড়ে চলে গেল কলম্বো—লেডী রবার্টের এক দাসীকে সঙ্গে করে।

লেডী রবার্ট চপলাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তাই কথা দিয়েছিলেন যে, সে বিমানে না-ওড়া পর্যন্ত অশোককে খবর দেবেন না। চপলার কলম্বো রওনা হওয়ার পরে তিনি অশোককে টেলিফোন করে সব জানালেন। শেষে বললেন যে, এ-বিতণ্ডায় তাঁর সহানুভূতি চপলারই দিকে।

অশোক ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল: 'আমার জন্মদিনের উৎসব রদ করে দিয়েছি। কেবল আপনারা দুজনে ডিনারে আসবেন সন্ধ্যাবেলা। তাহলেই হবে। এখন থেকে আমি যতটা পারি একলাই থাকব—নিজের কাজ নিয়ে'...

নয়

মোহন মহারাজ বললেন :

মনীষীর মুখে যখন শুনলাম চপলা উড়ে কলম্বো চলে গেছে তখন প্রথমটায় সত্যিই বিশ্বাস হয় নি। অশোকের জন্মদিনে ও যে এভাবে রোখ করে সব ভেস্তে দিতে পারবে, এ আমি ভাবতেও পারি নি। কিন্তু অশোকের কাছে যেতেই দেখি তার ভাবান্তর। বলল : 'এবার মনস্তুষ্টি হয়েছে তো দাদা, আপদ বিদায় করে ?'

আমি বললাম : 'কী বলছিস তুই ? আমরা কী করলাম ?'

ও হাত তুলে বলল : 'আর থাক, দাদা। আমার আর সইছে না। আমি একটু একলা থাকতে চাই।'

আমি আর কিছু না বলে ফিরে এসে মাকে সব বললাম। মা কেঁদেই সারা। 'এ কী হল বাবা? ওর জন্মদিনে…'

* * * *

সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে বসে জপ করছি, এমন সময়ে পাশের ঘরে রবার্ট সাহেবের গলা শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে শ্যাম্পেন বোতলের ছিপি খোলার শব্দ। তারপরেই শুনলাম সাহেবের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, বুঝলাম ইচ্ছে করেই চেঁচিয়ে বলছেন : 'তোমার দাদার ঘরের পাশ দিয়ে আসতেই খোলা জানালায় উঁকি মেরে দেখলাম তিনি পূজোয় বসেছেন ঐ grotesque হাতী ঠাকুরের। হা হা হা।'

অশোক ঈষৎ মত্ত সুরেই সাহেবের অট্টহাসির প্রতিধ্বনি করে বলল : 'দাদা is the limit! তবে শুনবেন মজা ? আজই সকালে মনীষী এক সরেস ছড়া বেঁধেছে…হা হা হা!' বলেই ধরে দিল :

'O elephant god! how do you laugh
Or sneeze when you take a pinch of snuff ?'

অশোক যে স্যর রবার্টের সঙ্গে ষড় করেই আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ঠাকুরকে নিয়ে হাসাহাসি করছে গায়ের ঝাল মেটাতে—বুঝতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। আমি রাগে চোখে অন্ধকার দেখলাম। মদ খেয়ে শুধু বেলেল্লামিই নয়—তার ওপর ম্লেচ্ছ সাহেবের সঙ্গে আমার ঠাকুরকে নিয়ে হাসাহাসি! আমি সোজা ওর ঘরে ঢুকে হাঁকলাম: 'অশোক।'

অশোক আমার মুখের ভাব দেখে থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল: 'কী দাদা?'

স্যর রবার্ট ও লেডী ব্লেক তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন: 'গুড ঈভনিং!'

আমি তাঁদের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে শুধু অশোককে সম্বোধন করে ইংরিজিতেই বললাম: 'তুই জানিস আমি গণেশ ঠাকুরের পূজারী ভক্ত, দাস। যদি তাঁর অপমান করিস তাহলে আমি সয়ে থাকব না মনে রাখিস।'

রাগও তো সংক্রামক, তার ওপর ও প্রকৃতিস্থ ছিল না, বলল রেগে উঠে: 'ভয় দেখাচ্ছ কাকে দাদা? I must call a spade a spade আমি গাইবই ও-গান। এ আমার বাড়ী।'

আমি বললাম: 'না, বাবার উইল অনুসারে যতদিন মা বেঁচে আছেন বাড়ী তাঁর।'

ও হেসে বলল: 'তা হতে পারে, কিন্তু এ-ঘর তো আমার। এখানে বসে আমি যা ইচ্ছে গাইতে পারি, পারি, পারি।'

আমি বললাম: 'না আমি বেঁচে থাকতে আমার ঠাকুরকে গাল দিয়ে এ-বাড়ীতে কেউ কোনো গান গাইতে চাইলে আমি গাইতে দেব না, দেব না, দেব না।'

ও লাফিয়ে উঠে বলল: 'এ-মেলো ড্রামার মানে?—জুলুম না কি?' আমি বললাম 'ভদ্রতার দাবিকে জুলুম বলে না। আর বিদেশীর সামনে যে মোদো মাতাল হয়ে স্বদেশের কেচ্ছা করে

বিলেতে তার নাম cad কি না তোর পেট্রন রবার্ট সাহেবকেই জিজ্ঞেস কর না।'

সচরাচর ও আমাকে সমীহ করেই চলত কিন্তু একে ঈষৎ মাতাল অবস্থা তার উপরে সাহেব বন্ধু ও মেম বান্ধবীর সামনে আমার ওকে cad বলে ডাকায় ও ক্ষেপে উঠে বলল: 'জিজ্ঞেস করব? হুকুম না কি? ইশ্! আমি গাইবই গাইব—বলেই উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে ধরে দিল:

'O elephant God—'

কিন্তু ছড়াটা আর এগুলো না, একেই রক্তের চাপ বেশি, তার উপর মত্ত অবস্থা, সবার উপর, দারুণ ক্রোধ এই তিনের চাপে টলে পড়ল মাটিতে।

তারপর সে কী হৈ হৈ কাণ্ড! যাকে বলে থ্রম্বোসিসের স্ট্রোক। বার ঘণ্টা অজ্ঞান অবস্থায় থেকে মারা গেল। চপলা চলে গিয়েছিল উড়ে কলম্বো, ওর বাপের বাড়ী, তাকে টেলিফোন করা হল। কিন্তু টেলিফোন করলে হবে কী? ফিরতি বার্থ পেতে তার দুদিন দেরি হয়ে গেল, কাজেই অশোকের সঙ্গে তার দেখা হয় নি। অশোক মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগে জ্ঞান হতে ক্ষীণ কণ্ঠে আমাকে শুধু বলল: 'দাদা, আমি ভুল করেছি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু বড় দেরিতে। তুমি মনীষীকে দেখো ও শুভবুদ্ধি দিও।' বলতে বলতে কেঁপে উঠেই এলিয়ে পড়ল।

চপলা অশোকের মৃত্যুর দুদিন পরে এসে সব শুনে একেবারে গুম্। ওর এ ভাব আমি দেখি নি কখনও। তাই একটু ভয় পেলাম বৈকি। কিন্তু কী বলব তাকে? সে আমাদের তল্লাটে ঘেঁষতই না।

দশ

মোহন মহারাজ বলে চললেন :

অশোকের অকালমৃত্যুতে মা শোক পেয়েছিলেন খুবই, কিন্তু মনীষীর মুখ চেয়ে টাল সামলে নিলেন। তারপরে সে আর এক ড্রামা পেকে উঠল মাসখানেক ধরে। শুরু হল প্রথম মনীষীর বিলেত যাওয়া নিয়ে। বলেছি অশোক তাকে এনেছিল ছুটিতে একমাসের জন্যে। ছুটির পরে সে ফিরে যেতে চাইল লণ্ডনে। চপলা বলল : না। মা বললেন : 'এ-শোকের কালো অশান্তির বাড়ীতে মনীষীর এখন না থাকাই ভালো। আমারও মনে হল চপলার সঙ্গে মনীষীর ছাড়াছাড়ি হওয়াই বাঞ্ছনীয়, তাই আমি মা-র সঙ্গেই সায় দিলাম। তাতে চপলা আরো বেঁকে বসল, বলল : 'মনীষী বিলেতে গেলে সেও সঙ্গে যাবে।' তাতে আমি আবার না করলাম। আমার কথার জোর বেড়ে গিয়েছিল কারণ অশোক আমাকেই তার উইলের একসেকিউটর করে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, উইলে অশোক তার ব্যাঙ্কের সব টাকা ও বর্মা শেল-এর পঞ্চাশ হাজার টাকা ডিবেঞ্চার মা-র নামে লিখে দিয়ে গিয়েছিল। চপলার জন্যে শুধু পাঁচশো টাকা মাসোয়ারা। যেদিন উইল পড়া হল চপলা আর সইতে পারল না। রাতে একরাশ স্লীপিং ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা করল।

আমার মনে দারুণ অনুতাপ এলো। মনীষীকে রেগে না ধমকালে তো এহেন বিশ্রী অপঘাত ঘটত না, অশোকও এভাবে মারা যেত না। গুরুদেবকে সব কথা খুলে লিখে শেষে লিখলাম : 'যদি আমি রাগ করে অপরাধ করে থাকি তবে কী প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে জানাবেন কি?' উত্তরে গুরুদেব লিখলেন : 'অপরাধ তোমার

কিছুই হয় নি বাবা। সংসারী মানুষের পক্ষে ক্রোধ সর্বত্রই অন্যায় নয়—একথা মহাভারতেও আছে। বৃন্দাবনের গোপালকেও চক্রধারী হতে হয়েছিল শিশুপালকে সাজা দিতে। মনীষীকে এ-ক্ষেত্রে না ধমকালেই তোমার অপরাধ হত। তুমি যাও মনীষীকে নিয়ে বিলেতে। কেবল তাকে ঐ নাস্তিক স্কুল ছাড়িয়ে একটি ভালো ক্যাথলিক স্কুলে ভরতি করে দিও—ভুলো না।'

আমি লিখলাম ঃ 'বিলেত যেতে আমার ইচ্ছা করে না গুরুদেব। আমি চাই সব ছেড়ে ছুড়ে নাসিকে গিয়ে আপনার পায়ে ঠাঁই পেয়ে জুড়োতে। মনীষী একাই উড়ে যাক না।' গুরুদেব লিখলেন ঃ 'না, ওর ভার অশোক তোমাকেই দিয়ে গেছে। কাজেই তুমিই এখন ওর অভিভাবক। সব আগে ওকে বাজে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে একটা ধার্মিক স্কুলে ভরতি করে দিতে হবে। তাছাড়া তুমি এখনই সব ছেড়ে এখানে এসে সাধনায় বসতে পারবে না। তোমার এখনো একটু আড় আছে। মনে রেখো 'ন ত্বরমানেন লভ্যঃ'—হাঁকু পাঁকু করলেই বস্তুলাভ হয় না—এ বেদের কথা।'

এরপরে আর কথা চলে না। আমি মনীষীকে নিয়ে গেলাম লণ্ডনে। বলাই বেশি—সে মনে সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছিল পরপর দু-দুটি শোক পেয়ে। সবচেয়ে বেশি বেজেছিল ওকে চপলার আত্মহত্যা। ও তাই আরো চেয়েছিল বিলেতে থেকে শোক ভুলতে। ইংলণ্ড ওর সত্যিই ভালো লাগত।

কিন্তু ওকে নিয়ে লণ্ডনে পৌঁছতে না পৌঁছতে ও পড়ল দারুণ জ্বরে—ব্রেনফিবার। ওকে নিয়ে গিয়ে তুললাম এক নার্সিং হোমে। পুরো তিন মাস ও ভুগল। উপসর্গ সে কি একটা? একের পর এক—এ অসুখ সারে তো আর একটা।

এগারো

গুরুদেব লিখেছিলেন ঃ 'আমার এখনো একটু আড় আছে।' লণ্ডনে আসার পরেই বুঝতে পারলাম তাঁর নিদানের তাৎপর্য, পড়লাম এক বিষম পরীক্ষায় ও পারলাম না পাশ করতে।

হল কি, যে-নার্সিং হোমে মনীষীকে নিয়ে ছিলাম একমাস, সেখানে ওকে দেখা শুনো করত এক সুন্দরী স্কচ নার্স—লিলি। মনীষী প্রায়ই ঘুমিয়ে থাকত বলে আমার সঙ্গে লিলির নানা কথা-বার্তাই হত। গত যুদ্ধে ওর একমাত্র ভাই মারা গেছে বলে ও চোখের জল ফেলে আমার মন গলিয়ে দিত প্রায়ই। তারপর সে অনেক কাণ্ড ঃ ফল যা হবার—আমি পড়লাম ওর প্রেমে। আর সে যে কী প্রবল আসক্তি—কী বলব ? অথচ আমি দেখতে পেলাম না এ আসক্তির স্বরূপ—বোধহয় ঐ আড়েরই জন্যে। তাই উচ্ছ্বাসে অধীর হয়ে নাসিকে গুরুদেবকে লিখলাম বোকার মতন ঃ 'গুরুদেব, আপনার শ্রীমুখেই শুনেছি যে তন্ত্রে বলে সবচেয়ে বড় সাধনা হল সস্ত্রীক সাধনা, স্ত্রীকে শক্তি করে নিয়ে। আপনার কাছেই শুনেছি যে, তন্ত্র বলে ঃ 'শৃঙ্গার পরমার্থসূচকঃ' প্রেমই পরমার্থে পৌঁছে দেয়। আমার মনে একটুও সংশয় নেই যে, আমি আমার 'শক্তি' পেয়েছি। লিলি ভারতবর্ষকে মনে মনে পূজা করে এসেছে আশৈশব। বলে —বিলিতি সভ্যতার নিষ্ঠুরতা তার আর সয় না। এখানে সে আর্য-সমাজের বিধানে শুদ্ধি নিয়ে হিন্দু হতেও রাজী। সুতরাং আপনি নিশ্চয়ই অমত করবেন না ? আমি এর আগে কখনো কাউকে এত ভালোবাসিনি··· আমার প্রেম ··ইত্যাদি।

কিন্তু গুরুদেব উত্তরে হানলেন নিষ্ঠুর শক্তিশেল ! লিখলেন ঃ 'লিলি তোমার শক্তি নয়। তার যে ছবি পাঠিয়েছ তা দেখে মনে

হয় সে ফাঁকিবাজ মেয়ে, টাকার লোভে তোমাকে গাঁথতে চাইছে। তাকে বিয়ে করলে তুমি দারুণ অসুখী হবে। তার ভাঁওতায় ভুলো-না বাবা! আর, এ প্রেম নয়, রূপ মোহ। দুদিন বাদে মোহের রং ফিকে হতে না হতে দেখবে ওর সঙ্গে গভীরে তোমার কোনো মিলই নেই। আর একটা কথা মনে রেখোঃ 'শক্তির সঙ্গে যুগলে সাধনা করবার আদেশ খুব কম সাধকই পায়—কেন না এ অত্যন্ত কঠিন পথ।'

আমার বিষম রাগ হল। লিলিও বোঝালো সন্ন্যাসীরা সেন্ট বলেই অমানুষ, বোঝে না গৃহী মানুষের সুখ দুঃখ—জানে না প্রেমের মর্ম। গুরুদেবকে ভালোবেসেও আমার মতিভ্রম হল আসক্তির টানে। মনে হল লিলির কথাই ঠিক। গুরুদেব বালব্রহ্মচারী গণেশ ঠাকুরের হালচাল জানতে পারেন, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের ক্ষুধার খবর রাখবেন কেমন করে? বিশেষ যখন তিনি নিজে শক্তি নিয়ে সাধনা করেন নি। ক্ষোভবশে গুরুদেবকে (এই প্রথম) কঠিন চিঠি লিখলাম সেকেলে ও অসহিষ্ণু বলে। তিনি জবাব দিলেন না। তাতে রাগ আরো বেড়ে গেল। লিলিকে আর্যসমাজী মতে বিয়ে করে বসলাম।

বিয়ে করে প্রথম কয়েকমাস যেন মনে হল 'এই-ই তো স্বর্গ মর্ত্যে আসে নেমে—মর্ত্য স্বর্গে ওঠে প্রেমে।' গুরুদেবকে ফের লিখলাম উদ্ধত হয়েই যে, কোনো গুরুই অভ্রান্ত নন—হতে পারেন না—তাই তিনি দেখতে পেলেন না যে, আমি পেয়েছি আমার শক্তি—পথের পাথেয়ঃ লিলি ও আমি হাত ধরাধরি করে অমরাবতীতে পৌঁছলাম বলে। কেবল সেখানে গণেশ ঠাকুরের দেখা মিলবে কি না সেই প্রশ্নটি মুলতুবি রেখে দিলাম।

গুরুদেব সে-চিঠিরও উত্তর দিলেন না।

বারো

তারপরেই হল স্বপ্নভঙ্গের শুরু—মনীষীকে কেম্ব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে ভরতি করে দিয়ে দেশে ফিরে আসতে না আসতে। সে খুঁটিনাটির পালা সব বলা সম্ভব নয়। প্রথম বাধল মাকে নিয়ে। মার আর কোনো ঠাঁই ছিল না তো, তাই তৃপ্তিপুরে আমার কাছেই তাঁকে থাকতে হত বারোমাস। লিলি কেমন করে সইবে এ-ব্যবস্থা? মাদার-ইন-ল-র সঙ্গে ঘর করা এ কি ভাবতে পারে কোনো খাস মেমসাহেব? লিলির মুখেই শুনেছিলাম, একদা তার এক সখী তার মাদার-ইন-ল আসছেন শুনে কুকুরের লেজ কেটে দিয়েছিল পাছে সে মাদার-ইন-লকে দেখে লেজ তুলে নেচে আনন্দ জানায়।

কিন্তু উপায় কি? একদিকে মাকেও বরখাস্ত করা অসম্ভব, ওদিকে মা-ও ওকে বরদাস্ত করতে পারেন না। তখন মনে পড়ল গুরুদেবের একটি কথা: যে, চলতি প্রেম আসে বিবাহের আকাশে অপরূপ রঙে, কিন্তু সে-আকাশে প্রেমের নবারুণ দেখতে দেখতে অস্ত যায়। অন্ততঃ, আমার ক্ষেত্রে তাই হয়ে দাঁড়ালো অক্ষরে অক্ষরে: রোমান্সের রাঙা উষা দুদিনেই এলো ধূসর হয়ে তারপর রঙের ছিটে-ফোঁটাও রইল না, হত শুধু ধারাবর্ষণ—যখন তখন।

কিন্তু বলে না—it's an ill wind that blows nobody any good? গুরুদেব একথার ভাষ্য করতেন—সাধক যদি আন্তরিক তাঁকে চায় তবে তার পদস্খলনের মধ্যে দিয়েও তিনি তাকে কিছুটা ক্ষতিপূরণ দেন: করুণার এ একটা ভঙ্গি নিজেকে জানান দেবার। আমার ক্ষেত্রে হল এই যে, লিলি ক্রমশঃ একে একে যা কিছু হিন্দুরা মানে তাকেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা শুরু করল। সেই দুর্লগ্নে ক্রমশঃ মা এসে দাঁড়ালেন আমার দিকে। ইংরাজী তিনি খুব

ভালোই জানতেন তাই কথা কাটাকাটিতে হার মানতেন না। লিলি সময়ে সময়ে রুখে উঠে যেই তাঁকে ছোবল মারত mad ninny বলে, তিনি ফিরিয়ে দিতেন সে কমপ্লিমেণ্ট তাকে bad penny বলে। সে যদি তাঁকে খোঁটা দিত senseless fool বলে, মা তাকে পিঠ পিঠ জবাব দিতেন witless doll বলে, ইত্যাদি।

গুরুদেবকে লিখতাম সব খুলে। উত্তরে তিনি শুধু লিখতেন ধৈর্য ধরতে। কিন্তু আমি সময়ে সময়ে আর তিষ্ঠুতে পারতাম না এ নিত্য অশান্তি। অথচ সমাধানও খুঁজে পেতাম না। শেষে একদিন দয়াল ঠাকুরই সব জট খুলে দিলেন এক মুহূর্তে—ঠিক যেমন ফোড়া পেকে উঠলে সার্জনে তাকে কেটে ব্যথার সুরাহা করে দেয়। আর এ-ও ঘটল একটা সামান্য ঘটনা থেকে।

হল কি, লিলি গণেশ ঠাকুরকে নিশানা করে হাল্কা রসিকতা করা শুরু করতেই মাও রুখে উঠে আমার সঙ্গে গণেশ ঠাকুরের স্তবে যোগ দেওয়া শুরু করলেন যেন ওকে দেখিয়ে। কথায় কথায় ইচ্ছে করেই ওর সামনে আমার গণেশ-বিগ্রহের সামনে দণ্ডবৎ হয়ে কিম্বা চেঁচিয়েই প্রার্থনা করতেন। একদিন যেই এইভাবে প্রণাম করছেন সেই ও বলে উঠল ঃ 'আমার সব সয়, সয় না শুধু old bitch এর কান্না।' মা তীক্ষ্ণ হেসে প্রার্থনা করলেন ফের ঃ 'ঠাকুর, আমার সব সয়, সয় না শুধু white witch এর বায়না। আমার ধার্মিক ছেলেকে মুক্তি দাও ডাইনির তুকতাক থেকে।'

মার সঙ্গে লিলির এর আগে অনেক বারই তকরার হলেও ঝাঁঝ এভাবে কখনো মাত্রা ছাড়িয়ে যায় নি। আমি কেবল গুরুদেবকে ডাকছিলাম আকুল হয়ে, হয়ত তাই সমাধান এলো—যদিও এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পথে। হল কি, লিলি রেগে আগুন হয়ে গণেশ বিগ্রহটি ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে বাথরুমে গিয়ে সশব্দে ফেলে দিল বিষ্ঠাকুণ্ডে। মা চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ 'ওরে রাক্ষুসী এসেছে রে, রাক্ষুসী—আমাদের সবাইকে খেতে।'

আমি হঠাৎ পথ দেখতে পেলাম। কোত্থেকে আলো এলো বলতে পারি না। কিন্তু বেদনার বিদ্যুতে আমার মনের আঁধার কেটে গেল একমুহূর্তেই। আমি বাথরুমে গিয়ে ঠাকুরকে উঠিয়ে সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে লিলিকে একটি কথাও না বলে সেইদিন বিকেলের প্লেনেই উড়ে বম্বে পেঁ ীছে মোটরে সোজা নাসিকে পেঁ ীছলাম রাত দশটায়। আমার সঙ্গ নিলেন মা, কাজেই গৃহত্যাগ করা একটু সহজ হল বৈ কি।

নাসিক থেকে লিলিকে চিঠি লিখলাম যে আর ফিরব না—সে ডাইভোর্সের জন্যে দরখাস্ত করতে পারে, তাকে খোরপোষ আমি দেব অবিশ্যি।

লিলি ভয় পেয়ে গেল। চিঠির পর চিঠি লিখে উত্তর না পেয়ে শেষে দূত পাঠালো। কিন্তু আমি টললাম না। অগত্যা শেষে সে নিজে এসে হাজির। তারপরে সে কী কাকুতি মিনতি! কিন্তু আমার মন গলল না। বললাম: 'যা করেছ তার জন্যে তোমাকে ক্ষমা করতে পারি, কারণ গুরুদেব অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু এর পরে আর তোমার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখতে পারি না। তোমাকে প্রতি মাসে খোরপোষ বাবদ পাঁচশো টাকা মাসোহারা পাঠাব, ভেবো না। বাকি টাকা সব গুরুদেবের। মা-ও এ-ব্যবস্থায় শুধু সায় দেওয়া নয়—গুরুদেবের কাছে গণেশ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে অশোক তার উইলে তাঁকে যা কিছু দিয়ে গিয়েছিল তার অর্ধেক ও তৃপ্তিপুরের বাড়ীটা মনীষীর জন্যে রেখে বাকি সব—প্রায় দুলক্ষ টাকা—গুরুদেবের চরণে প্রণামী দিয়ে বললেন কেঁদে: 'সারা জীবন কেবলই কেঁদেছি ঠাকুর। কেবল আপনার কৃপায়ই যা-একটু শান্তির আভাস পেয়েছি, তাই আমার ছেলের সঙ্গে আমাকেও আপনার পায়ে ঠাঁই দিন।'

তেরো

সোফিয়া বলে উঠল : 'কী কাণ্ড!'

বার্বারা গাঢ় কণ্ঠে বলল : 'সত্যি দাদা। কেবল—'

অসিত : 'কী?'

বার্বারা : 'আমার ভাবতে সত্যি অবাক লাগে—বিগ্রহ আপনাদের দেশে—কী বলব- মনে হয় যেন জীবন্ত। নৈলে কি এভাবে এসে শুধু নানা সংসারকে তছনছ করে দেওয়া নয়, মানুষের মন পর্যন্ত বদলে দিতে পারে? তাই ফের বলছি—আপনাদের দেশে ধর্মে বিশ্বাস বোধহয় এখনো তেমনি জীবন্ত আছে যেমন আমাদের দেশে ছিল মধ্যযুগে।'

অসিত (হেসে) : 'সাধারণভাবে অতটা বলা চলে না। তবে একথা সত্যি যে, এমন সত্যিকার সাধু আমাদের দেশে আজও মেলে যাদের বিশ্বাসের, জ্ঞানের ও প্রেমের আগুন অনেক বদ্ধজীবেরই কামনা বাসনার বন্ধনকে ছাই করে দেবার শক্তি রাখে। আর এ-শক্তির অনেকখানি রসদ জুগিয়েছে তান্ত্রিক সাধনা—বিশেষ করে ভক্তিমার্গে—গুরুপূজা ও মূর্তিপূজার দীক্ষা দিয়ে।

সোফিয়া (তপতীকে) : 'আপনি কী বলেন দিদি?'

তপতী (একটু চুপ করে থেকে) : 'আমার মনে হয় যে, ভক্তি জীবন্ত হতে পারে না মূর্তি বিনা। আর প্রতি মূর্তিই ভক্তির মধ্যেও বৈচিত্র্য আনে—অনুভবে নয় হয়ত—কিন্তু প্রকাশভঙ্গির বদল হয়ই মূর্তির বৈচিত্র্যের দরুন। নয় দাদা?

অসিত (চিন্তিত সুরে) : 'সেটা কি শুধু মূর্তির বৈচিত্র্যের দরুন বলবে, না মূর্তির মধ্যে দেবতার আবির্ভাবের দরুন যাকে তন্ত্রে বলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। একথা আমার মনে হত আরো দিনের পর দিন

মোহন মহারাজের ভাবাবেশ দেখে। গণেশের মামুলি পূজাতো অনেকেই করে, বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে। কিন্তু কজনের কাছে তিনি জীবন্ত হয়ে ওঠেন? বোধহয় সাড়ে পনেরো আনা পূজারীর কাছেই তিনি থেকে যান পাথরের প্রতিমা বা মাটির বিগ্রহ—তার বেশি নয়। কিন্তু গণেশবাবা, মোহন মহারাজ, তাঁর বাবা, মা, শেষে সরলার কথা যখন ভাবি তখন মন না মেনে পারে না যে এঁদের কাছে গণেশ ঠাকুরের মূর্তি সজীব না হলে তাঁরা কেউই তার টানে সংসার ছাড়তে পারতেন না। এ-প্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই সরলার কাছে উচ্ছ্বসিত হয়ে উদ্ধৃত করতেন কুলার্ণব তন্ত্রের একটি শ্লোক ঃ

'গবাং সর্বাঙ্গজ ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাৎ যথা,
তথা সর্বগতো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে—'

অর্থাৎ, যেমন গাভীর সর্বাঙ্গে দুধের উপাদান ছেয়ে থাকলেও সে ঘন হয়ে ঝরে তার বাঁট থেকে, তেমনি দেবদেব সমস্ত বিশ্ব ছেয়ে থাকলেও দয়াঘন হয়ে ধরা দেন প্রতিমার মধ্যে দিয়ে।'

তপতী ঃ 'ঐ দেখ দাদা, কেবলই ভুলে যাবে। সরলা কে ওদের বলবে কবে?'

অসিত (অপ্রতিভ) ঃ 'বটে বটে। সরলা হল মনীষীর স্ত্রী—মানে এর প্রায় দশবারো বছরের পরের কথা। বলি শোনো। কত-দূর বলেছি?'

সোফিয়া ঃ 'মোহন মহারাজের মা-ও গণেশবাবার কাছে দীক্ষা নিয়ে রয়ে গেলেন নাসিকেই।

বার্বারা ঃ 'বরাবরের জন্যে?'

অসিত ঃ 'না। তাঁর মনে তখনো দ্বিধা ছিল। কারণ মনীষীর প্রতি মমতা—(হেসে) আমাদের দেশে বলে নাতির প্রতি মমতা অপত্যস্নেহকেও হার মানায়—এ যেন মহাজনের সুদের প্রতি মমতা—যা মূলধনের প্রতি মমতাকেও ছাড়িয়ে যায়। যাহোক গল্পের খেই ধরি ফের বোঝাতে—আমি কী বলতে চাইছি।'

চৌদ্দ

অসিত বলল : 'মোহন মহারাজ তাঁর মাকে নিয়ে এককথায় নাসিক চলে যেতে তাঁর স্ত্রী লিলি যখন ভয় পেয়ে তাঁর কাছে এসে ক্ষমা চায় তখন তার স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল খারাপ। সাংসারিক অশান্তিতে যে মানুষের দুর্ভোগের অন্ত থাকে না একথা সবাই জানে। লিলি জানত না শুধু একটি কথা : ধর্ম কোনো সাধকের কাছে যে অনুপাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে সংসার তার কাছে ঠিক সেই অনুপাতেই মরন্ত হয়ে পড়ে। গীতায় এই কথাই বলেছে বড় চমৎকার করে একটি গভীর শ্লোকে :

'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ'

শ্লোকটির ভাষ্য এই যে, মোহমুগ্ধেরা যাকে আলোছায়া ভেবে বুকে জড়িয়ে ধরে, জীবন্মুক্তরা তাকে কালোছায়া জেনেই বর্জন করেন এবং ভাইসি ভার্সা, অর্থাৎ জীবন্মুক্তরা যাকে বরণ করে পরম সত্য বলে মোহমুগ্ধরা তাকে কবিকল্পনা বলে বাতিল করতে চায়।

'লিলি তাই কেমন যেন থ হয়ে গেল। তৃপ্তিপুরের বিলাস ছেড়ে স্বামী এককথায় কেমন করে নাসিকে একটা সামান্য আট-চালায় এসে এক বৃদ্ধ গুরুকে আঁকড়ে ধরে সংসারকে বরখাস্ত করতে পারল?'

বার্বারা : 'লিলির থ' হয়ে যাওয়ার কথা মোহন মহারাজ বলে ছিলেন নাকি, না লোকমুখে শুনলেন?'

অসিত : 'না। এরপর আমার যখন লিলির সঙ্গে বিলেতে দেখা হয় তখন সে-ই বলেছিল আমাকে। মোহন মহারাজই আমাকে বলেছিলেন লণ্ডনে তাকে বলতে যে, কোর্টের রায়ে তার প্রাপ্য

মাসোহারা মাত্র পাঁচশো টাকা হলেও তিনি তাকে মাস মাস হাজার টাকা করে পাঠাবেন। শুনে তার সে কী কান্না! বলল: আমি তো চেয়েছিলাম মিটমাট, কিন্তু তিনি বেঁকে বসলেন, কিছুতেই ক্ষমা করলেন না। আমি তাতে বলেছিলাম যে, মোহন মহারাজকে সে চিনতে পারে নি। তিনি রাগী হলেও খাঁটি সাধু। তাই রাগ তাঁর পড়ে যায় দেখতে দেখতে। তিনি আমাকে বিশেষ করেই তাকে জানিয়ে দিতে বলেছেন যে তাঁর মনে রাগ নেই একটুও, লিলিও যেন মনে ক্ষোভ পুষে না রাখে, নৈলে তিনি দুঃখ পাবেন।'

বার্বারা: 'শুনে বড় ভালো লাগলো দাদা, শুধু জীসাসও শতমুখে ক্ষমার গুণ কীর্তন করেছেন বলেই নয়, যোগীরা ভগবানকে ডেকে যে নিষ্করুণ হয়ে দাঁড়ান না এ-সত্যটির পরিচয় পেয়েও বটে।'

অসিত: 'ঠাকুর সব যোগীকে একছাঁচে ঢালাই করেন না দিদি। মোহন মহারাজের হৃদয় ছিল বড় নরম। নইলে হয়ত তিনি অশোক চপলা লিলি ও পরে মনীষীর ব্যবহারে এত দুঃখ পেতেন না। দরদীও ছিলেন তিনি স্বভাবে। কেবল লিলিকে বিয়ে করে বহু দুঃখ পেয়ে একটি জিনিসের 'পরে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অসহিষ্ণুই বলব: সাহেবিয়ানা। (হেসে) বলতে একদিনের কথা মনে পড়ে গেল—গল্পের দিক দিয়ে হয়ত একটু অবান্তর, তবু বলবার মত—তাই বলি শোনো।

'গণেশবাবা দেহরক্ষা করার পর মোহন মহারাজই গুরুর গদিতে বসেছিলেন—লিলিকে বিদায় দেবার দশবারো বৎসর পরে। মনীষী ততদিনে তৃপ্তিপুরে ব্যারিস্টার হয়ে বাপের গদিতে বসেছে, আর ঠাকুরমা ফিরে গেছেন তার দেখাশুনা করতে। মনীষীর মেধা ছিল অসামান্য, তার ওপরে খাটতেও পারত অদ্ভুত। কাজেই দেখতে দেখতে ব্যারিস্টারিতে যথেষ্ট টাকা কামাতে শুরু করল। মোহন মহারাজ আমাকে আরো বলেছিলেন হেসে: 'মা নাতবৌ-এর জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন। লিখেছেন সেদিন: ওর বৌ হলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে

তার হাতে ওকে সঁপে দিয়ে তোর কাছে চলে যাব। আর কতদিন সংসারের গোয়ালে বাঁধা পড়ে থাকব বল? শেষরক্ষা তো চাই। তাই গুরুর আশ্রমেই 'সদা তং গণেশাং নমামো ভজামঃ' জপ করতে করতে পরপারে পাড়ি দিতে হবে বাবা। কেবল বিয়ের সময় তুই এসে আশীর্বাদ করে যাস এই অনুরোধ রইল।'

শুনে আমি একটু আশ্চর্য হয়েই হঠাৎ মুখ ফসকে প্রশ্ন করে বসলামঃ 'আপনার মা শিবপূজা করতেন শুনেছি আপনারই মুখে। তিনি তাঁকে ছেড়ে minor God গণেশের আশ্রয় নিলেন কেন? আপনার প্রভাবে না গণেশবাবার?'

মোহন মহারাজের অনেকগুণ থাকলেও তিনি ছিলেন রগচটা মানুষ। অবশ্য আমি গণেশ ঠাকুরকে minor God বলে খুবই অন্যায় করেছিলাম কেবল আমার সাফাই এই যে, তখন তো তপতী আসে নি, তাই জানতাম না গণেশ ঠাকুরের মহিমার কোন প্রত্যক্ষ কি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু মুখের কথা আর হাতের তীর একবার বেরিয়ে গেলে তো আর ফেরানো যায় না। তাই ধমক খেতে হল, মোহন মহারাজ চটে উঠে বললেনঃ 'তোমার লক্ষণ ভালোই ছিল বাবা, কেবল ডুবলে সাহেবিয়ানার দয়ে মজে?'

ধমক খাওয়া আমার অভ্যেস ছিল না তো তাই পিঠাপিঠি জবাব দিলাম হেসেঃ 'কিন্তু মহারাজ, আপনি নিজে কি এক সময়ে আমাকেও ছাড়িয়ে যান নি মেমসাহেবিয়ানার দয়ে মজে।'

মোহন মহারাজের মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু ক্রোধ না হলেও মস্ত যোগী তো—টাল সামলে নিলেন, বললেন একগাল হেসেঃ 'একহাত নিয়েছ বটে বাবা, মানছি। কেবল আমার দুর্বলতার এইটুকু সাফাই আমি গাইতে পারি সত্যের অপলাপ না করে যে, আমি গুরুবলে মেমসাহেবিয়ানার দ-য়ে পা দিয়েই অব্যাহতি পেয়ে গিয়েছিলাম—মজি নি, অর্থাৎ মেমসাহেবের রূপের চেকনাইয়ে চমকে উঠেও নোঙর হারাই নি, সাহেব বনে যাই নি—তাঁকেই হিন্দু করতে

চেয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে বাধলও তো সেইজন্যেই। সেও আর এক অঘটনই বলব, আর ঘটেছিল ঠাকুরের কৃপায়। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন—'not a moment too soon'—বলেই হেসে : 'সাহেব পুরাণে আছে বাবা : Brigands demand your money or your life, women require both : আমি আরো একটু জুড়ে দেব —রূপসী মেমসাহেব চান ঐ সঙ্গে soul-ও, স্বামীকে ভেড়া বানিয়ে। কিন্তু ঠাট্টা থাক। সাহেবিয়ানার মোহ সর্বনেশে হয়ে উঠে কেন জানো বাবা ? এইজন্যে যে, ও আমাদের স্বধর্ম থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পরধর্মের ঘানি গাছে জুড়ে দিয়ে চোখ-বাঁধা-বলদের মত কেবল ঘুরিয়েই মারে। তাই তো তুমি যে তুমি বাবা—মানে সত্যিকার হীরের টুকরো ছেলে —সেই তুমিও গণেশ ঠাকুরের মহিমা বুঝতে বেগ পেলে—তান্ত্রিক পূজার মর্ম গ্রহণ করতে না পেরে। নৈলে তুমি দেখতে পেতেই পেতে যে, গণেশ ঠাকুর আমাদের কাছে অদ্ভুত রূপে এলেন শুধু দেখাতে যে, শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির, কিনা ধর্মের রাজ্যে বহির্নেত্রের চরম রায়ও নামঞ্জুর, প্রেমের অন্তর্দৃষ্টিই প্রামাণিক, ওরফে সত্যবাদী কেন—শুনবে ? আচ্ছা, বলি শোনো।' বলে গম্ভীর হয়ে : 'বহির্মুখী মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা কী ? না, ধরে নেওয়া যে, যাকে যা মনে হচ্ছে সে তাই—things are what they seem. কিন্তু আসল সত্যটা ঠিক উলটো, অর্থাৎ things are not what they seem. গণেশ-ঠাকুর উদ্ভটরূপে এলেন আমাদের কাছে দেখাতে—পয়লা নম্বর, যে দেবতা সর্বক্ষম বলে যে-কোনো মূর্তির মাধ্যমেই তাঁর দৈবী বিভূতি প্রকট করতে পারেন ; দোসরা—বহির্নেত্রে যে-সৌন্দর্য নিয়ে মানুষ এত মাতামাতি করে তার রায় উল্টে যায় সাধনায়—প্রেমের অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে না করতে। হিন্দুধর্মের এই যে বহুদেববাদ—polytheism—এর মূলে আছে একটি গভীর অনুভব : যে, ভগবান 'একমেবাদ্বিতীয়ম' হলেও প্রতি দেবতার মধ্যে দিয়েই তাঁকে ধরাছোঁয়া যায়—এমন কি, নিরবয়ব শালগ্রাম শিলার মধ্যেও নারায়ণকে

প্রত্যক্ষ করা যায়—যেমন বহু সাধকই তাঁদের প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে করেছেন।'

আমি সায় দিয়ে বললাম : 'আপনি ভুল বলেন নি। সত্যিই তান্ত্রিক পূজা ও ভাবতত্ত্বের আমি ক-খ ও জানি না। জানব কোত্থেকেই বা বলুন? বিলিতি আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ তো! ছেলেবেলা থেকে অজ্ঞ সাহেব ও বিজ্ঞ বুদ্ধিবাদীদের ওরফে ইনটেলেকচুয়ালদের মুখে শুনে এসেছি যে তান্ত্রিকতা মানেই গুরুর ধামাধরা, মন্ত্রদীক্ষা হ্রীং ক্লীং এইসব নানা অর্থহীন বুলির জয়ধ্বনি—সব ছাপিয়ে পঞ্চমকারের নোংরামি। পঞ্চমকার কী তার খবর নিয়েছি কেবল অভিধানের পাতায়—বা গুজবের রটনায়। সম্প্রতি আপনার মুখে তন্ত্রের নানা গভীর ব্যাখ্যা শুনে আমার ভুল ভেঙেছে—আর আপনার উজ্জ্বল পার্সনালটির প্রভাবে। কিন্তু তবু একটা প্রশ্ন না করে থাকতে পারছি না মহারাজ! এ-বিলিতি আবহাওয়ার কি ষোলো কড়াই কানা বলেন আপনি?'

মোহন মহারাজ একটু হেসে বললেন : 'কোনো ব্যাপক প্রভাবেরই হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট মন্দ হয় না বাবা। তাছাড়া যদুবাবুর কাছে যে প্রভাব অমৃত মধুবাবুর কাছে তা বিষ হতে পারে, অনেক সময় হয়েও থাকে। যারা সংসারী জীবন যাপন করে প্রফেসর বা আর্টিস্ট বা সায়েন্টিস্ট বলেই আহ্লাদে আটখানা, সাহেবিয়ানার বুদ্ধিবাদী বলে তাদের আমোদ-প্রমোদের পথ খুলে যেতে পারে বৈকি। আমার বলবার কথা এই যে, যারা যোগ-সাধনায় ভগবদ্দর্শন করতে চায়—বিশেষ ভক্তিমার্গে—তাদের পক্ষে সাহেবিয়ানার চাল-চলন, যুক্তিবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি পরধর্ম বলেই আরো ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়। আর এ-ভয়াবহতা যে কী সাংঘাতিক তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় যখন এ-মেকি সাহেবিয়ানার সঙ্গে সংঘাত হয় খাঁটি হিন্দু সাধন-ভজনের। একথার ভাষ্য করা সহজ হবে আমার জীবনের একটি বিচিত্র অধ্যায় তোমার সামনে খুলে ধরলে। তাই শোনো।'

পনেরো

মোহন মহারাজ বললেন : মহাতীর্থ নাসিকে গুরুদেবের দেহ-রক্ষার পরে যখন আমি গদিয়ান হয়ে বসলাম তখন ভেবেছিলাম যে, গুরু-কৃপায় দর্শন হল বলে। কিন্তু তারপরে সে যে কত ওঠা পড়া, অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রলোভনের হাতছানি, আশা-নিরাশা, পদে পদে অপ্রত্যাশিত আঘাত পাওয়া—সব বলতে গেলে বাংলা ভাষায় গণেশ-পুরাণ রচনা করতে হবে নতুন করে। তাই কেবল এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হব যে, দশ বারো বৎসর গুরু-মন্ত্র জপ করেও যখন কোনো সাড়াই পেলাম না তখন কেমন যেন নিরাশা এসে গেল—আরো এই জন্যে যে, মনে হল—হয়ত কৃষ্ণ-মন্ত্র কি শিব-মন্ত্র জপ করলে অনেক আগেই সিদ্ধি লাভ হত। গণেশ ঠাকুরের মতন করুণাময় ইষ্টকে বরণ করার পরে যার গুরুবাক্যে অবিশ্বাস আসে—যাঁর মহিমা দিনের পর দিন স্বচক্ষে দেখেছি—তার হতাশা কিছুতেই কল্পনা করতে পারবে না তুমি। তাই শুধু বলি—মনে হল ফিরে যাই তৃপ্তিপুরে। তখন আমার বয়স পঞ্চাশ। ব্রহ্মচর্য ও তান্ত্রিক হঠযোগের আসন করে শরীর পটুই ছিল, লিলির সঙ্গে ডাইভোর্স হয়ে গেছে—ফের সংসার করাও তো সম্ভব নয়।

ঠিক করলাম পরদিনই রওনা হব! এমন সময়ে রাত্রে হঠাৎ স্বপ্নে গুরুদেবের দর্শন পেলাম—এই প্রথম দর্শন তাঁর দেহরক্ষার পরে। তিনি বললেন : 'লজ্জা করে না তোর, থুথু ফেলে ফের তা-ই চাটতে!' আমি কেঁদে তাঁর পা জড়িয়ে ধরতে তিনি বললেন : 'আচ্ছা, এবারও ক্ষমা করলাম তোকে। যা তুই ফিরে তৃপ্তিপুরে। সেখানেই হবে পরম দর্শন—গুরু ও ইষ্ট একাধারে।'

ঘুম ভেঙে হল আমার হরিষে বিষাদ। স্বপ্নে গুরুদর্শনের সময়ে

অন্তর গান গেয়ে উঠেছিল সে কী আনন্দে! কিন্তু পরদিন জেগে উঠেই মন অবসাদে কালো হয়ে গেল। নাসিকের মতন পুণ্যতীর্থ ছেড়ে যাচ্ছি এ কোথায়? তৃপ্তিপুরের মতন দারুণ শহরে—বিষয়ীদের রাজধানীতে? তাছাড়া ছাই থাকবই বা কোথায়?

বলছিলাম না—হিন্দু সাধকের পক্ষে সাহেবিয়ানা বিষ? তাই সেদিন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিলিতি শয়তান হানা দিল আমার মনে আধা ম্লেচ্ছ আধা হিঁদু যুক্তি নিয়ে। বলল: 'ক্ষেপে গেলে না কি? গুরুস্থান ছেড়ে যেতে বলতে পারেন কখনো কোনো সদগুরু? আসলে তুমি গুরুদর্শন চেয়েছিলে—বাইরে গিয়ে এখনো আমোদ-আহ্লাদ করতে চাও বলেই তাই—বুঝলে? The wish became the father to the thought—স্বপ্নে এলেন গুরুর মিথ্যে ছায়া'—ইত্যাদি।

মনে দাগ পড়ল: যুক্তি অভ্রান্ত। গুরুস্থান ছেড়ে যাওয়া—তা আবার এক স্বপ্নে-দেখা ছায়া-গুরুর কথায়—নাঃ। পণ নিলাম—বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি—কিছুতেই নয়।

কিন্তু নিয়তিকে ঠেকাতে পারে কে বলো? হল কি, ঠিক এই সময়েই মনীষীর এক চিঠি পেলাম—তার বিবাহে তৃপ্তিপুরে গিয়ে দম্পতীকে আশীর্বাদ করতেই হবে। মা-ও তার করলেন—'সরলা অপরূপ মেয়ে, সে-ও ধরেছে।'

আগেই বলেছি—মনীষী মেধাবী ও পরিশ্রমী ছিল বরাবরই। বিলেত থেকে ব্যরিস্টার হয়ে ফিরে পিতৃবন্ধু স্যর রবার্ট সাহেবের প্রসাদে আরো দেখতে দেখতে নাম করে ফেলেছিল। বয়স তার তখন ত্রিশ হবে। অবশ্য সাধন-ভজনের সে ধারও ধারত না একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমি যে ভগবানের জন্যে সুন্দরী শিক্ষিতা মেম বউ ও বড় পেশা ছেড়ে গুরুর কাছে চলে গেলাম এর নাম সে দিত 'খাঁটি ত্যাগ।' আর খাঁটি সব কিছুরই ছিল সে কদরদান। তাই ভগবানের জন্যে ত্যাগকে পাগলামি মনে করা সত্ত্বেও তার জ্যেঠামণি যে একজন নির্ভেজাল ত্যাগী এ সে বড় গলা করেই

বলত বন্ধুবান্ধবদের। আমাকে সে তার চিঠিতে লিখেছিল—বলে তিনি চিঠিটা পড়ে শুনিয়েছিলেন :

'আপনি তো জানেনই জ্যেঠামণি, যে মানুষের মন অসঙ্গতির মৌচাক। তাই হয়ত ভগবানের জন্যে ত্যাগকে নিয়ে হাসাহাসি করার পরেও ত্যাগীকে শ্রদ্ধা না করে পারি না। আমার মনের এ-উল্টোপাল্টামিতে সত্যি আমার এখনো মাঝেমাঝেই ধাঁধা লাগে। এই দেখুন না, আমি ঘোর ইন্দ্রিয়বাদী, বুদ্ধিবাদী, বস্তুতান্ত্রিক ও নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও গুরু আত্মা পুনর্জন্ম সব বাতিল করার পরেও—আপনাকে কেন শ্রদ্ধা না করে পারি না, বলুন তো? কেন মনে হয় আমার যে ভগবানকে না মেনেও তাঁর ভক্তের আশীর্বাদকে বরণ করা চলে? সময়ে সময়ে মনে হয় বুদ্ধির খাসতালুকে বেশিদিন বাস করলে সংশয়-জমিদারেরও নানা গলদ ধরা পড়ে যায়। তাই না? এ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি ভারি চমৎকার শ্লেষ আছে :

'আমি বলি - মানুষের এ-বুদ্ধিবৃত্তির তীব্র জ্বালায়
মাঝে মাঝে এমনি হয় যে, ইচ্ছা হয় যে, ছুটে পালাই!'

এর কারণ হয়ত এই যে, যুক্তি-নায়েব যা-যা বিধান দেন ক্ষেত্র-বিশেষে তাদের না মানলে একটা মুক্তির আভাস পেয়ে একটুখানি স্বস্তির দেখা মেলে। কিন্তু মরুক গে এসব হাবিজাবি কথা। আমার অনুরোধ—'আপনিও সন্ন্যাসের যুক্তিকে নাকচ করে গুরুহীন কবন্ধ আশ্রমের মায়া কাটিয়ে ফিরে আসুন আমাদের কাছে। শুধু কি খৃষ্টদেবের ফাদার এর বাড়ীতেই নানা মহল mansion? আমার পিতৃদেবেরও যে সাত মহল বাড়ী। এর মধ্যে একটা মহল আপনাকে ও ঠাকুরমাকে ছেড়ে দেব—আপনারা দিব্যি নিরিবিলি থাকবেন—এমন কি, সেখানে যদি আপনার ইষ্ট গণেশ ঠাকুরের বেদী বসাতে চান তাতেও আপত্তি করব না। কেবল আপনি ফিরে আসুন। লক্ষীটি! না করবেন না। আপনাকে যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না, জ্যাঠামণি!'

ওর চিঠির শেষের এই স্নেহের ডাকেই আমি টললাম। তার করে দিলাম : 'আচ্ছা যাচ্ছি।' মনকে বোঝালাম, স্বয়ং গীতাকার বলেছেন : ঠাকুরের দর্শনের আগে বিষয়ভোগ থেকে মনকে নিবৃত্ত করলেও ভোগের ইচ্ছা থাকেই থাকে : 'বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ, রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে।' সবার উপর, অত্র যখন খোদ শ্রীগুরু এসে আদেশ দিয়েছেন ভরসা দিয়ে যে, তৃপ্তিপুরেই ঠাকুরের দর্শন মিলবে, তখন আর ভয় কিসের ?

তৃপ্তিপুরে গিয়ে নববধূ সরলাকে দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বি. এ. পাশ আধুনিক মেয়ে যে এত সরল হতে পারে আমি সত্যিই ভাবতে পারি নি। শুধু সরল নয়, তার উপর মনটি যেন মাখনের মতন নরম—স্নেহ মমতায় গড়া। অথচ দেখলেই মনে হত শুধু নরমই নয়—ফুলধনুর মতন বাইরে ফুল থাকলেও ভিতরে শক্ত বাখারি আছে। দেখতে সুন্দরী না হলেও এমন মুখশ্রী যে মন টানত সকলেরই। আর সবার উপরে, কী নির্মল অন্তর! ফুলের মতন শুভ্র, অনাহত। 'জলমে কমল অলেপ'—অর্থাৎ জলে থেকেও পদ্ম যেমন জলছাড়া—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে!

'বিয়ের পর তৃপ্তিপুরে রয়ে গেলাম বলতে গেলে ওর টানেই। মন যে কখনই খুঁৎ খুঁৎ করত না এমন কথা বলব না, কিন্তু মোটের উপর ওখানে কেমন যেন একটা উপাদেয় শান্তির নব আভাস পেয়ে গেলাম—আশ্চর্য বৈকি! তবে ঠাকুরের কোন্ লীলাটাই বা অনাশ্চর্য ?

কিন্তু এবার তিনি যে অঘটন ঘটালেন তাকে আশ্চর্য বললে কিছুই বলা হয় না, বলতে হয় 'অচিন্তনীয়।' শোনো বলি।

আমার মহলে একটি ঘরে মন্দির করে সাদা মার্বেলের বেদীতে রেখেছিলাম ঠাকুরকে। সেখানে রোজ ত্রিসন্ধ্যা শঙ্করাচার্যের গণেশ-স্তব গেয়ে পূজা পাঠ করতাম। সরলা ভক্তি পেয়েছিল ওর ভক্তিমতী মায়ের কাছ থেকে : তাই মাসখানেকের মধ্যেই আমার সঙ্গে স্তব

করতে করতে ঝুঁকল ঠাকুরের দিকে—মহীশূর থেকে একটি হাতীর দাঁতের গণেশ মূর্তি কিনে আমার বেদীর পাশেই একটা বেদীতে বসিয়ে যথাবিধি পূজা অর্চা শুরু করে দিল। ত্রিসন্ধ্যাই আমার সঙ্গে যোগ দিত আমার পূজা-ভবনে।

বলা বাহুল্য—মনীষীর ভালো লাগত না এসব পূজা অর্চা। ওকে আরো বাজত দেখে যে, ওর আদরিণী নববধূ ঝুঁকছে ধীরে ধীরে এমন ঠাকুরের দিকে যিনি দেখতে উদ্ভট। ও সময়ে সময়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত বৈকি। কিন্তু স্বভাবে সহিষ্ণু না হলেও নিজেকে কথায় কথায় 'লিবারেল' বলে পরিচয় দিয়ে সত্যিই গৌরব বোধ করত তো। তাই এ-ক্ষেত্রে স্ত্রীর মতিগতিতে সায় দিতে না পারলেও ভারিক্কি ভর্তার চালে ভার্যার উপর জোর খাটাতে চাইত না। ফল যা হবার ঃ সরলা মেতে উঠল ঠাকুরকে নিয়ে, আর সাক্ষাৎ স্ত্রীকে ক্রমশঃ জলদ তালে পূজারিণীর স্বরগ্রাম সাধা শুরু করতে দেখে নাস্তিক স্বামী প্রমাদ গণলেন। কিন্তু উপায় কি ? ও যে খাল কেটে কুমীর ডেকে এনেছে—আর কেবল জ্যাঠা কুমীরকেই তো নয়, সেই সঙ্গে যে যত নষ্টের মূল এক উদ্ভট ঠাকুরকেও আমল দিয়েছে।— এমন ঠাকুর তাঁর নৈবেদ্য দাবি করলে এখন 'না' করে কোন্ মুখে—বিশেষ যখন আদরিণী গৃহিণী নিজে হাতে জোগাচ্ছেন সে-নৈবেদ্য ?

সরলা স্বামীর দুর্ভাবনা যে বুঝত না তা নয়—কিন্তু ওর প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল—আমি ওর গুরু। সেই গুরু যখন গণেশকে বরণ করেছেন তখন ওকেও সেই পথেই যেতে হবে—নির্বিচারে বলল ওর সরল মন। সরলদের বিশ্বাসও আসে সহজেই—সুতরাং গণেশের প্রতি ওর ভক্তি এসে গেল আমার মুখে তাঁর গুণগান শুনতে শুনতে। তারপর একদিন যখন সরলাকে চুপি চুপি বললাম আমার স্বপ্নে পাওয়া গুরুর ভবিষ্যৎ-বাণী যে, তৃপ্তিপুরেই আমার সিদ্ধিলাভ হবে তখন ওর মন দুলে উঠল, ও ধরল ওকে দীক্ষা দিতেই হবে।

'আমরা এক সঙ্গেই এখানে বসে ঠাকুরের দর্শন পাব, গুরুদেব !'—বলল ও নিঃসংশয় উচ্ছ্বাসে।

এবার প্রমাদ গণলাম আমি। কারণ আমি সিদ্ধিলাভের আগে শিষ্য-শিষ্যার হাঙ্গাম চাইনি, চাইতাম—to travel light ; তাই ওকে 'না' করে দিলাম। ও অভিমান করে সেদিন এলই না আমার ঘরে। আমার কেমন যেন খালি খালি লাগল। রাত্রে গুরুদেবের আবির্ভাব হল ফের। তিনি বললেন যে, ঠাকুর চান—আমি ওকে গণেশ-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে শিষ্যা করে নিই।

ঘুম ভাঙতেই আমার মনে ফের সংশয় ছেয়ে এল। আমি গুরুদেবের মুখেই শুনেছিলাম যে, অসুর বা শয়তান ওরফে মার অনেক সময়ে এইভাবেই গুরুমূর্তি ধরে এসে যোগীকে যোগভ্রষ্ট করে। তাই সেদিন সকালে ঠাকুরকে নৈবেদ্য দেবার সময় আকুল হয়ে প্রার্থনা করলামঃ 'সংশয় ভঞ্জন করো ঠাকুর—আর ভুগিও না।'

কী আশ্চর্য—একটু পরেই সরলা এসে পরমানন্দে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল! আনন্দের আবেগে 'গুরুদেব' বলে প্রণাম করেই উঠে বললঃ 'আর 'না' বললে শুনছি না গুরুদেব, কাল রাতে অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করে গণেশ ঠাকুরকে ডাকার পরে শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম তাঁকে। তিনি বললেন, আমি ঠিকই ধরেছি—আপনিই আমার গুরু, তাই তিনি চান আপনিই আমাকে গণেশ মন্ত্র দেন।'

এ আর এক অঘটন—স্বপ্নেও জুড়ি মেলা! কাজেই সংশয়ের মেঘ চিরে ফুটে উঠল নৈশ্চিত্যের শুভ্র সূর্য। সোজা ওর সঙ্গে মনীষীর কাছে গিয়ে বললাম সব কথা খুলে, কিছুই গোপন না করে।

মনীষী ছিল বিষম বদরাগী। আর পারল না ধৈর্য ধরতে। অনেকদিনের ধূমায়িত ক্ষোভ এবার ফেটে জ্বলে উঠল। ভ্রূকুটি

করে বলল ঃ 'এ হতেই পারে না। আমি ভুল করেছিলাম আপনার মতন ঘর ভাঙানে কুসংস্কারী গণেশতন্ত্রীকে ঘরে ঠাঁই দিয়ে। আমাদের ভদ্রসমাজে থাকতে হয়। আমার শিক্ষিতা স্ত্রী ঐ দেঁতো দেবতাকে চাল কলা দিয়ে অং বং স্তব করে ডাকাডাকি শুরু করলে তৃপ্তিপুরের Bar-এ আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।'

আমিও আগুন হয়ে উঠলাম, বললাম ঃ 'তোমার ও-পোড়ামুখ দেখিয়ে কার চোখ জুড়োবে তুমিই জানো বাবা! আমি জানি কেবল একটি কথা ঃ যে, আমার ঠাকুর যার চক্ষুশূল তার মুখদর্শন করলেও আমি নরকে যাব। তাই আমি আজই ফিরে যাচ্ছি নাসিকে আমার আশ্রমে। তুমি এক্ষুণি—'

কিন্তু আমার কথা শেষ হল না। সরলা মাথা ঘুরে মূর্ছা গেল। সশব্দে পড়ে যাবার সময় পঞ্চ প্রদীপের একটা কোণায় ঠোক্কর খেয়ে তার কপাল কেটে একেবারে রক্তগঙ্গা।

ধরাধরি করে ওকে ওর বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ডাক্তার এল। কিন্তু ওর জ্ঞান আর হয় না। ডাক্তার বলল ঃ 'concussion of the brain, ভয়ের কারণ আছে।' ডাক্তারের ভুল হয় নি। দেখতে দেখতে সরলার জ্বর মোড় নিল বিকারে। প্রলাপে কেবল কান্না আর কান্না, আর থেকে থেকে 'গুরুদেব···গুরুদেব···গুরুদেব। ছেড়ে যাবেন না আমাকে। গেলে আমি বাঁচব না···' ইত্যাদি।

মনীষী সরলাকে গভীরভাবেই ভালোবেসেছিল—স্ত্রী বলতে অজ্ঞান যাকে বলে। তাই শুধু ভয় পাওয়া নয়, আন্তরিক অনুতপ্ত হয়েই বলল যে, সে আর বাধা দেবে না। সরলাকে আমি দীক্ষা দিতে পারি।

আমি রাজী হই নি প্রথমে। কিন্তু শেষে যখন মনীষী আমার কাছে কেঁদে ফেলল বলতে বলতে যে সরলাকে দীক্ষা দিতে আমি রাজী না হলে সে বাঁচবে না, তখন অগত্যা বলতে হল 'আচ্ছা।'

কী আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে সরলার জ্ঞান হল। জ্বর তখনো

একশো তিন-চার, কিন্তু মুখে কী শান্তির আভা—সে বলে বোঝাবে কী করে?

দিন দুই পরে ওর জ্বর ছেড়ে গেলে ও বলল আমাকে—তখন মনীষী ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে—যে, ঠাকুর ওকে বলেছেন আমার কাছে দীক্ষা নিতে সাতদিন বাদে সামনের গণেশ চতুর্থীতে।

কিন্তু আমি তখন ফের বেঁকে বসেছি। বললাম: 'না মা, সে হতে পারে না। আমি সংসারী মানুষ নই, সাধক। সংসারীদের দাম্পত্য জীবনে কাঁটা হয়ে থাকতে চাই না। যদি তুমি ঠাকুরের জন্যে সব ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে পারতে তো দীক্ষা দিতে পারতাম। কিন্তু তা যখন পারবে না, তখন শুধু শুধু মৌখিক দীক্ষা নিয়ে তো ফল হবে না মা। মাঝ থেকে অশান্তিই উঠবে আরো ফেঁপে।'

সরলা শুনে ম্লান হেসে বলল: 'গুরুদেব! একটা কথা বলি তবে আজ।' বলে মনীষীকে সামনে এসে বসতে বলে বলল: 'তুমিও শোনো। আমি লুকোচুরি করে কিছু করতে চাই না। আমার মা মনে প্রাণে ভক্তিমতী। বহু দুঃখ সয়েছেন তিনি। কিন্তু প্রতি দুঃখেই তিনি আরো ফুটে উঠেছেন ভক্তিরসে। তিনি বলেন প্রায়ই একটি কথা: যে, ভক্তি এলে শান্তি আসে ভেবে ভক্তি চাইতে নেই, ভক্তির জন্যেই ভক্তি চাইতে হয়। আমি অতি সাধারণ মেয়ে, গুরুদেব, কিছুই জানি না, চিনি না, বুঝি না। কেবল মনে আমার গেঁথে গেছে আমার ভক্তিমতী মার প্রিয় একটি মীরাভজন—গানটি তিনি শিখেছিলেন তাঁর গুরুর কাছে:

'হরী নাম বিনা হরী মিলে না, প্রেম বিনা নহি নাম।

গুরু-করুণা বিনা প্রেম মিলে না চল্ সখি সদ্‌গুরুধাম।

তাই আমি অশান্তিকে ভয় করি না গুরুদেব, ভয় পাই—পাছে ভক্তি ছেড়ে শুধু শান্তির লোভে প্রাণের ঠাকুরকে বরণ করতে চেয়ে ভাবের ঘরে চুরি করে একূল-ওকূল দুকূল হারাই।'

এমন গভীর অথচ সরল সুরে সে বলল কথাগুলি যে, নাস্তিক

মনীষীও আর্দ্র হয়ে উঠল, বলল ঃ 'তুমি দীক্ষা নাও, সরলা। আমি অহঙ্কারী হলেও অন্ধ নই, তাই দেখতে পেয়েছি তুমি আমাদের মধ্যে থাকলেও আমাদের একজন নও—তোমার জাতই আলাদা। এমন কি, তুমি যদি সন্ন্যাস নিতে চাও তাহলেও আমি আপত্তি করব না —কথা দিচ্ছি—শুধু তুমি মন খারাপ কোরো না—তাহলে ফের অসুখে পড়বে।'

সরলা সেরে উঠলে পর ওকে গণেশমন্ত্রে দীক্ষা দিলাম গণেশ চতুর্থীর দিন ভোরবেলা। ও গাইল আমার সঙ্গে ঃ

যতোঽনন্তশক্তেরনন্তাশ্চ জীবা
যতো নির্গুণাদপ্রমেয়া গুণান্তে।
যতো ভাতি সর্বং ত্রিধা ভেদভিন্নং
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥

শেষে গাইলাম এই ছন্দেই বাঁধা আমার বাংলা স্তব ঃ

যাঁহার শক্তি চিত্তের গভীর দীপ্তি উৎস,
যাঁহার কীর্তিবন্দন ভুবন গায় অনন্তে,
যাঁহার শক্তি-প্রচ্ছায় জীবন পায় অভয়—সেই
পরম অন্তরঙ্গের গাহি স্তব আনন্দে।

অপার যাঁর কৃপার বর নিরন্তর বিছায় দোল
রবির রাগ চাঁদের কর তারার ভায় দিগন্তে,
হৃদয় যাঁর রাতুল পায় প্রেমের অর্ঘ দেয়—সেই
পরম অন্তরঙ্গের গাহি স্তব আনন্দে।

চিরন্তন প্রসাদ যাঁর নিরঞ্জন আলোর দান
বিলায় বিশ্বে নিত্যই সমুচ্ছল সুগন্ধে,
যাঁহার মূর্তি সুন্দর ধেয়ায় মর্ম আজ—সেই
পরম অন্তরঙ্গের গাহি স্তব আনন্দে।

ষোলো

কিন্তু—(বলে চললেন মোহন মহারাজ)—মনীষী সরলাকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসলেও—মানুষের ভালোবাসা তো! চণ্ডীদাস যে কামগন্ধহীন প্রেমকে 'নিকষিত হেম' উপাধি দিয়ে গেয়েছিলেন শ্রীরাধার জবানীতে ঃ

'তোমার যাহাতে সুখ,
তাহাই করিও তাহাতে আমার হবে না হবে না দুখ—'

সে-প্রেমের পরম আত্মদানের খবর তো পাওয়া যায় না কামনার লেশ থাকলেও, কারণ কামনা থাকলেই আসবে হাজার প্রত্যাশা, আর প্রত্যাশার উল্টো পিঠেই গাঁথা আশাভঙ্গ—যার ক্ষোভ টেনে আনবেই আনবে সংঘাত। তাই মনীষী উদার হবার সাধু সংকল্প নিলে হবে কি—মানুষ ভাবের জোয়ারে যেখানে তরতর করে পৌঁছতে পারে অভাবের ভাঁটায় কি সে বন্দরে ডিঙি ভিড়োতে পারে? তাই বাধল প্রথম খুঁটিনাটি নিয়ে—যেমন সংসারে হয়। সরলা আগে যেমন মনের মতনটি ছিল পোষা পাখীর মতন, তেমনটি তো নেই আর! মনে লাগে বৈকি। ফলে মন-কষাকষি মান-অভিমান ফের মিলনের টানে আপোষ, আপোষের পরেই আবার অসন্তোষ…এমনি চলে একই ক্ষোভের পুনরাবৃত্তি—চেয়ে না পাওয়ার ক্ষোভ, অনুযোগ অভিযোগ, শেষে বিস্ফোরণ কেন না মন অনুকূল হলে যা সওয়া যায় প্রতিকূল হলে মনে হয় অসহ্য। মনীষীরও হল—বিশেষ করে সরলার 'কুশ্রী' গণেশ দেবতার পায়ে দিনের পর দিন অর্ঘ দেওয়ায়। ও বলে বেড়াতে লাগল একে ওকে—কৃষ্ণ শিব দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক চতুর্ভুজ এ সব দেবতার পায়ে গড় করা বোঝা যায়—কিন্তু এক দেঁতো হাতীমার্কা বিগ্রহ—এও যদি কুসংস্কার না হয় তবে কুসংস্কার আর কার নাম?…

সতেরো

ভবিতব্য বলে একটা কথা আছে (বললেন মোহন মহারাজ) অর্থাৎ এমন কিছু যা ঘটবেই ঘটবে। কিন্তু যখনই কোনো কিছু ঘটে, ঘটে একটা কোনো না কোনো পর্যায়ে। এ-পর্যায়ের পরের ধাপটি এল ঠিক এই সময়েই—স্যর রবার্ট ঠিক করলেন ব্যারিস্টারি ছেড়ে 'হোম'-এ গিয়ে বসবেন। লেডী ব্লেক দিলেন এক পার্টি শেষদিন। রাত বারোটায় লণ্ডনের প্লেন ধরবেন, ডিনার পার্টি হল সন্ধ্যা সাতটায়। মনীষীকে ও সরলাকে ওঁরা যথাবিধি নিমন্ত্রণ করলেন। সরলা যেতে নারাজ হতে মনীষী আমাকে এসে ধরল। আমি সরলাকে বললাম যে, সাধনার পথে এমন অনেক পরীক্ষা আসে যাকে গ্রহণ করতেই হয়। ও বলল: 'কিন্তু এ তো বাজে ডিনার গুরুদেব—পরীক্ষা বলছেন কেন?' আমি বললাম: 'এ-ডিনারে তুমি না গেলে অশান্তি বাড়বে, মা-ও দুঃখ পাবেন।'

সরলা রাজী হল শুধু এই জন্যেই। কারণ মাকে ও গভীর ভক্তি করত তাই জানত তাঁর উভয় সংকটের কথা। উভয়-সংকট বলছি এই জন্যে যে, গণেশ ঠাকুরকে তিনি বরণ করেছিলেন প্রধানতঃ গুরুর টানেই, অর্থাৎ খানিকটা যেন বাধ্য হয়েই। তাই অন্তরের প্রেমের বেদীতে তখনও বসাতে পারেন নি। ফলে হল কি, এই ব্যাপারে তাঁর দরদের মধ্যে ফাটল ধরল—একদিক ঝুঁকল নাতির দিকে, অন্যদিক ছেলে ও নাতবৌয়ের দিকে। তাই সরলার দীক্ষা না নিলেই ভালো ছিল, সব দিকে বজায় থাকত—একথা তাঁর মাঝে মাঝেই মনে হত, যদিও বলতে গিয়ে আমার কাছে ধমক খেলে ভয় পেয়ে আবার স্তব করতেন: 'সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ।' তবু সরলাকে পই পই করে মানা করতেন

স্বামীর সঙ্গে ভুলেও তর্কাতর্কি না করতে। বলতেন: 'মা, পরমহংসদেবও বলতেন যে সয় সেই রয়। মেয়েমানুষই হল সংসারের খুঁটি ও বনেদ—তাই সব টান ও চাপ তাকেই সইতে হবে—এ ঠাকুরের বিধান, কাটাবার জো কি বলো?' ইত্যাদি।

তবু সরলার বিমুখতা কাটে নি, ও ডিনারে গিয়েছিল কেবল ঠাট বজায় রাখতেই বলব। কিন্তু গেলে হবে কি? ভবিতব্যকে কি তুতিয়ে পাতিয়ে ঠেকানো যায়? তাই বাধল ফের ঐ ঠাকুরকে নিয়েই! স্যার রবার্ট ও লেডী ব্লেক মনীষীর কাছে আগেই সব শুনেছিলেন, আর বলাই বাহুল্য এ-সংঘাতে ছিলেন তারই দিকে। তাই সরলাকে দেখে ইচ্ছে করেই গণেশ ঠাকুরকে ঠেস দিয়ে নানা মন্তব্য করতে শুরু করলেন: কেমন করে এমন হসনীয় মূর্তিকে লোকে ধ্যান করতে পারে—বোধ হয় শুঁড় ধ্যান করা বেশি সহজ বলেই হবে—এই ধরনের সস্তা ব্যঙ্গ।

সরলা খানিকক্ষণ সয়ে ছিল কিন্তু যখন স্যর রবার্ট শ্যাম্পেনের বোতল খুলে বললেন মনীষীকে: 'To the health of your great elephant god, my boy!'

তখন ও আর রাগ চাপতে পারল না, কোনো কথা না বলে উঠে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এল। মনীষী ভয় পেয়ে পিছু নিতেই বলল: 'তুমি থাকো, আমি চললাম—আমার বড় মাথা ধরেছে, বোলো ওঁদের।'

লেডী ব্লেক বুঝেছিলেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, তাই ভয় পেয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে যথাবিধি আফসোস প্রকাশ করলেন, কিন্তু সরলা তখন বেঁকে বসেছে। বলল মুখের উপরেই: 'অভদ্রতা সওয়া যায় কিন্তু আমার ঠাকুরকে অপমান করলে সওয়া চলে না।'

মনীষী তব্ অনেক বোঝালো, কিন্তু সরলা জেদী মেয়ে তো, শুনল না। বলেছি রবার্ট সাহেবের বাংলোটি ছিল মনীষীর বাড়ীর প্রায় পাশেই—হন হন করে হেঁটে ফিরে এসেই সোজা আমার পায়ে পড়ে

সে কী কান্না! কোনোমতে থামাতে পারি না। মা ওকে সত্যি স্নেহ করতেন। কান্না শুনে ছুটে এসে ওকে অনেক আদর করে বুকে টেনে ঠাণ্ডা করে জিজ্ঞাসা করতে ও সব বলল। মনীষী তখন রাগে পাশের ঘরে ফুঁশছিল পায়চারি করতে করতে। রাগও প্রবল, অথচ বাড়াবাড়ি করবার সাহসও নেই, কারণ আমার রাগকেও ও ভয় করত তো। সব জড়িয়ে সে এক দুঃসহ পরিস্থিতি।

আমি সব শুনে খানিক চুপ করে থেকে মনীষীকে ডাকলাম। সে আসতেই বললাম : 'তুমি কী চাও খুলে বলো? সরলাকে দীক্ষা দিতে অনুমতি দিয়ে এখন বিদেশীদের কাছে তার ঠাকুরের অপমান— এতে কি তোমারই মান বাড়ে মনে করো?'

মনীষী মুখ লাল করে বলল : 'ও কী সীন করেছে জানেন? গুরু কি শুধু ওরই আছে? স্যর রবার্ট আমার গুরু নন? আমার পসার হয়েছে তো তাঁরই প্রসাদে। যদি তিনি একটা বেফাঁস কথা বলেই থাকেন মুখ ফস্‌কে—'

এবার মাও থাকতে পারলেন না, বললেন : 'মণি তুই জানিস— আমি চাই না কোনো সীন। কিন্তু মদ খেয়ে আমাদের ঠাকুরকে যিনি গাল দিতে পারেন তাঁকে তোর গুরু বলে বরণ করতে লজ্জা করে না? তোর বাবাও যে লজ্জা পেতেন তোর মুখে একথা শুনলে। আর পসারের কথা কেন বলছিস? সাহেবের পা না চাটলেও কি কারুর পসার হয় নি কোনোদিন? তাছাড়া অশোকের একটা কথা কি তুই ভুলে গেলি? সে বলত উঠতে বসতে—মরদ কি বাত হাতীকী দাঁত। তুই সরলাকে কথা দিস নি কি যে, তার গুরুর বা ঠাকুরের নামে কিছু বলবি না? যে কথা দিয়ে কথা রাখে না সে কি একটা মানুষ?'

মনীষী সরলা ও আমার সামনে ধমক খেয়ে আর টাল সামলাতে পারল না। চিরদিন শুধু ঠাকুমার প্রশ্রয় পাওয়াই তো নয়, যখনই সরলার সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে তিনি সরলাকেই ধমকেছেন,

বুঝিয়েছেন বা তুতিয়ে পাতিয়ে ওর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই ঠাকুমাও আচমকা আমার ও সরলার সামনে ওকে অমানুষ বলে গাল দেবেন—ও স্বপ্নেও ভাবে নি। ঘা খেয়ে তড়পে চেঁচিয়ে বলে উঠল: 'বটে? সবাই মিলে ষড় করে আমাকে পাপোশের মতন মাড়িয়ে যাবে ভেবেছ? কিন্তু ভুল ভেবেছ ঠাকুমা। I am my father's son—and I wont take it lying down. অনেক সয়েছি মুখ বুঁজে, আর না—যত নষ্টের গোড়া এই ঠাকুরটিকেই বিদেয় করব—দেখি তিনি কী করতে পারেন।' বলেই আমার বেদীতে সরলার নিজের যে নিত্য পূজার বিগ্রহটি ছিল সেটিকে ছোঁ মেরে পাগলের মত অট্টহেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ব্যাপারটা বলতে এত সময় লাগছে, কিন্তু ঘটে গেল এমন চক্ষের নিমেষে যে ওকে বাধা দেব কী—আসন ছেড়ে উঠতে পর্যন্ত পারলাম না। সরলা হতভম্ব মতন হয়ে চেয়ে রইল। একটু বাদে সাড় আসতে সে শূন্য বেদীর পানে চেয়ে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, বলল: 'কী হবে গুরুদেব? উনি নিশ্চয় ঠাকুরকে কোথাও আঁস্তাকুড়ে কি ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবেন।'

মা কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে গিয়ে প্রার্থনায় বসলেন: 'ঠাকুর, রক্ষা করো, যেন কোনো অকল্যাণ না হয়...' ইত্যাদি। এদিকে আমি সরলাকে শান্ত হতে বলে ধ্যানে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে শান্তিতে আমার মন ছেয়ে গেল—গুরুদেবের স্বর শুনলাম—'মা ভৈঃ।'

সঙ্গে সঙ্গে মনীষীর আবির্ভাব। ঘরে সে ঢুকল না, চৌকাঠের এপারে দাঁড়িয়েই বলল সরলাকে ঝাঁঝালো স্বরে: 'তোমার সাধের ঠাকুরটির কী ব্যবস্থা করেছি শুধু শুনিয়ে যেতেই এসেছি। ভেবেছিলে সবাই মিলে আমাকে একঘরে করে হাসাহাসি করবে? আমি শোধ তুলেছি—যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়া চাই তো। স্যর রবার্ট আজই রাত্রে উড়ে লণ্ডনে যাচ্ছেন। তিনি সেদিনও বলেছিলেন: 'হ্যাম্পস্টেডে আমার জাদুঘরে নানা উদ্ভট জিনিসই

আছে—চীনের ড্রাগন, মিশরের স্ক্যারাব—আরো কত কী—কিন্তু এমন সরেস হাতীঠাকুর তো নেই! How ripping! দেখলেই কী যে হাসি পায়! আমার লণ্ডনের বন্ধু-বান্ধবীরা হেসে কুটিকুটি হবে, অনেক ধন্যবাদ!' বলেই হাততালি দিয়ে হো হো করে হেসে বলল: 'কেমন পরিপাটি ব্যবস্থা হয়েছে বলো তো? যেখানকার যা। এমন হাতীঠাকুর তো জাত্নঘরেই মানায়, নয় কী? ওরা লণ্ডনে ঠাকুর জানোয়ারের শুঁড় আর দেঁতো হাতিয়ার দেখে হাসাহাসি করবে, আর আমি এখান থেকে সে হাসির দোয়ার দেব —কথা দিয়েছি স্যর রবার্টকে। শোধবোধ।'

বলে চৌকাঠ থেকেই ফিরল নিজের ঘরের দিকে। হঠাৎ সরলা উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত দৃঢ় স্বরে ডাকল: 'দাঁড়াও।' ও ফিরে দাঁড়াতেই বলল: 'তোমার যা বলবার শুনেছি, এবার আমার কথা শুনে যাও।' আমি বাধা দিতে যেতেই বলল: 'না গুরুদেব, উনি শোধবোধ চেয়েছেন নিজেই। তাই হোক। তেলে জলে মিশ খায় না।' বলে মনীষীর দিকে তাকিয়ে বলল: 'তুমি যা করেছ তারপরে তোমার ঘরণী হয়ে এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি স্থির করেছি যে, হয় এখান থেকে চলে যাব আমার বাপের বাড়ি—না হয় নাসিকে গুরুদেবের আশ্রমে—যদি অবশ্য গুরুদেব রাজী হন।'

আমি বললাম 'আমি রাজী আছি মা, কিন্তু—'

সরলা বলল 'এর পরে আর কিন্তু নেই গুরুদেব, থাকতে পারে না। যে-স্বামী স্ত্রীর নিত্যপূজার বিগ্রহ এক ম্লেচ্ছ বন্ধুর হাতে সঁপে দিতে পারে জেনে শুনে যে, তারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, তার সঙ্গে ঘর করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

বলে ফের মনীষীর দিকে তাকিয়ে বলল: 'না। শোনো, আমার আর একটু বলবার আছে। তোমাকে আমি সত্যিই ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম, তুমি জানো। কিন্তু যেখানে শ্রদ্ধার কোনো ভিৎ-ই নেই সেখানে ভালোবাসা দাঁড়াতে পারে না—এ তুমিও মানবে। আমি

আমার ভক্তিমতী মার কাছে মানুষ। তিনি বলেন : সব আগে গুরু ও ইষ্ট তার পরে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সংসার সমাজ। আর এসব কথা আমার মন মেনে নিয়েছে ছেলেবেলায়ই। তুমি ভেবেছ—আমাকে খুব সাজা দিলে! কিন্তু আমি দেখছি—এ-ব্যবস্থা দিয়েছেন আমার ঠাকুরই। অন্তর্যামী তিনি, তাঁর উপাধি বিঘ্নহন্তা। তাই তো তিনি এই বেদনা দিয়ে আমার পথের প্রধান বাধা সরিয়ে দিলেন—অর্থাৎ তুমি। ভালোই হয়েছে তোমারও, আমার। আমি চলে যাচ্ছি আজই গুরুদেবের আশ্রমে। আর ফিরব না। তুমি যদি চাও ফের বিবাহ করতে পারো।' বলে চোখে আঁচল দিয়ে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মনীষী রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে চেঁচিয়ে বলল : 'বেশ, যাও, কিন্তু আর ফিরো না। আমি তোমাকে ডাইভোর্স করব।'

বলে সেও বেরিয়ে গেল। আমি একা চুপ করে তাকিয়ে রইলাম আমার বিগ্রহটির পানে। হঠাৎ দেখলাম—স্পষ্ট—তাঁর চোখে জল—কিন্তু মুখে হাসি! ঠাকুরের লীলা কে বুঝবে?

আঠারো

মোহন মহারাজ একটু থেমে আমার দিকে চেয়ে রইলেন অন্যমনস্কভাবে। তারপর তাঁর চমক ভাঙল, মুখে ফুটে উঠল আবছা হাসি। আমি বললাম : 'কী?'

মোহন মহারাজ বললেন : মনে পড়ে গেল সে-রাতে ট্রেনে সরলার কী কান্না! তা হবে না? মেয়েছেলে তো? নীড় বাঁধা ওদের স্বভাব। কোথায় তৃপ্তিপুরে ধনীর সংসার— দাস দাসী, লোক-লস্কর, গাড়ী ঘোড়া, আর কোথায় চলেছে—গোদাবরীর তীরে এক অজানা আশ্রয়ে—নিঃঝুমের পালা। কল্পনা তো ছিল তার। তাই অত অশান্ত হয়ে উঠেছিল সেদিন—আরো এই জন্যে যে, মনীষীকে সে গভীরভাবেই ভালোবেসেছিল। তাই বুঝতে পেরেছিল কোথায় স্বামীকে বেজেছে—যার যন্ত্রণায় সে এমন আসুরিক রূপ ধরতে বাধ্য হয়েছিল। বিদায় নেবার সময় মা-রও সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না সরলাকে জড়িয়ে ধরে! আমি তাঁকে বললাম : 'আপনিও চলুন মা আমার সঙ্গে।' কিন্তু তিনি আসতে রাজী হলেন না। বললেন : 'মনীষীর রাগ চণ্ডাল হলেও সংস্কার তো ব্রাহ্মণেরই। কাজেই দুদিন বাদ সে ভুল বুঝবেই বুঝবে রাগ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া—বললেন মা আঁচলে চোখ মুছে—'আমিও যদি ওকে এ-দুঃসময়ে ছেড়ে যাই, তবে ঝোঁকালো জোয়ান তো—কখন কী করে বসে কে বলতে পারে? অন্তত দুদিন দেখি বেয়ে ছেয়ে। তারপরে নাসিকে গিয়ে বসার দিন তো আছেই। কী বলো দিদিমণি?' সরলাকে তিনি দিদিমণি বলে ডাকতেন।

সরলা গাঢ়স্বরে বলল : 'আপনার মন ভগবান মা, আমি কী বলব?'

আমি একটু উত্যক্ত হয়েই বললাম ঃ 'মা ঠাকুরকে যে বরণ করে সে এতশত ভাবে না—সে ঝাঁপ দেয়। মনীষীকে দেখবার জন্যে তিনি আছেন! তিনি ঠুঁটো নন। তাই তুমি থেকো না আর এ-ঝামেলার মধ্যে। চলো আমার সঙ্গে নাসিকে। সংসার তো দেখলে—সঙের সার—কে যেন বলেছিল ?'

সরলা টুকল ঃ 'যেই বলুক গুরুদেব, ভুল বলেছে। এ-সংসারে আগাছার শেষ নেই জানি। কিন্তু ফুলেরও দেখা মেলে না কি? অন্ততঃ আমার মন নেয় না যে, এসবই মায়ার খেলা বা সঙের ভাঁড়ামি। তাছাড়া ভেবে দেখুন তো একবার—ঠাকুর কি পাপী তাপীকেও বারবার সুযোগ দেন না শুধ্‌রোবার? শিশুপাল যে শিশুপাল—তারও একশো অপরাধ ক্ষমা করেন নি কি তিনি? স্বভাব শুধরোতে মানুষের বড় বেশি সময় লাগে বলে আমরা ব্যস্ত হই, কিন্তু ঠাকুর কি একটি ফুল ফোটাতেও হাজার বৎসর অপেক্ষা করতে নারাজ?' ও থেকে থেকে এই ধরনের চমৎকার চমৎকার কথা বলত টুক টুক করে আর এমন তালে যে আমার মনে পড়ে যেত খ্রীষ্টদেবের একটি উক্তি যে, ভগবান তাঁর নানান গভীর রহস্য বিচক্ষণ ও সাবধানীদের কাছে ফাঁস করেন না, কিন্তু শিশুদের কাছে করেন। কিন্তু এসব কথা ফেনিয়ে না বলে এবার নাসিকের কাহিনীতে আসি।

উনিশ

মোহন মহারাজ বললেন ঃ

'নাসিকে গুরুস্থানে আমি আমার দুটি গুরুভাই ও একটি গুরু-বোনকে বসিয়ে এসেছিলাম। তৃপ্তিপুরে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলে থেকে থেকে সেখানে গিয়ে দুচারদিন কাটিয়ে আসতাম জুড়োতে। একবার যখন সংসারের হাজারো ঝামেলার মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম—মনে হত দূর ছাই, কেন মিথ্যে এ-বিড়ম্বনা? সরলা সংসারকে মনে না করলেও আমার বারবারই মনে হত যে, এসবই ছায়াবাজি। মনে পড়ত বিলেতের রোমান্স। উঃ সে কী উচ্ছ্বাস—ভালোবাসাবাসি—শপথ করা যে চিরদিন পরস্পরকে আঁকড়ে থাকব! তারপরেই বাস্তবের গদাঘাতে সবই ফক্কিকার—একের পর এক স্বপ্ন ভেঙে চুরমার! কিন্তু হলে হবে কি, আমাদের ঠাকুরটি যে নাজেহালদের পাকে ফেলতেই আছেন।—হত কি, নাসিকে গিয়ে একটু হাঁফ নিতে না নিতে সরলার কথা ভেবে ফিরতেই হত—বিশেষ যখন সে কাতর হয়ে চিঠির পর চিঠি লিখত—'এবার ফিরে আসুন' বলে। নাসিকে গুরুস্থানে গুরুভাই গুরুবোনদের টান ছিল বৈকি, কিন্তু শিষ্যার টান যে তার চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। কাজেই দোটানার টাগ অব ওয়ারে শেষে বেশি জোর যার সেই হত জয়ী। পাটীগণিতের সূত্র—কাটবার জো কি? না, আরো আছে। কথায় বলে—শিষ্যই গুরুর নেওটো। কিন্তু সাধনার বিচিত্র জগতে অনেক সময়ে উল্টোটাই ঘটে—গুরুই হয়ে ওঠেন শিষ্যার বাহন—বাপ হয়ে দাঁড়ান শিষ্যার ছেলে, শিষ্যা হয়ে দাঁড়ায় সাক্ষাৎ মা। অন্ততঃ গুরুদেব আমার সাধনাকে এই পথেই চালিয়েছিলেন! কারণ এ একটুও বাড়িয়ে বলা নয় যে, সরলাকে যখন 'মা' ডাকতাম তখন তার মধ্যে এমন

এক মধুর নরম ছন্দ ফুটে উঠত যে-ছন্দের স্বাদ নিজের মাকে মা বলে ডেকেও পাই নি কোনোদিন। এ একটুও বাড়ানো কথা নয়। দিনের পর দিন উপলব্ধি করেছি—হলফ করে বলতে পারি। যাহোক, সরলাকে নিয়ে নাসিকে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে মন গান গেয়ে উঠল—আর তৃপ্তিপুরে ফিরতে হবে না ছাই! কারণ যার জন্যে ফিরতে হত সেই যে এখন থেকে নাসিকে থাকবে চিরদিনের মত। তখন কি জানতাম—কিন্তু না যথা পর্যায়েই বলি—রসভঙ্গ না করে।

'নাসিকে এসেই মনীষীকে লিখে দিলাম আর ফিরছি না। ফিরবার দরকারও ছিল না, কারণ অর্থাভাব তো ছিল না—পিতৃদেবের জয় হোক! তিনি তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের জন্যে বেশ পাকা ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিলিতি বউকে লণ্ডনে হাজার টাকা মাসোহারা পাঠিয়েও যথেষ্ট আয় হাতে আসত মাস মাস—কোম্পানির কাগজের সুদ বাবদ। তা সত্ত্বেও কেন কাজ করতাম তৃপ্তিপুরে? শুধু গুরুদেবের আদেশে। তিনি বলেছিলেন আমার এখনো কিছুদিন সংসারে থাকতে হবে সংসারী না হয়ে। তারপর লগ্ন আসবে আশ্রমবাসী হবার। সরলা ঘা খেয়ে নাসিকে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন পড়ল ঘণ্টা: এবার বোসো আশ্রমে সুখাসনে। মন তার ধরে দিল: ধন্যোঽস্মি। অলক্ষ্যে গুরুদেব দোয়ার দিলেন: তুষ্টোঽস্মি। জয় গুরু! জয় ঠাকুর—বিঘ্নহন্তা!

গোদাবরীর তীরে আমাদের (কালিদাসের ভাষায়) 'শান্তরসাস্পদ আশ্রমে' এসে প্রথম দিকে সরলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বিশেষ পুণ্যতোয়া গোদাবরীর উদার রূপ দেখে। বর্ষায় দুকূলভাঙা তালে উচ্ছল সুরে মা-র আমার সে কী অশ্রান্ত গান গেয়ে চলা পিছন দিকে না তাকিয়ে! শুনতে না শুনতে প্রাণও যেন তাঁর সঙ্গে তান জুড়ে দিতে চায়—অবগাহন স্নানে দেহমনের সব গ্লানি তাপ ধুয়ে মুছে ভেসে যায়। তার উপর বর্ষা হল এদেশের বসন্ত। গাছে গাছে কোকিল ডাকে। দিকে দিকে সবুজের আগুন লাগে। বাতাসে

বিছিয়ে যায় মলয়-শিহরণ। আমাদের আশ্রমের চারপাশে গুরুদেব আম জাম নিম কদম দেওয়ার ঝাউ আরো কত কি ঘনপল্লব বৃক্ষ-রোপণ করেছিলেন। যেমন স্নিগ্ধ ছায়া, তেমনি মর্মর! একটু বাতাস উঠতে না উঠতে পাতায় পাতায় বেজে উঠত নটরাজের নূপুর। গান ধরে দিতাম ঃ 'কল-নূপুর-রঞ্জিত চারুপদম্ মণি রঞ্জিত গঞ্জিত ভৃঙ্গমদম্...'

সরলার থেকে থেকে মনীষীর জন্যে মন কেমন করত বৈকি। কিন্তু দেখতে নরম হলেও ভিতরে শক্ত মেয়ে তো—তার উপর একরোখা—যা ধরবে ছাড়বে না। এমন নিষ্ঠার ফল ফলবে না? দেখতে দেখতে রকমারি দর্শন শ্রবণ—আরো কত কী অঘটন শুরু হল ওকে কেন্দ্র করে! আঁধারের বাধা ওর সাধনাকে যেন রাতারাতি এগিয়ে দিল সোনার সকালের দিকে। গুরুদেবের একটা কথা মনে পড়ত ওকে দেখে ঃ 'যত বাধা ততই বিকাশ।' কিন্তু এবার আমার দুটি গুরুভাই ও একটি গুরুবোনের কথা কিছু না বললেই নয়।

গুরু ভাইটির নাম মধু ডাণ্ডেকর। সুদর্শন মারাঠী যুবক। নাসিকে থাকত। হঠাৎ বসন্তে তার বাপ মা মারা যেতে সে যায় রাঁচিতে এক কাজ পেয়ে। যাবার আগে সে গুরুদেবের কাছে গণেশ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিল। আশ্রমেই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু গুরুদেব তাকে বলেন—এখনো সময় হয় নি, হলেই ডেকে নেবেন। তার বিশ্বাসের শক্তি ছিল সহজাত। তাই খুশী মনেই চলে গেল রাঁচিতে।

সেখানে এক বাঙালী জমিদার তাঁর মেয়ের জন্যে একটি প্রাইভেট টিউটর খুঁজছিলেন। মধু ডাণ্ডেকরের এক মামা রাঁচিতে চাকরি করতেন এক আদালতে। তিনিই তাঁকে বলেন মধুর কথা—যে মধু খুব ভালো ছেলে, এম-এ পাস, কিন্তু বেকার, তাই খুব কম টাকায় তাঁর মেয়ের মাস্টারি করতে রাজী হবে। জমিদার বদন চক্রবর্তী ছিলেন পাকা লোক। কম মাইনের মাস্টার পেয়ে মহাখুশী। হোক না মারাঠী। বরং মারাঠী মাস্টার বেশি নিরাপদ—মেয়ে সুন্দরী,

ঝুঁকবে না বিদেশীর দিকে। মধুর মামা মধুকে তার করল। মধুর অত দূরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু এ-দারুণ যুগে কাজ পাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়—বিশেষ পড়াবার কাজ। কাজেই তাকে যেতে হল খানিকটা বাধ্য হয়েই।

মধু বম্বেতে দর্শনে এম. এ. তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়। বদনবাবুর মেয়ে নলিনী বি. এ. তে দর্শনেই অনার্স নিয়েছিল। বদনবাবু চেয়েছিলেন মেয়ে পরীক্ষায় সবাইকে হারিয়ে প্রথম হয়। নলিনীও ছিল উচ্চাশিনী—তাই আরো চেয়েছিল একটা ভালো প্রাইভেট টিউটর। মধুর মামা তাকে বলেছিলেন মধু বম্বেতে এম. এ. তে দর্শনে শুধু 'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট' হওয়া নয়—রেকর্ড মার্ক পেয়েছিল। বদনবাবুও শুনে খুশী—প্রাইভেট টিউটর যদি রাখতেই হয় তো One must get one's money's worth—বললেন তিনি সঘনে।

মধু এল দেখল ও জিৎল—জুলিয়াস সীজরের মূল ল্যাটিনে : Veni, Vidi, Vici ; কাজেই সব ভেস্তে গেল, নলিনীর দর্শনে বি. এ. দেওয়া হল না। (ওর এক রসিকা মামী ওর ভাবগতিক দেখে পরে হেসে বলেছিল : 'তা ভাই, আমরা বাঙালী মেয়ে তো—বাংলা বিয়ে হলে বিলিতি বি. এ.-কে ধামাচাপা না রেখে পারি ?'

ব্যাপারটা প্রথমে ধীরে ধীরে, পরে দ্রুত তালে পেকে উঠল এইভাবে : নলিনী সব আগে গিয়ে ধরল মাকে—মধুর সঙ্গে বিয়ে দিতেই হবে ওর। তখন বদনবাবুর সাড় এলো, মনে পড়ল শেক্ষপীয়রের বাণী : The strongest oaths are straw to the fire in the blood.' কিন্তু উপায় কি ? মেয়েও সুন্দরী, মধুও সুপুরুষ—এক্ষেত্রে প্রেমে পড়লে যা হয় তাই হল। বদনবাবু অনেক বোঝালেন মেয়েকে, বললেন : 'আগে বি. এ. পরীক্ষা দাও তো।' কিন্তু মেয়ে বলল : 'বিয়ে করে কি আর পরীক্ষা দেওয়া যায় না ?'

বদনবাবু আরো অনেক যুক্তি দিলেন। বি. এ. পরীক্ষা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে সময় পাওয়া যাবে এই-ই ছিল তাঁর মনের কথা।

বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেলেই মধুকে পাঠিয়ে দেবেন স্বধামে—নাসিকে। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে—তার জন্যে তিনি খুঁজছেন আই-সি-এস পাত্র। সুন্দরী মেয়ে, যৌতুক প্রচুর, আই-সি-এস তো জুটবেই। এ হেন ক্ষেত্রে তাঁর বাড়া ভাতে ছাই দিতে এল কি না এক নিঃস্ব মারাঠী। হোক না পড়িয়ে ছেলে—বেকার তো?

কত বোঝালেন, কিন্তু মেয়ের ঐ এক গোঁ: মধুকে সে বিয়ে করবেই করবে। শেষে বদনবাবু রেগে উঠে মধুকে বার করে দিলেন "হাঘরে, বিশ্বাসঘাতক, বঞ্চক" প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করে। তাছাড়া বাঙালী বিয়ে করবে কিনা মারাঠীকে!

আর যাবে কোথায়? মধুর মামাও রুখে উঠলেন মধুর সঙ্গে। মারাঠীরা বাঙালীর চেয়ে কিসে কম শুনি? এগিয়ে এসে ফন্দি এঁটে নলিনীকে ডেকে গোপনে বিয়ে দিয়ে তাঁর কাছেই রাখলেন। বললেন: ওঃ! জানা আছে—বাপের রাগ তো—ছুদিন বাদে পড়ে যাবেই যাবে fait accompli-র যুক্তির জোরে।

রোখেই রোখ জাগে। বদন বাবু বললেন: "বটে! ব্লাকমেল!" লিখে পাঠালেন মধুর মামাকে যে মেয়েকে তিনি ত্যাগ করলেন সে যেন আর না বাড়ীমুখো হয়। হ'লে দরোয়ান ঢুকতে দেবে না। নলিনী কাঁদল। সে তো জানত না—ছেলেমানুষ—যে, মানে আঘাত লাগলে মানুষ প্রাণকে পণ করতেও পিছপাও হয় না। হায়রে মানুষের অহঙ্কার! মাথা কেটে ফেলবে, তবু নোয়াবে না!

কুড়ি

মধু ও নলিনী চোখে অন্ধকার দেখল। বদনবাবু বাপ হয়ে লঘু-পাপে গুরুদণ্ড দেবেন ওরা সত্যিই ভাবে নি। মধুর মামাও বিপন্ন। এদের কী গতি করা যায়? শেষে ভেবেচিন্তে মধু লিখল নাসিকে গণেশবাবাকে—গুরু যখন। গুরুর কথা মনে পড়ে মানুষের সবশেষে। কিন্তু গণেশবাবার কৃপা হ'ল। তিনি রাগ করলেন না, মধুকে টেলিগ্রাম করলেন: 'মেয়ে কেমন না দেখলে কিছু বলা চলে না।' মধু ছবি পাঠিয়ে দিল ভয়ে ভয়ে, না জানি কী রায় দেন গুরুদেব! তিনদিন বাদে আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ! তোমার সাধনার সহায় হবে। চলে এসো। তোমার সময় এসেছে।"

মধু ও নলিনী শুধু অকূলে কূল পাওয়া নয়, হাতে চাঁদ পেল। শুধু আশ্রয় পাওয়াই তো নয়—নলিনীও দীক্ষা নিতে রাজী। তবে আর ভয় কি? যুগলে চলবে সাধনার পথে এমন পুণ্য আশ্রমে থেকে এমন দেবগুরুর আশীর্বাদের ছায়ায়। এমন ভাগ্য ক'জনের হয়?

নলিনী বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা হ'লেও সাধুসন্তকে শ্রদ্ধা করত আন্তরিক। গুরুদেবের দিব্যকান্তি দেখে সে উজিয়ে উঠল। পায়ে মাথা রেখে চোখের জলে বলল: 'আমার মতন গড়পড়তা মেয়ের এতবড় সৌভাগ্য হবে ভাবতেও পারিনি গুরুদেব!' গুরুদেব আশীর্বাদ ক'রে বললেন: 'বিদ্যা স্ত্রী গড়পড়তা মেয়ে হয় না মা! বহুজন্মের সুকৃতির ফলেই তবে স্বভাবে শ্রদ্ধা ভক্তি ঠাঁই পায়। আর তারাই হয় বিদ্যা স্ত্রী—অতি বিরল বিকাশ মা!' কিন্তু ভাগ্য বিকাশ দুইই বিরল হ'লেও সাধনার পথ তো ফুলেলা নয়—কাঁটাবনের মধ্যে দিয়েই তার গতি। তাই সাধনা নিতে না নিতে ভাগ্যবানের

পথেও অভাবনীয় বাধা এসে পথ আগলে দাঁড়াবেই, আর যে যত বড় আধার তার সামনে বাধাও সেই অনুপাতেই হয়ে উঠবে মহাকায়।

মধু ও নলিনী ছিল সত্যিই নির্মল আধার। নৈলে কি আর দশ বছরের সাধনায়ই এত এগিয়ে যেতে পারত—পেত এমন গম্ভীর শান্তি! দেখছ তো দুজনেরই কী সরল বিশ্বাস, নিষ্ঠা, পবিত্রতা! গুরুদেবের দিব্যদৃষ্টির রায় কি ভুল হতে পারে? বহুজন্মের সুকৃতির ফলে তবে মানুষ হয় স্বভাব-সরল, স্বভাব-শুচি। আর হয় বলেই তাদের আধারে আধেয়, অর্থাৎ ঠাকুরের কৃপা, এত সহজে ঠাঁই পায়—শান্তি এসে দেয় বল, জোগায় পথের পাথেয়, মিলিয়ে দেয় পারের পারানি। কিন্তু ঠিক যেন সেই জন্যেই বাধাও আরো তাল ঠুকেই দাঁড়াল ওদের সামনে। সে এমনি বাহ্বাস্ফোট যে ওরা তো কল্পনা করতে পারেই নি, গুরুদেব যে-গুরুদেব—তিনিও ভাবতে পারেন নি। সে এক দীর্ঘ কাহিনী, বলি শুধু চুম্বকটুকু।

আমার বাবার কথা বলেছিলাম মনে আছে নিশ্চয়ই? তিনি গুরুদেবকে গোদাবরীর তীরে এই আশ্রমটির জন্যে একলক্ষ টাকা দিয়ে মহাপ্রয়াণ করেন। আমিই বাংলোটি গড়ে তুলি। এর কিছুদিন বাদেই তাঁর কাছে এক গুজরাটি যুবক এসে দীক্ষা নেয়। নাম চন্দুলাল। সুশ্রী, সুবুদ্ধি যুবক। সাধনায় তার মন বসে গেল দুদিনেই। গুণও ছিল তার অনেক, যেমন নিষ্ঠা, তেমনি গুরুভক্তি তেমনি বিনয়। সবচেয়ে বড় কথা: অক্লান্ত গুরুসেবার ক্ষমতা ও উৎসাহ। সে একটা দেখবার মত সেবা! আমি মাঝে মাঝে যখন নাসিকে যেতাম তার দেখা পাওয়া ছিল ভার। সে সর্বদাই আশ্রমের কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত। গুরুদেবের মুখেই শুনতাম তার আশ্চর্য কর্মিষ্ঠতার কাহিনী। প্রায় পৌরাণিক ছন্দ। মনে পড়ত গুরু নানকের শিষ্য মহাত্মা অঙ্গদের অক্লান্ত গুরুসেবার কাহিনী।

তার আসার বছর দুই পরে আসে মধু ও নলিনী। আমি তখন

তৃপ্তিপুরে। খবর পেলাম পরে গুরুদেবেরই এক পত্রে যখন ব্যাপারটা ঘনিয়ে ফেনিয়ে উঠল। বলি সংক্ষেপে।

নলিনী নাসিকে আসতে না আসতে চন্দুলালের হ'ল ভাবান্তর। গুরুবোনের রূপশ্রীর মোহ ওর মনকে পেয়ে বসল। ও চেষ্টা করত বৈকি কাটিয়ে উঠতে। কিন্তু আচরণে বেচাল না হ'লেও চিন্তায় ওর কথা ভাবত। প্রায়ই অনেক বড় সাধকেরও বাধা হয়ে আসে এই মেয়েদের রূপের চিন্তা। আচরণে ছাড়া না পেলে কামনা চিন্তা থেকে খোরাক পায় বেশি—যার রস তাকে নেশার মতন পেয়ে বসে। এই জন্যেই আমাদের গীতায় বলেছে খুব জোর দিয়েই যে, শুধু কর্মে শুচি সংযমী হ'লেই চলবে না, মনে মনেও কামনাকে আস্কারা দেওয়ার নাম মিথ্যাচার। চন্দুলাল একথা গুরুদেবের কাছে শুনেছিল বহুবারই। কিন্তু সে মনে মনে কেবলই সাফাই গাইত: 'গীতায় তো ঠাকুর এও বলেছেন যে, মন স্বভাবে চঞ্চল, বাগ মানে না—কাজেই কী করব! ওর কথা ভাবতে ভালো লাগে যে!'

কুচিন্তার বশে এই "ভালো-লাগার" ওকালতি করেই ও দ-য়ে মজল। তাই গুরুদেবকে ভক্তি করা সত্ত্বেও বলত মনে মনে: 'তিনি মহাপুরুষ, বাল-ব্রহ্মচারী। আমাদের মতন গড়পড়তা মানুষের মনের হদিশ পাবেন কেমন করে?' এই ধরনের আরো নানা যুক্তি দিয়ে সে সমর্থন করত কুচিন্তাকে। বলত নিজেকে 'আচরণে যখন ঠিক আছি তখন নলিনীর কথা একটু আধটু ভাবলামই বা, ক্ষতি কী?' দেখেও দেখতে চাইল না যে একেই বলে 'ভাবের ঘরে চুরি।'

টলস্টয় বলেছিলেন একটি গভীর কথা: যে কুচিন্তা কুকর্মের চেয়েও সাংঘাতিক, কেন না কুকর্মের পরে অনুতাপ আগেই আসে যার ফলে প্রায়শ্চিত্তের পথ খুলে যায়; কিন্তু কুচিন্তাকে পাপ বলে মনে হয় না বলেই ক্রমশঃ মনে হয়—কুকর্ম তেমন নিন্দনীয় নয় তো—কিন্তু করছি না যখন তখন চিন্তায় একটু আধটু রস পেলে ক্ষতি কি?

কিন্তু আমাদের তন্ত্রে আছে আরো গভীর কথা : যে কুকর্ম যদি হয় কায়িক পাপ, কুচিন্তাকে বলা চলে মানস পাপ—এইজন্যে যে, কুকর্মের ফলে একটু আধটু করে দৃষ্টিশক্তি কমতে কমতে শেষ কুচিন্তাবিলাসী প্রায় অন্ধ হয়ে পড়ে। ফলে হয় কি, সে দেখেও দেখতে চায় না যে, কুচিন্তাকে আমরা আস্কারা দেই ওর মধ্যে দিয়ে বিলক্ষণ রসের খোরাক পাই বলেই।

আরো একটি উপমা দেওয়া চলে ডাক্তারী শাস্ত্র থেকে : কুচিন্তা যেন কুকর্মের আদি-বীজাণু মাইক্রোব। প্রথমে জন্মায় একটি দুটি চারটি আটটি ··কিন্তু তারপর বেড়ে চলে geometrical progression-এ, হু হু করে। ডাক্তারেরা বলেন--রোগের প্রথম স্টেজে মাইক্রোব দুটি চারটি জন্মাতে না জন্মাতে ইঞ্জেকশনে তাদের নির্মূল করা সহজ হ'লেও যখন এরা বংশবৃদ্ধি করতে করতে রক্তকে বিষিয়ে তোলে তখন হয়ে দাঁড়ায় প্রায় too late.

চন্দুলাল একথা ভালো করেই জানত, কারণ গুরুদেব তাকে পই পই করে মানা করেছিলেন কুচিন্তাকে আমল না দিতে। কিন্তু বড় সাধক তাড়াতাড়ি উন্নতি করে ব'লেই বাধাও তাদের তেমনি জোরেই পিছিয়ে দিতে এগিয়ে আসে। চন্দুলালের ক্ষেত্রেও তাই হল—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে : কয়েক মাসের মধ্যেই এই কুচিন্তার রক্তবীজে ওর মনের মধ্যে গজিয়ে উঠল তপ্ত লালসার অক্ষৌহিণী। যদি প্রথম দিকেই গুরুদেবকে বলে তাঁর কৃপার ইঞ্জেকশন নিতে চাইত তাহ'লে এ-লালসার অনীকিনী ওকে ছেয়ে ধরত না। কিন্তু তা চায় নি বলেই ও দেখতে দেখতে লালসার তাড়নায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে শেষে সইতে না পেরে পালিয়ে গেল। সোজা উত্তরকাশীতে গিয়ে গুরুদেবকে লিখল একটি কাতর পত্র সব জানিয়ে। তার মর্ম এই : আপনার কথায় কান না দিয়ে কুচিন্তার আনন্দকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম। তাই তো আজ আমার এই শাস্তি—যোগভ্রষ্ট হতে হল। কিন্তু এ-খেদ করে এখন আর লাভ কী? বিষের বীজ

বুনলে তো আর অমৃত ফল ফলতে পারে না। আমি চলে এলাম শুধু এই জন্যে যে, আমার মনে হল আমার মতন পাপীর অধিকার নেই আপনার পুণ্য আশ্রমে থাকবার। নলিনী সতী-লক্ষ্মী, মহাসাধিকা। তাকে বলবেন আমাকে ক্ষমা করতে। আর সম্ভব হলে আপনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন—যেন এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। যদি পারি তবেই ফিরব, নৈলে এ-পাপদেহ গঙ্গাজলে বিসর্জন দেব। কী হবে বেঁচে থেকে—যদি সাধনার পথে চলতে না পারি? গ্লানিতে মন আমার বিষিয়ে উঠেছে। বিষক্ষয় হতে পারে শুধু গুরুকৃপায়—এই বিশ্বাসটিই কেবল সম্বল এ-দুর্লগ্নে। এটুকুও কেড়ে নেবেন না। আপনার প্রসাদের পুণ্য স্পর্শে আমি নবজন্ম চাই—অমানুষ থেকে আবার মানুষ হয়ে…'

চন্দুলালের আচরণে খুঁৎ না পেলেও তার চাহনি ও ধরনধারণ থেকে নলিনী আঁচ পেয়েছিল তার চিত্তচাঞ্চল্যের। আসক্তির আঁচ মেয়েরা পায় পুরুষদের অনেক আগে। কিন্তু সে-ও বুঝতে পারে নি তার রূপ চন্দুলালকে কী গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। যখন শুনল সব—গুরুদেব ওকে খোলাখুলিই সব বললেন, চন্দুলালের চিঠিও পড়ে শোনালেন কিছু কিছু বাদ দিয়ে—তখন ও অশান্ত হয়ে উঠল। পুণ্য আশ্রমের শান্তিময় পরিবেশে এসে ও এ কী কালো আঁধি টেনে আনল! গুরুদেবের পায়ে লুটিয়ে কেঁদে বলল: 'একটা তুচ্ছ মেয়ের জন্যে অতবড় একনিষ্ঠ সাধক যোগভ্রষ্ট হল—এ আমারই শাস্তি, গুরুদেব। জানি না কী পাপ করেছিলাম পূর্বজন্মে। আপনি আমাকে বিদায় দিন। আমি চলে যাব বাবার কাছে। চন্দুলালকে ফিরিয়ে আনুন। এর পরেও আমি এখানে সাধনা করব কোন্ মুখে বলুন?"

গুরুদেব ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: 'তোমার কোনো অপরাধই হয়নি মা। চন্দুলাল ভুগছে তার নিজের কর্মফলে—যাকে কেউ এড়াতে পারে না। তবে তুমি মিথ্যে মন খারাপ করো না। ও

যোগভ্রষ্ট হবে না। চ্যুতি স্খলন কার না হয় এ-পথে? কিন্তু যদি কেউ সত্যিই তাঁকে চায় তাকে পতনও আরো ঠেলে দেয় সাধনার পথে—তুলে ধরে তাঁরই পায়ের আরো কাছে। আমাদের তন্ত্র শাস্ত্রে বলে 'গণয়সি যদিদং বন্ধনমাত্রং পশ্চাৎ দ্রক্ষ্যসি মোচনদাত্রম্—' অর্থাৎ আজ যাকে মনে করছ বন্ধনকারা কাল সে-ই হবে তোমার মুক্তির সিঁড়ি। তাই তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের সাধনায় মন দাও, এর ওর তার কথা ভেবে মিথ্যে মাথা বকিয়ো না। আর একটা কথা মনে রেখো—বড় সাধকের অনেক সময়েই বড় স্খলন হয়—কিন্তু যারা সত্যিই বড় সাধক—যেমন চন্দুলাল—তারা এই পড়ার মধ্যে দিয়েই আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করে ঠাকুরের করুণা, বাধার ঘা খেয়েই আরো শক্তি পায় সাধনায় একনিষ্ঠ হবার। মা! এ-পথকে মুনি ঋষিরা ক্ষুরধারের মতন দুর্গম বলেছেন কি সাধে? তাছাড়া এ-ও তো সবাই জানে যে, মানুষ যত উঁচুতে ওঠে পড়লে তাকে ততই বাজে। ওর এ-আঘাতের দরকার ছিল। আমার কথায় ও ইচ্ছে করেই কান দেয় নি। ভেবেছিল নিজেকে বলিষ্ঠ বিজ্ঞ। তাই কুচিন্তাকে আস্কারা দিয়েছিল কুমতির ফেরে পড়ে। এইখানেই ছিল ওর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা—নিজেকে বড় আধার ভাবা, আর সাধনার পথে এলে যার যেখানে দুর্বলতা সেখানেই ঘা খেতে হয় সব আগে।'

গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণী ফলল কিন্তু অভাবনীয়ভাবে। সব কথা বলা সম্ভব নয়। তাই বলি যেটুকু না বললেই নয়।

চন্দুলাল উত্তরকাশীতে একলা একটি কুঠিয়ায় থাকত গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে। রাণী কমলীওয়ালীর ছত্রে যা ভিক্ষা পেত তাই ও ভগবানের দান বলে গ্রহণ করত। দিনে গুরুমন্ত্র জপ করত, রাতে গুরুমূর্তি ধ্যান। ওর প্রিয় শ্লোক ছিল:

ধ্যানমূলং গুরোমূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।

কিন্তু হলে হবে কি, যতই ও সাধনায় ডুবতে চায় ততই মন রুখে

উঠে গজরায়ঃ “মধু পেল বিছ্যা স্ত্রী। গাছেরও পাড়বে তলারও কুড়োবে, শুধু একা আমিই উপোষ করে থাকব? এর নাম কি সুবিচার? আর কামনা যখন এত প্রবল তখন তাকে দাবিয়ে রেখেই বা কী হবে? এরই তো নাম রিপ্রেশন···” ইত্যাদি বিজ্ঞ বিলিতি বুলি।

এই দ্বিধাভাব ওকে পাকে ফেলল যেন আবার নতুন করে। কারণ ও দেখেও দেখতে চায়নি যে, যে-গুরুকে ও ইষ্টের পদবী দিয়েছে তাঁর কথাও মানতে না চেয়ে প্রবৃত্তির নিচুটানের সাফাই গাইছে ক্ষোভের কুযুক্তি দিয়ে।

কিন্তু ঐ সঙ্গে উর্ধ্বটানও তো ছিল। গুরুশক্তি সেই টানকেই আশ্রয় করে তারই জোরে ওকে টেনে তুলল ভরাডুবি থেকে। দেখিয়ে দিল ওর চোখে আঙুল দিয়ে যে ও খতিয়ে ইন্দ্রিয়ভোগ চাইছে বলেই ওর বাধা কেটেও কাটছে না ও অন্ধকারকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে বলে। আলো আর অন্ধকারের সহবাস হয় না তো। আলোকে চাইলে অন্ধকারকে বিদায় দেওয়াই চাই। মরুকগে—বলি গুরুশক্তি কীভাবে ওকে বাঁচালো মরণদশায়—যাকে বলে eleventh hour-এ; বলি ওরই ভাষায়, পরে যেভাবে আমাকে বলেছিল।

‘সেদিন সন্ধ্যা থেকে’—বলল চন্দুলাল—‘আমার মনে ক্ষোভের জটলা আরো ফুলে উঠেছিল। তাই আমি রুখে উঠেই ধ্যান করতে বসলাম নলিনীকে। না—চিন্তাকে আর রুখব না—সাপ্রেশন রিপ্রেশন নিষ্ফল—চিন্তার মধ্যে দিয়েই ভোগ করব ওর রূপশ্রী—যা থাকে কপালে।

‘যেই বলা, অমনি দেখলাম নিজের মধ্যে থেকে আলকাতরার মতন এক মিশ্‌কালো দুর্গন্ধ বামন বেরিয়ে এল। সে বলল: ঠিক ঠিক, আমাকে খোরাক দিচ্ছ না বলেই তুমি এত ভুগছ। ফিরে চলো আশ্রমে। একটু চেষ্টা করলেই নলিনীকে পাবে পাবে পাবে।

যে-মেয়ে একজনের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে পারে সে আর একজনের সঙ্গেও বেরিয়ে আসতে পারে। ও সতীলক্ষ্মী কে বলল? ও স্বৈরিণী —বিলাসিনী। দেহপণ্যার দেহ একটু ভোগ করে নেওয়ার মধ্যে অন্যায় কী থাকতে পারে? মধু কি ভোগ করছে না? তবে? তোমার বেলায়ই যত আপত্তি?'

'যেই একথা শোনা আমার চোখ খুলে গেল। ধিক্! যে-আমি নিজেকে বড় আধার ভাবি মধুর সঙ্গে তুলনা করে—সেই আমি আসলে এত কুশ্রী কুচক্রী? নলিনী বিলাসের কোলে মানুষ হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু স্বৈরিণী? মধু ছাড়া কারুর দিকে যে কোনোদিন ভুলেও তাকায় নি? সে যে মধুকে সত্যি ভালোবাসে তার অকাট্য প্রমাণ দেয়নি কি ধনবৈভব ছেড়ে আশ্রমের দরিদ্র জীবন বরণ করে! ছি ছি! ফুলকে অপমান করতে যাচ্ছি পায়ে মাড়িয়ে!—স্বয়ং গুরুদেব যাকে উপাধি দিয়েছেন অমলা সেই সতীলক্ষ্মীকে পাপিষ্ঠ আমি কিনা জেনেশুনে নামাতে চাচ্ছি পাঁকে? এরই নাম কি প্রেম?'

'মন কালো হয়ে গেল ভাবতে ভাবতে আরো ঘৃণায় গায়ে কাঁটা দিল ঐ আলকাতরার মতন কালো দুর্গন্ধ বামনটার কথা ভেবে যে এতদিন আমার মধ্যেই গা ঢাকা হয়ে ছিল—তাকে লালন করেছিলাম বলেই না!

'ক্ষোভে দুঃখে মনস্তাপে লজ্জায় শেষে পাগলের মতন হয়ে ছুটে গেলাম নদীর দিকে। পাড়ে এক জায়গায় একটা পাথর বেরিয়ে জলের উপর ঝুলছে। এগিয়ে তার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে প্রার্থনা করলাম: 'ঠাকুর, আমি দেখতে পেয়েছি আমার নিজ মূর্তি। টের পেয়েছি আমি কী জঘন্য নরকের কীট। বুঝতে পেরেছি আমার পক্ষে এ-জন্মে ভগবান লাভের আশা দুরাশা। তাই এ-পাপদেহ আমি আজ মা গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবই দেব। কেবল ···কেবল এ-পারে আমাকে আশ্রয় না দিলেও ওপারে পায়ে টেনে নিও—এই আমার শেষ মিনতি ঠাকুর!'

"ব'লে রাত তুপুরে খরস্রোতে ঝাঁপ দিতে যাব—এমন সময়ে দর্শন পেলাম গুরুদেবের। শুধু দর্শন নয়। শুনলাম তাঁর আশ্বাস, বললেন তিনি : 'তোমার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে। তোমার আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতাই তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তুমি ফিরে এসো এবার। কামনার তাড়না তোমাকে আর ভোগাবে না, ভয় নেই।'

অমনি কী আশ্চর্য, আমার মনের মধ্যে হঠাৎ হারানো শান্তি ফিরে এল! অমাবস্যার রাতে চারিদিক আলোয় ছেয়ে গেল। কী আনন্দ! শুধু আনন্দ নয়—বল, শক্তি! কে যেন আমার কানে আশ্বাস দিয়ে বলল : 'তোর তুর্গতি হবে কেমন ক'রে—যে স্বভাবে গুরুদাস—স্বধর্মে সাধক? তুই জঘন্য কে বলল? তন্ত্রে কি বলে না— যার 'পুর্ণাভিসেচন হয়েছে 'পূর্ণজ্ঞানরসানন্দ জীবন্মুক্তি' হবেই হবে?"

এ-সব কথা পরে ও আমাকে আরো খুঁটিয়ে ফলিয়ে বলেছিল— অঘটনের শোভাযাত্রা যাকে বলে। কিন্তু সে সব বলব আর একদিন। আজ বলি ওর পরে কি হল।

ও বলল আমাকে : ভাই, ওসব গুরু ছাড়া কাউকে বলার কথা নয়। তবে তুমি গুরুভাই, আর গুরুদেব তোমাকে বলতে বলছেন বলেই বলছি! শোনো।

"গুরুদেবের বর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমি যেন নতুন মানুষ। খানিক আগে যার মধ্যে থেকে জঘন্য বামন বেরিয়ে এসেছিল তারই মধ্যে জেগে উঠল পবিত্রতার স্বাদ আলো শান্তি। ভাষায় তার বর্ণনা হয় না ভাই! কিন্তু একথা একটুও বাড়িয়ে বলা নয় যে, মরণের কিনারায়ই আমার কাছে এসেছিল নবজীবনের দৈববাণী গুরুশক্তির মাধ্যমে। আমার মন উঠল গান গেয়ে। আমি তুর্বল কে বলল? আমি যে স্বাধিকারে ব্রহ্মচারী—গুরুদাস, সাধক, যাকে গুরু পৌঁছে দিয়েছেন ইষ্টের পায়ে। আমি পাপী? কখনই না! স্খলন? ও মায়া। আমার হৃদয়ের তারে তারে বেজে উঠল :

বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্'

সব বিঘ্ন কেটে গেছে যে-ঠাকুরের কৃপায় তাঁকে ছাড়া কাকে প্রণাম করব ?

"পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল সে কী আনন্দের আলোয়! বিষাদ গ্লানি অবিশ্বাসের চিহ্নও নেই, শুধুই শান্তি, পুলক আর কৃতজ্ঞতা। গুরুর কৃপায় অঘটনের শোভাযাত্রা চাক্ষুষ করেছি তো কতই—দিনের পর দিন। কিন্তু এযে সব হারানোর মুখে সব ফিরে পাওয়া! শুধু গুরুকৃপায় ইন্দ্রজালই নয়—দিব্যদৃষ্টির বরদান! আর তার পরেই আর এক অঘটন: গুরুদেবকে তার করতে যাব আশ্রমে ফিরবার অনুমতি চেয়ে এমন সময়ে তাঁর তার পেলাম: 'ঠাকুর তোমাকে বাঁচিয়েছেন—এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসো।'

"নাসিকে পৌঁছেই গুরুদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়লাম। তিনি হেসে বললেন: 'কী? গুরুকৃপা দূর থেকেও কাজ করতে পারে এ-বিশ্বাস আর টলমল করছে না তো?'

এমনি সময়ে নলিনী গোদাবরীতে স্নান সেরে ঘরে ঢুকেই থম্‌কে গেল। গুরুদেব ইচ্ছে ক'রেই তাকে চন্দুলালের কাহিনী বলেছিলেন যা যা দূর থেকে দেখেছিলেন—সাহেবরা যাকে clairvoyance নাম দিয়ে বাহবা, বাহবা!—ব্যাপারটা জলের মতন সাফ হ'য়ে গেছে!

চন্দুলাল নলিনীকে দেখেই উঠে গিয়ে তাকে গড় হয়ে প্রণাম করল। নলিনী কুণ্ঠিত হয়ে 'আহা, করেন কি করেন কি!' বলতেই চন্দুলাল বলল: 'করি যা কর্তব্য, মা। অন্ধকারে পড়েছিলাম গুরুই সূর্য হয়ে আত্মজ্ঞানের দিব্যদৃষ্টি দেন। কিন্তু এ-দিব্যদৃষ্টির বর পেয়েছিতো আমি আপনারই মাধ্যমে। নৈলে কি এমন ক'রে দেখতে পেতাম আমার গোড়ায় গলদ যাকে দেখতে পাই নি ব'লেই ভুগেছি কর্মভোগে? মা, অঘটন ঘটে তো অকারণে নয়, ঘটে—আমাদের ঢেলে সাজাতে। গুরুদেব আমাকে ঢেলে সাজালেন যে আপনারই হাত দিয়ে। তাই আপনাকে প্রণাম করব না তো করব কাকে বলুন?'

একুশ

সোফিয়া স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল ঃ "দাদা! কী সব কাণ্ড যে ঘটে আপনাদের দেশে সত্যিই ভেবে পাই না। আর সেই জন্যেই বিশ্বাস যেন এসেও আসতে চায় না, কেন না এ-ধরনের অঘটন আমাদের দেশে কই ঘটে না তো!'

অসিত (হেসে) ঃ কে বলল ঘটে না? বহু সাধক-সাধিকার জীবনেই ঘটেছে। কেবল তোমরা খবর রাখো না, খবরের কাগজের রাজ্যের বাজে খবরে বেশি মশগুল থাকো ব'লে। আনাতোল ফ্রাঁসের একটি লেখায় পড়েছিলাম যে তোমাদের দেশেরই এক সেণ্ট —তাঁর নামটা ভুলে গেছি—প্রবৃত্তির তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে মরুভূমিতে গিয়ে ধ্যান করতেন মাটিতে গহ্বর কেটে—আর সেখানেও দেখতেন ধ্যানে ইষ্টদেবকে নয়—সার সার সুন্দরী উলঙ্গিনীকে।

বার্বারা ঃ হ্যাঁ, আমিও পড়েছি। সেণ্ট অ্যাণ্টনি, না সেণ্ট জেরোম বুঝি, ঠিক মনে নেই।

মরুক গে—না, একটা প্রশ্ন আছে ঃ চন্দুলাল কী দেখল তার মধ্যেকার কুৎসিত বামনকে? আমাদের দেশের কোনো সেণ্টের জীবনে তো কই—

অসিত ঃ কী বলছ? সেণ্ট তেরেসার আত্মজীবনী কী পড়লে তবে? পদে পদে শয়তান কত রূপে আসত তাঁর সামনে—কখনো শিং-ওয়ালা জন্তু, কখনো কুকুর আরো কত কী মূর্তিতে! কত লোভ দেখাত তাঁকে—আর অমন মহীয়সী সাধিকা সব জেনেও পিছল চিন্তার ফেরে পড়তেন—তারপর আসত অবসাদ চিত্তগ্লানি অনুতাপ নিজেকে মহাপাপী—sinner sinner sinner ব'লে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া পদে পদে। পড়নি?

বার্বারা ঃ পড়েছি, দাদা! কিন্তু ঐ কালো কুৎসিত বামনটা তো ঠিক শয়তান নয়?

অসিত ঃ না। সাক্ষাৎ দেবদূত।

বার্বারা ঃ আপনি ঠাট্টা করছেন। চন্দুলাল এ-শয়তানকে দেখল তো নিজেরই মধ্যে।

অসিত ঃ শয়তানের আসল ডেরা তো বাইরে নয় দিদি—আমাদের অন্তরই তার চিরন্তন রাজধানী।

বার্বারা ঃ কিন্তু এমন কুৎসিত—আলকাতরার মতন মিসকালো—দুর্গন্ধ—

অসিত ঃ ঐখানেই আসে গুরুকৃপার কথা। যাকে চন্দুলাল বলেছিল—গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষু,—গুরুরূপ সূর্যের বরে-পাওয়া দিব্যদৃষ্টি। এরই আলোয় ধরা পড়ল শয়তানের আসল স্বরূপ। কিম্বা উপমা দেওয়া যায়—গুরুশক্তির হাওয়ায় তার মুখোস খুলে পড়ল ব'লেই চন্দুলাল দেখতে পেল তার লালসার নিজমূর্তি। নৈলে শয়তান আসত তার কাছে মোহন বেশেই। কিন্তু এসব সাধনার গহন তত্ত্ব—সাধনা না করলে ঠিক বুঝবে কেমন ক'রে? তাই শুধু একটিমাত্র কথা বলি—ঠিক ব্যাখ্যা নয়—তবে খানিকটা হয়ত ফিকে হ'য়ে আসবে রহস্যের অন্ধকার। তোমাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে বলা চলে subconscious; আমাদের চেতন মনে যে-বাসনা ডালপালা মেলে তার মূল লুকিয়ে থাকে এই অবচেতনে। তাই অবচেতন মনে পাঁকেরই জয়জয়কার—স্বপ্নে যে-ক্লেদের পরিচয় ফেঁপে ওঠে পদে পদেই দিনের পর দিন। যে-সব চিন্তাকে কুচিন্তা ব'লে আমরা দাবিয়ে রাখি তাদের রূপান্তর করতে না পারলে তারা গাঢাকা দিয়ে বসবাস করে অবচেতনে। তাই সদগুরুরা বলেন বারবারই যে, এই অবচেতনের শুদ্ধি না হ'লে চিত্তশুদ্ধি হয় না, হ'তে পারে না। কিন্তু অবচেতনের কৃপায় আলো নামা অত্যন্ত কঠিন তাই তো প্রাণপণে সাধনা করতে হয় বহুদিন ধ'রে। এরই নাম

নিষ্ঠা। এ-নিষ্ঠা যার আছে শুধু তারই হয় শেষরক্ষা। যারা একটু নাস্তানাবুদ হ'তে না হ'তেই বা শুষ্কতার মরুভূমিতে দুঃখ পেতে না পেতেই গুরুশক্তিকে ভগবৎ কৃপাকে অবিশ্বাস ক'রে বসে তাদের বস্তুলাভ হয় না, কারণ তাদের অবচেতন মন থেকে যায় যে-তিমিরে সেই তিমিরে। চন্দুলাল কুচিন্তাকে দিনের পর দিন প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে সে-সব চিন্তার হাজারো শিকড় তার অবচেতনে গেঁথে গিয়েছিল। স্বপ্নে সে-সব চিন্তা ওকে আরো অতিষ্ঠ ক'রে তুলত কিন্তু তবু এ-সব চিন্তায় রস পেত ব'লে সে ছাড়তেও পারত না ভোগের নানা জল্পনা কল্পনা। উত্তরকাশীতে গিয়ে ও একমনে দিনের পর দিন প্রার্থনা করেছিল চোখের জলে। কাজেই গুরুশক্তি —বা গণেশ ঠাকুরের বিঘ্নহন্তা আলো যাই বলো—নামল ওর অবচেতনে। ফলে সেখান থেকে গাঢাকা শয়তানকে বেরিয়ে আসতে হ'ল নিজমূর্তি ধ'রে। চন্দুলাল শিউরে উঠল দেখে সে-কুৎসিত রূপ। সঙ্গে সঙ্গে 'আমি মস্ত সাধক' এ-দম্ভ ওর কেটে গেল। টের পেল কী কুৎসিত গৃহশত্রুকে ও সাদরে প্রশ্রয় দিয়েছে—খাল কেটে কুমীর ডেকে এনে! তখন শেষে শয়তান ওকে বোঝালে ওর সাধনায় সিদ্ধির আশা দুরাশা কারণ শয়তান—আমরা একে বলি মার— চায় শুধু দেবদ্রোহিতা। যদি জীবনে সাধককে বিপথে চালিয়ে তার সাধনা নষ্ট করতে না পারে, তো তাকে আত্মহত্যার ফুসলানি দিয়ে যোগভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। যারা গুরুশক্তিকে নিরভিমান সুরে ডাকতে চায় না, মার তাদের ভোগায় নানা পাকে ফেলে। কিন্তু যারা চন্দুলালের মতন মরণের কিনারায় এসেও চায় কৃপার বরদানে নবজন্ম—তাদেরই গীতায় বলেছে কল্যাণকৃৎ, কি না দৈবী পথের পথিক। এদের শেষরক্ষা হয়ই হয়—মরতে মরতেও হয় নবজীবন লাভ—কাজেই দৈব করুণা এদের অহরহ ধারণ ক'রে থাকে। এই করুণার একটি প্রধান বাহন হ'ল গুরুশক্তি। তাই চন্দুলাল মরণের উপান্তে এসে খেই পেয়ে গেল নবজীবনের—

হ'ল গুরুদর্শন, স্পর্শ পেল তাঁর কল্যাণী কৃপার। অম্‌নি নামল ওর অবচেতনে আলো। তারপর মার লুকিয়ে থাকবে কোন্ ফাটলে? সে যে অন্ধকারের বাসিন্দা, আলোয় টিকতে পারবে কেন?

তপতী: বড় চমৎকার বলেছ, দাদা। কেবল আমি আর একটু জুড়ে দিতে চাই: যে, এ-আলোও ক্রমশঃ বাড়ে—এক মুহূর্তেই সব ফরসা হয়ে যায় না। অবচেতন সহজে বাগ মানে না। তাই কৃপা পাওয়ার দায়িত্ব আছে। মানে, যে পায় তাকে আরো সাবধান হ'তে হয়। যে অহঙ্কার করে কৃপা পেয়েছি ব'লে সে ঐ অহঙ্কারের প্রত্যবায়েই ফের পাকে পড়ে—ভোলে নতুন ক'রে। তাই অনেক সময় একই গ্লানি ফিরে ফিরে আসে। যদি let there be light and there was light এই অঘটনই সাধনার শেষ উপলব্ধি হ'ত তাহ'লে সব-গোল চুকে যেত, কিন্তু ঠাকুর থেকে থেকে অঘটন ঘটিয়ে আমাদের ভরসা দিলেও অঘটনের আদরে আমাদের সাধনার মাথাটি খেতে চান না। তাইতো সদগুরুরা সবাই একবাক্যে নিষ্ঠার এত জয়ধ্বনি করছেন। কেন না অঘটনে আলো নামতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠা ছাড়া আর কেউ সে-আলোকে ধরে রাখতে পারে না।

অসিত (প্রীতকণ্ঠে): বড় সুন্দর ক'রে বলেছ তপতী। কেবল দুঃখ এই যে, সাধনা যারা করে নি তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না এসব কথার মর্মবাণীটি। ভাববে এ সবই ধোঁয়াটে কথা বা ফাঁকা শাস্ত্রের বুলি।

তপতী (চোখ): কিন্তু বারবার এই একই দুর্ভাবনাকে আমল দাও কেন দাদা, যখন জানো যে, যাদের বলছ তারা এ-সব বাণীর মধ্যেকার আলো ছেড়ে বাইরের ধোঁয়াটাকেই বড় ক'রে দেখবে না? তাই তুমি ব'লে যাও নির্ভয়ে—ওরা সবটুকু না বুঝতে পারলেও যেটুকু বুঝতে পারবে তাতেই এমন আলো পাবে হাজার ধোঁয়ায়ও যাকে ঝাপসা করতে পারে না।

বার্বারা (হাততালি দিয়ে সানন্দে) ঃ ঠিক বলেছ দিদি। এমন না হ'লে দিদি !

সোফিয়া : যা বলেছিস। দাদার অগুন্তি গুণ থাকলেও এই একটি দোষে সব মাটি যে, তিনি ঘড়ি ঘড়ি ভেবে আকুল হন—তাঁর কথাকে আমরা ঠিকভাবে নিতে পারব কিনা। এ-অপমান কি সওয়া যায় ?

অসিত (করুণ হেসে) ঃ আকুল হই কি সাধে দিদি ? তোমরা যে ওঁৎ পেতে থাকো কখন কোন্ বেফাঁস কথা বলব—যাকে বুদ্ধির তীরন্দাজিতে ছিন্নভিন্ন করে দেবে। মোহন মহারাজ প্রায়ই আমাকে ধমকাতেন ঃ গীতার শেষ কথাটি মনে রেখো বাবা, যে এসব কথা যাকে তাকে বলা ভালো নয়। (বার্বারা ও সোফিয়াকে) না না, যাকে তাকে বলতে তোমাদের মনে করছি না, বিশ্বাস কোরো। করলে বলতাম না সাধনার এসব গুহ্য কথা। আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল শুধু এই যে সাধনা সম্বন্ধে শুধু গল্পগাছা শুনলে ঠিক বোঝা যায় না একনিষ্ঠ সাধক কোন্ পথে চ'লে কী পায় কেমন ক'রে। একথার তাৎপর্য বুঝবে বাকিটুকু শুনলে। তাই শোনো বলি। এবার মন্তব্য রেখে ব'লে যাব একটানা।

তপতী (হেসে) ঃ ধন্যবাদ দাদা। কেবল মনে রেখো এ-প্রতিজ্ঞা। সবাই হেসে ওঠে।

বাইশ

হাসি থামতে অসিত বলল ঃ "কতদূর বলেছি ?"

বার্বারা : চন্দুলাল নলিনীকে প্রণাম করল।

সোফিয়া ঃ আমার কিন্তু ভারি চমৎকার লাগল একথা শুনে। এরই তো নাম real drama !

অসিত ঃ কিন্তু ড্রামার এখন হয়েছে কি দিদি ! শোনোই না—চন্দুলালের ভাষায়—অঘটনের শোভাযাত্রা—শোভাযাত্রাই বটে। (হেসে) নলিনী ও চন্দুলালের কথা বললাম সরলার কাহিনীকে আরো একটু ফলাও ক'রে বলতে চাই ব'লে। কেন একথা বলছি—শেষ অধ্যায়টা শুনলেই মালুম হবে।

মোহন মহারাজের জবানীতেই বলি ঃ

বলেছি, গুরুদেব নলিনীকে বরণ করেছিলেন সুলক্ষণা সাধিকা ও বিদ্যা স্ত্রী ব'লে। একথা আমাকে প্রথম বলে চন্দুলালই—যখন সে নলিনীর মোহে প'ড়ে অশান্ত হয়ে উঠেছিল। তাই বলেছিল—একটু ঠেস দিয়েই বলব—যে, নলিনীকে দেখলে বিদ্যা স্ত্রী মনে হয় বোধহয় কেবল মহাগুরুদেবেরই—আমাদের মত গরিবরা ওর মধ্যে দেখে শুধু কালিদাসের ভাষায় "পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতৈব—অর্থাৎ অজস্র ফুলের ভারে নত দুলন্ত লতার ম'ত।"

ওর এ-বাঁকা কটাক্ষে একটু আশ্চর্য হয়েই আমি জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম "কী ব্যাপার চন্দুলাল ?"

চন্দুলাল একটু চুপ করে থেকে বলছিল : "সে না বলাই ভালো। কাজ কি ভাই পরের কথায় ?"

আমার মনে কৌতূহল জেগে উঠল : "বলই না।"

তখন ও বলল : "কাউকে বলবে না ?"

আমি বললাম : "না।"

ও বলল : "তবে শোনো। গুরুদেব মধু ও নলিনীকে সংযমের উপদেশ দিলেও পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দীক্ষা দেন নি, বলেছেন—ওদের স্বধর্ম না কি সন্ন্যাসীর নয়, গৃহীর। তাই ওদের সাধনায় সংযমই যথেষ্ট, বিরতির সময় আসবে যথাকালে। শাস্ত্রেও না কী বিধান আছে—এই ভাবেই সাধনার পথে এগুতে হয়। চমৎকার—to make the best of both worlds !"

আমি চন্দুলালকে কথা দিয়েছিলাম ব'লে মধুকে কিছু বলি নি। কেবল গুরুদেবকে একদিন নিরালায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আমার ধারণা ছিল গুরুদেব, যে স্বামী স্ত্রী সাধন পথে এলে তাদের পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের ব্রত নিতে হবে। এ-ধারণা কি তবে ভুল ?"

গুরুদেব হেসে বলেছিলেন : "মধু ও নলিনীর সাধনা—এই না ?—দেখ বাবা, একটি কথা বলি আজ একটু মন দিয়ে শোনো। কার সাধনার পথ কখন কোনদিকে মোড় নিয়ে সার্থক হয় এ-জাতের প্রশ্ন নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর নাম শুধু মনের বাজে খরচ। কারণ এর যথার্থ উত্তর জানেন কেবল সদ্‌গুরু। আর সদ্‌গুরুরা এও জানেন যে 'যত পথ তত মত'। তাই চন্দুলালের বা তোমার বেলায় যে-ব্যবস্থা মধু ও নলিনীর বেলায়ও যে অবিকল সেই ব্যবস্থাই দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমি কি বারবারই তোমাকে বলি নি যে, অমুকের বেলায় যে বিধান শুভ তমুকের বেলায় সে বিধান অশুভ হ'তে পারে।"

আমি একটু অপ্রতিভ হ'য়ে বলেছিলাম : "আমি জেরা করতে এ-প্রশ্ন করি নি গুরুদেব। আমি শুধু···মানে আমার স্ত্রীকে—"

গুরুদেব বাধা দিয়ে বললেন : "লিলিকে তোমার ছাড়তে হয়েছিল সে অবিদ্যা স্ত্রী ছিল ব'লে—তোমার ঠাকুরকে বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলে দিয়েছিল ব'লে। এক কথায় তোমার সাধনার পথে সে বিষম

বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল বলে। মধুর সাধনার পথে ব্যবস্থা উলটে গেল আধার ভেদের দরুণ—অর্থাৎ নলিনী বিদ্যাস্ত্রী হ'য়ে ওর সাধনার সহায় হ'য়ে দাঁড়ালো ব'লে। কিন্তু কেন এ ওর সহায় হয় ও এর বাধা হয়—কোন সংস্কারের দরুণ—এসব হ'ল আসলে হাবিজাবি প্রশ্ন—যার উত্তর পাওয়া না পাওয়ার উপর তোমার সাধনার সিদ্ধি নির্ভর করে না। তাছাড়া নিজের পথ চিনলে তবেই দেখতে পাওয়া যায় কার কি পথ। একটা কথা ভুলো না যে, সংশয়ের আঁধার না কাটলে দেখতে পাওয়া যায় না কিসে কী হয়—কেন না এক : জ্ঞানের জ্যোতি আসে উপলব্ধির পথে ; দুই : উপলব্ধি স্থায়ী হয় না সংশয়ের মেরুদণ্ড না ভাঙলে ; তিন : উপলব্ধি স্থায়ী না হ'লেও গুরুর বরে-পাওয়া আত্মজ্ঞানের দিব্য দৃষ্টি ফোটে না, বুঝলে ? যাও নিজের চরকায় তেল দাও—তাতে তেলেরও সদ্ব্যবহার হবে, চরকারও স্বাস্থ্যরক্ষা হবে, সুতোও বেরুবে ভালো ”

তেইশ

এবার ফিরে আসি হারাণো খেই ধরতে (বললেন মোহন মহারাজ) বলি সরলার কথা।

সরলাকে দেখেই নলিনী যেন হাতে চাঁদ পেল। এমন মেয়ে সে কবে দেখেছে ? যেমন শ্রী তেমনি বুদ্ধি—আর সবার উপর কী নির্মল স্বভাব—সহজ বিশ্বাস ! সরলা ছিল একটু চাপা মেয়ে। কিন্তু যেমন প্রাণেই প্রাণ জাগে তেমনি স্নেহের ছোঁয়াচে জাগে স্নেহ। তাই ক্রমশ সেও নলিনীকে ভালোবেসে ফেলল। তারপর কি আর রক্ষে আছে ? নলিনী গলগল ক'রে সরলাকে ব'লে ফেলল—যা কাউকে বলতে পারে নি : অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের কথা যার ফলে ওদের সাধনার পথ খুলে গেছে যেন জাদুমন্ত্রে—বলল নলিনী হেসে কেঁদে :

"দিদি, কত জন্মের সুকৃতির ফলে যে আমি এখানে ঠাঁই পেয়েছি —পর পর পেয়েছি চার চারটি বর : এমন স্বামী, এমন গুরু এমন ইষ্ট—আর এমন সখী—গুরু বোন। কেমন করে এ অসম্ভব সম্ভব হ'ল—সত্যিই ভেবে পাই না। প্রথম দেখ : বিলাসের মধ্যে আমি মানুষ। কিন্তু কেন ভালবাসলাম এক নিঃস্বকে যে ছিল আবার বাবার মাইনে করা কর্মচারী—আমার প্রাইভেট টিউটর তারপর এল হরিষে বিষাদ! বিয়ের পরেই বাবার শাপ। কিন্তু তার পরের লাভটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় অঘটন : এই শাপের মধ্যে দিয়েই দেবতার বরলাভ শুধু সংসারের হাজারো বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া নয়, এমন গুরুর পুণ্য আশ্রমে ঠাঁই পাওয়া যাঁর ছোঁওয়ায় কাটল আমার রূপের গুমর বিলাসিনীর অভিমান। নৈলে কি পিছু ডাকে কান না দিয়ে চলতে পারতাম অচিন পথে দিদি? আর সবার উপরে দাঁড়িয়ে কে? যা দয়াঘন সাক্ষাৎ সিদ্ধিদাতা। আমরা বাঙালী দিদি। শুধু যে গুরু না পেলে পথ চলতে পারি না তাই নয়, গুরু না পেলে ইষ্টকেও ভালোবাসবার পথ খুঁজে পাই না যেন।"

নলিনীর বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের জোয়ারে স্নান করে সরলার তৃপ্তি হত বৈ কি। কিন্তু সংসারে প্রায়ই আনন্দের ওপিঠে লুকিয়ে থাকে বিষাদ। তাই সরলারও এল নলিনীর ভাষায় 'হরিষে বিষাদ' আলোর পথে মনে আঁধার ঘনিয়ে এলো অজান্তে। কারণ আমার মতন ওরও মনে এই ধারণা ছিল বদ্ধমূল যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধের আমেজ আসতে না আসতে সাধনার হবেই হবে ভরাডুবি। এ নিয়ে ও আগেও বিস্তর মাথা ঘামিয়েছিল, কিন্তু কোনো কূলকিনারা পায় নি। কারণ আমার কাছে গণেশ মন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার পরেও ও কোনোদিনই মনীষীর সোহাগে আদরে গ্লানি বোধ করে নি। ওর সরল মন বরাবরই এই সরল প্রশ্নটির সরল উত্তর চাইত ভগবান স্বামী স্ত্রীকে এত কাছে পৌঁছে দিলেন কেন যদি এ

অন্তরঙ্গতা স্বরূপে অশুচি হবে? সরলা শাস্ত্রে পড়েছিল সাধক সাধিকাদের সাধনায় সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক এই দৈহিক কামনা। কিন্তু মহাসাধকরাও তো জন্মেছেন দৈহিক মিলনের ফলেই। তবে? ঠাকুর কি সত্যি এমনিই খামখেয়ালী যে, তাঁর সৃষ্টিতে এই অদ্ভুত ব্যবস্থা দিলেন যে, যে সম্বন্ধ থেকে আবহমানকাল প্রাণের সৃষ্টি হয়ে এসেছে সেই সম্বন্ধই হল সবচেয়ে অপবিত্র? মাতৃস্নেহ চমৎকার, পিতৃস্নেহ বরণীয়, ভাই বোনকেও ভালোবাসলে বিপদ নেই সাধনার পথে। বাতিল কেবল স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ যাকে দেগে দেওয়া হল এক কুশ্রী নাম দিয়ে কাম বা লালসা। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ কি শুধু কামেরই জয়জয়কার? এত উচ্ছ্বাস এত আদর সোহাগ মন জানাজানির সুষমা সুরভি হিল্লোল কল্লোল এসবকে নিষ্ঠুর হয়ে বিদায় না দিলে ঠাকুর প্রসন্ন হবেন না? ওর মন সব চেয়ে বেশি দুঃখ পেত ভাবতে যে, যে মিলনের ফলে শুচি শুভ্র শিশুর জন্ম সম্ভব হয়, যে শিশুর গুণগানে সাধুসন্তরা সবাই মাতোয়ারা (খ্রীষ্ট এমন কথাও বলেছেন যে শিশুরাই হল স্বর্গের বাসিন্দা) সেই শিশুর জন্মের যে একটি মাত্র রাজপথ আছে তাকে বিপথ বলে বর্জন না করলে শিশুর আদিম বরদাতা অপ্রসন্ন হয়ে দূরে সরে যাবেনই যাবেন। প্রাণের গর্ভাধানকে বাতিল করলে তবেই প্রাণদাতাকে বরণ করা সম্ভব হবে—এই-ই কি জ্ঞানের শিখরতত্ত্ব যার আলোয় যুগে যুগে মহাসাধকরা পরম পথ দেখতে পেয়েছেন ভক্তির মুক্তির জ্ঞানের? ওর মনে সংশয় ঘনিয়ে উঠত আরো এই জন্যে যে, ও নিজের মনকে মিলনলগ্নে বারবার যাচিয়ে একই উত্তর পেয়েছিল যে, প্রেমের আত্মদান অশুচি নয়—যেখানে কেবল শয়তানেরই দেখা মিলতে পারে, ভগবানের নয়। যদি এই কথাই অন্তিম সত্য হত তাহলে স্বামীকে গভীরভাবে ভালোবাসা সত্ত্বেও কেন ওর অবনতি হল না?—কেন ওর আসক্তির অন্দরমহলেই ভক্তি এসে বসালো তার রাজধানী? কেমন করে ও পেল শরণ্য গুরুর শরণ, বরেণ্য

ইষ্টের চরণ ? আমাকে ও এ নিয়ে দু একবার প্রশ্ন করেছিল বিষণ্ণ সুরে। কিন্তু আমার নিজের মনে দ্বিধা ছিল বলে আমি এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলাম : "এ সব প্রশ্ন নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ো না। ঠাকুরকে ডাকো। দরকার হলে তিনিই বুঝিয়ে দেবেন কিসে কী হয়।" ও একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বৈ কি, কিন্তু সেই সঙ্গে গভীর স্বস্তিও পেয়েছিল, কারণ ওর বিষম ভয় ছিল—পাছে আমি ওকে সাফ বলে দিই যে, পূর্ণ ব্রহ্মচর্যব্রত না নিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। ভয় আরো এই জন্যে যে, যদি আমি ওকে এই কথাই বলি, তবে তারপরেও তো আর দুনৌকোয় পা দিয়ে অকূলে পাড়ি দেওয়া চলবে না—মন স্থির করতেই হবে ও সাধনা চায়, না সংসার। তাই শেষে যেদিন মনীষী ওর বিগ্রহ ছিনিয়ে গেল সেদিন ঠাকুরের অপমানে ও দুঃখ পেলেও তারি মধ্যে দিয়ে অনৈশ্চিত্যের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল বলে একটু আরামও পেয়েছিল (এমনি অসঙ্গতিতে ভরা আমাদের মন !) বলেছিল আমাকে চোখের জলে বটে, কিন্তু বড় গলা করেই যে, ও উত্তর পেয়েছে ওর প্রশ্নের : এমন দুরাচার স্বামীকে ওর ছাড়তেই হবে গুরুপদে আশ্রয় নিতেও বটে, ইষ্টের পূজায় ঐকান্তিক হতেও বটে।

কিন্তু মুখে বললে হবে কি ? স্বামী যে স্বভাবে দুরাচার ছিল না, নিষ্ঠুর হয়েছে কত দুঃখে তাও তো ওর অজানা ছিল না। স্বভাবে ছিল ও সত্যনিষ্ঠ, তাই বড় কেঁদেই ঠাকুরকে ডেকেছিল পণ নেওয়ার পরেও : "ঠাকুর, ওকে যদি ছাড়তেই হয় ছাড়ব, কিন্তু যা সত্য নয় তাকে সত্য বলে রটিয়ে ছাড়তে হলে তো সেটা মিথ্যাচারই হবে। ওতো আসলে দুরাচার কি অমানুষ নয়। পাকেচক্রে পড়েই আজ এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তো ওকে বাইরে ছাড়ব বললেই মনকে ওর চিন্তা থেকে গুটিয়ে নিতে পারছি না—বলতে পারছি না মন মুখ এক করে যে, আমাদের ভালোবাসার মধ্যে ষোলো আনাই ছিল ফাঁকি। কত আনন্দ যে পেয়েছি ওর স্নেহে, সেবায়, আদরে,

সোহাগে—সব ভুলব কেমন করে ওর একটিমাত্র অপরাধে, হোক না সে অপরাধ সাংঘাতিক, জঘন্য ?"

কিন্তু সময়ের এমনি গুণ যে কোনো কিছুই একভাবে থাকে না। তাই নাসিকে এসে সাধনায় বসার পরে ওর ধ্যানের পটে প্রিয় স্বামীর স্মৃতির উজ্জ্বলতাও ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হ'য়ে এলো। প্রেম যতই গভীর হোক না কেন, ইন্ধনের অপেক্ষা রাখে তো। কাজেই খোরাক না পেয়ে ওর আসক্তির শিখার তাপ একটু একটু করে কমে এলো, শুরু হল ঠাকুরের নানা লীলাখেলা, দেখল কত কী করুণার অঘটন। ফলে ফের উজিয়ে উঠল ওর মন। থেকে থেকে মনীষীর মনস্তাপ বা বিরহ বেদনার কথা ভেবে যে দুঃখ কখনই আসত না এমন নয়, কিন্তু সে দুঃখ ওকে আর তেমন পেয়ে বসত না। দেখেশুনে ও স্থির করল : ওর প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে। যা যাবার তাকে যখন ধরে রাখা যাবেই না, তখন কেন মিথ্যে মিথ্যে তার জন্যে মন খারাপ করা ? গুরুদেব ভুল বলেন নি—গীতার কথাই ঠিক, ভবিষ্যতকে নিয়ে খেদ করে লাভ কি ?—অপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।

কিন্তু ওমা ! নাসিকে এসে কয়েকমাস সাধনার পরে যে নলিনী ওকে প্রথম দিকে এত বল দিয়েছিল সেই কিনা শেষে ওকে ফেলল পাকে ! ও ধরে নিয়েছিল নলিনী ও মধু পূর্ণ ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়েছে নৈলে আশ্রমে ঠাঁই পেত না কখনই। কিন্তু যেদিন নলিনী ওকে প্রথম সব কথা খুলে বলল সেদিন ওর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সব ঘুলিয়ে গেল। তাহলে সত্য কী ? পূর্ণ ব্রহ্মচর্য, না স্বামী সহবাসের পথেই সিদ্ধি ? অবশ্য একথা ঠিক যে, মধু ও নলিনীর ক্ষেত্রে দুজনেই সাধনার পথে চলেছে গুরুবরণ করে, দীক্ষা নিয়ে তবে। কিন্তু মনীষীও যে একদিন সাধনা নেবে না এমন কথা কে বলতে পারে জোর করে ? ওর মনে হল সমাধান ঐ পথেই— মনীষীর রূপান্তর। তাহ স্বামীকে মন থেকে তাড়িয়ে না দিয়ে তার জন্যে প্রার্থনা করাই কি ওর কর্তব্য নয়—যাতে সে ফেরে দেবদ্রোহিতা

ছেড়ে শরণাগতির দিকে ? ওর মন ফের দুলে উঠল দোটানায়। অশান্তি এল ঘনিয়ে।

শেষে ও শুরু করল প্রার্থনা মনীষীর জন্যে। কিন্তু হা অদৃষ্ট! নিয়তি যে বিমুখ। মা থেকে থেকে চিঠি লিখতেন হা হুতাশ করে মনীষী ধাপে ধাপে নেমে চলেছে অসংযমের ঢালু পথে। মদ, রেস খেলা, তাস হররা, ক্লাবে নাচানাচি—কী নয় ? সময়ে সময়ে মাতাল হয়ে ফেরে রাত দুপুর পেরিয়ে। কথায় কথায়—চাকর বাকরকে অকথ্য গাল দেয়। মেজাজ তো নয়—যেন ছাই-চাপা আগুন—একটুতেই জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। আমাকে মা বার বার লিখতেন গণপতির মন্দিরে ওর জন্যে প্রার্থনা করতে। এমন হীরের টুকরো ছেলে চোখের সামনে ছন্নছাড়া হতে চলেছে—এ কি চোখে দেখা যায় ? দুঃখে জ্বলে পুড়ে চলে আসতে চাইতেন। কিন্তু মনীষী আর সবাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলেও তাঁকে ভালোবাসত আগের মতনই। বলত, সময়ে সময়ে চোখের জলে: "আর কেন ঠাকুমা ? সবাই যাকে ছেড়ে গেছে মাতাল বলে, পাপী বলে—তুমি ধার্মিক হয়েও কেন আজও তার পাশে দাঁড়িয়ে আছ ? ভবিতব্যকে কি কাটা যায় আকুলি বিকুলি করে ? তাই যাও তুমিও—ষোলোকলা সম্পূর্ণ হোক তোমার ধর্ম সাধনার।"

মা এসব লিখতে লিখতে চোখের জলে চিঠির কাগজ ভিজিয়ে ফেলতেন। সরলা সে চিহ্ন ধরতে পেরে ডবল চোখের জল ফেলত ফের সেই চিঠির উপরেই। কিন্তু গোপনে। আমি ধরতে পারতাম ভিজে চিঠি দেখে। স্বভাবে ও সংযমী মেয়ে। তাই কাউকেই কিছু বলত না। নলিনীকেও নয়। কেবল সময়ে সময়ে অসহ্য হলে রাতে একলা আমার কাছেই চুপি চুপি এসে আমার পায়ে মাথা রেখে কাঁদত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। শেষে একদিন মুখ ফুটে প্রশ্ন করেছিল থাকতে না পেরে: 'নলিনী ভাগ্যবতী গুরুদেব। কিন্তু আমি কেন আপনার মতন গুরুর কৃপা ও ঠাকুরের মতন ইষ্টের প্রসাদ পেয়েও রয়ে গেলাম অপয়া ?'

আমি বললাম ওর মাথায় হাত রেখে : "ছি মা অমন কথা বলে ? তোমার মতন মেয়ে"—ও দুহাতে মুখ ঢেকে বলল : "বলবেন না গুরুদেব, বলবেন না। ও ঢের শুনেছি। আমি যদি অপয়া না হই তো অপয়া কার নাম শুনি ? শুধু গুণবান স্বামীকে ছাড়াই তো নয়—আমিই যে হলাম তাঁর কাল। অথচ···অথচ···গুরুদেব··· আমি কী করতে পারতাম যা করি নি—বলুন তো ? ওখানে থাকতে পারি নি ? কিন্তু কেন পারি নি আর কেউ না জানে আপনি তো জানেন। শুধু আমার ঠাকুরের অমর্যাদার জন্যেই নয়—মনুষ্যত্বের অপমানের জন্যেও তো বটে। আমি ওর স্ত্রী এর চেয়েও বড় কথা— আমি মানুষ, নয় কি ?"

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না সত্যিই। কারণ আমার নিজের মনের মধ্যে আঁধারে আমিও হাৎড়ে বেড়াতাম শুধু এই প্রশ্নের নয় আরো একটি প্রশ্নের উত্তর "কেন নলিনীও ওর সাধনার সহায় হতে এসে হয়ে দাঁড়াল বাধা ? সরলা তো সুখে দুঃখে সাধনার দিকে এগিয়েই চলেছিল—খতিয়ে। এমনি সময়ে কেন নলিনী ওকে সব কথা বলতে গেল যার ফলে ওর মন কালো হয়ে গেছে সংশয়ে। আর এমন মেয়ের মনে সংশয় বাসা বাঁধতে পারলই বা কেমন করে যার বিশ্বাস কোনোদিনই টলে নি ? এই সংশয়ের ফেরে পড়েই তো ওর আজ এতো মনঃকষ্ট—দর্শন ভাব আবেগ সব উবে গেছে—উজিয়ে উঠেছে ফের সেই স্বামীর প্রতি টান, যে স্বামীকে শ্রদ্ধা করা ওর পক্ষে অসম্ভব ? তবু এ কী ভালোবাসা ? শ্রদ্ধার ভিৎ টললে কি প্রেম দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ? কে জানে ? আমার নিজেরও কেমন যেন ধাঁধা লাগত—তা ওকে নির্দেশ দেব কি ? গুরুর মত গুরু বটে !

কিন্তু নিজের সংশয় না হোক, দরদী দুঃখের মধ্যে দিয়েই একটু একটু করে আলো পেতে শুরু করলাম। ডায়রিতে লিখে রাখতাম নানা গুরুবাণী। ফের পড়া শুরু করলাম—। হঠাৎ একদিনের ডায়েরি পড়তেই চমকে উঠলাম।

গুরুদেব বলছেন ঃ

"বাবা, যারা দেখবে তর তর করে চলেছে সাধনপথে, ভাবছে সাধনা কঠিন কে বলে? কেনই বা এত ওঠাপড়া, কান্নাকাটি, ডাকাডাকি সাধাসাধি? নাম করলেই তো নামী মূর্তি ধরেন—ধ্যানে বসলেই তো ধ্যানের ধন হাজিরি দেয়—প্রার্থনা করলেই মেলে সাড়া—এই ধরনের ভাববিলাসে যারা চলে উচ্ছ্বাসের পাল তুলে, তারা না পায় সংসারের সুখ, না সাধনায় সিদ্ধি। নলিনী মধু চন্দুলালের দৃষ্টান্তই নাও না! ওদের পদে পদে কত রকম বাধা এসেছে ভাবো তো? এই সেদিন নলিনীর বাবা মারা গেলেন। মধুর মামার চিঠি পেয়ে ও ছুটে রাঁচি চলে গেল। কিন্তু দরোয়ান ধূলোপায়েই বিদায় দিল। বলল 'হুকুম নেহি।' ও মার সঙ্গে দেখা করতে চাইল কিন্তু তিনিও দেখা করলেন না, লিখে পাঠালেন ঃ 'তোর জন্যেই মনঃকষ্টে রক্তের চাপ বেড়ে ওঁর অকালমৃত্যু হয়েছে। তোর মত অলক্ষ্মীর আমি মুখ দর্শনও করতে চাই না।' ভাবতে পারো এ দুঃখ? কিন্তু তবু বলব ওর দরকার ছিল এ ঘা খাওয়ার। ও বড় বেশি উচ্ছ্বাসী। ভাব ভালো কিন্তু ভাবের বিলাস ভালো নয়। প্রেম ভালো কিন্তু উচ্ছ্বাস তো প্রেমের রস নয় বাবা, ফেনা, তাই তো প্রাণকে রসিয়ে তুলতে গিয়ে কেবল ফেনিয়েই তোলে তৃষ্ণার জলকে।"

আমি বললাম ঃ "সবই তো বুঝলাম গুরুদেব, কিন্তু যদি শেষরক্ষা না হয়?"

গুরুদেব বললেন ঃ "শেষরক্ষা কার—আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো? অজ্ঞানের চোখ যে পরিণতিকে মনে করে সফলতা, জ্ঞানীর চোখ কি তাকে সর্বনাশা দেখে না? বাইরের জাঁকজমক কি অন্তরের শূন্যতাকে অবসাদকে আরো গাঢ় করে ধরে না? হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর ঘোর তপস্যা ক'রে বিষ্ণুর দেখা পেয়ে বর চাইল ঃ "কোনো প্রাণীই যেন তাকে বধ করতে না পারে—জলে স্থলে। তাহলে

আমি বললাম ওর মাথায় হাত রেখে : "ছি মা অমন কথা বলে ? তোমার মতন মেয়ে"—ও দুহাতে মুখ ঢেকে বলল : "বলবেন না গুরুদেব, বলবেন না। ও ঢের শুনেছি। আমি যদি অপয়া না হই তো অপয়া কার নাম শুনি ? শুধু গুণবান স্বামীকে ছাড়াই তো নয়—আমিই যে হলাম তাঁর কাল। অথচ···অথচ···গুরুদেব··· আমি কী করতে পারতাম যা করি নি—বলুন তো ? ওখানে থাকতে পারি নি ? কিন্তু কেন পারি নি আর কেউ না জানে আপনি তো জানেন। শুধু আমার ঠাকুরের অমর্যাদার জন্যেই নয়—মনুষ্যত্বের অপমানের জন্যেও তো বটে। আমি ওর স্ত্রী এর চেয়েও বড় কথা— আমি মানুষ, নয় কি ?"

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না সত্যিই। কারণ আমার নিজের মনের মধ্যে আঁধারে আমিও হাৎড়ে বেড়াতাম শুধু এই প্রশ্নের নয় আরো একটি প্রশ্নের উত্তর "কেন নলিনীও ওর সাধনার সহায় হতে এসে হয়ে দাঁড়াল বাধা ? সরলা তো সুখে দুঃখে সাধনার দিকে এগিয়েই চলেছিল—খতিয়ে। এমনি সময়ে কেন নলিনী ওকে সব কথা বলতে গেল যার ফলে ওর মন কালো হয়ে গেছে সংশয়ে। আর এমন মেয়ের মনে সংশয় বাসা বাঁধতে পারলই বা কেমন করে যার বিশ্বাস কোনোদিনই টলে নি ? এই সংশয়ের ফেরে পড়েই তো ওর আজ এতো মনঃকষ্ট—দর্শন ভাব আবেগ সব উবে গেছে—উজিয়ে উঠেছে ফের সেই স্বামীর প্রতি টান, যে স্বামীকে শ্রদ্ধা করা ওর পক্ষে অসম্ভব ? তবু এ কী ভালোবাসা ? শ্রদ্ধার ভিৎ টললে কি প্রেম দাঁড়িয়ে থাকতে পারে ? কে জানে ? আমার নিজেরও কেমন যেন ধাঁধা লাগত—তা ওকে নির্দেশ দেব কি ? গুরুর মত গুরু বটে !

কিন্তু নিজের সংশয় না হোক, দরদী দুঃখের মধ্যে দিয়েই একটু একটু করে আলো পেতে শুরু করলাম। ডায়রিতে লিখে রাখতাম নানা গুরুবাণী। ফের পড়া শুরু করলাম—। হঠাৎ একদিনের ডায়েরি পড়তেই চমকে উঠলাম।

গুরুদেব বলছেন :

"বাবা, যারা দেখবে তর তর করে চলেছে সাধনপথে, ভাবছে সাধনা কঠিন কে বলে? কেনই বা এত ওঠাপড়া, কান্নাকাটি, ডাকাডাকি সাধাসাধি? নাম করলেই তো নামী মূর্তি ধরেন—ধ্যানে বসলেই তো ধ্যানের ধন হাজিরি দেয়—প্রার্থনা করলেই মেলে সাড়া—এই ধরনের ভাববিলাসে যারা চলে উচ্ছ্বাসের পাল তুলে, তারা না পায় সংসারের সুখ, না সাধনায় সিদ্ধি। নলিনী মধু চন্দুলালের দৃষ্টান্তই নাও না! ওদের পদে পদে কত রকম বাধা এসেছে ভাবো তো? এই সেদিন নলিনীর বাবা মারা গেলেন। মধুর মামার চিঠি পেয়ে ও ছুটে রাঁচি চলে গেল। কিন্তু দরোয়ান ধূলোপায়েই বিদায় দিল। বলল 'হুকুম নেহি।' ও মার সঙ্গে দেখা করতে চাইল কিন্তু তিনিও দেখা করলেন না, লিখে পাঠালেন : 'তোর জন্যেই মনঃকষ্টে রক্তের চাপ বেড়ে ওঁর অকালমৃত্যু হয়েছে। তোর মত অলক্ষ্মীর আমি মুখ দর্শনও করতে চাই না।' ভাবতে পারো এ দুঃখ? কিন্তু তবু বলব ওর দরকার ছিল এ ঘা খাওয়ার। ও বড় বেশি উচ্ছ্বাসী। ভাব ভালো কিন্তু ভাবের বিলাস ভালো নয়। প্রেম ভালো কিন্তু উচ্ছ্বাস তো প্রেমের রস নয় বাবা, ফেনা, তাই তো প্রাণকে রসিয়ে তুলতে গিয়ে কেবল ফেনিয়েই তোলে তৃষ্ণার জলকে।"

আমি বললাম : "সবই তো বুঝলাম গুরুদেব, কিন্তু যদি শেষরক্ষা না হয়?"

গুরুদেব বললেন : "শেষরক্ষা কার—আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো? অজ্ঞানের চোখ যে পরিণতিকে মনে করে সফলতা, জ্ঞানীর চোখ কি তাকে সর্বনাশা দেখে না? বাইরের জাঁকজমক কি অন্তরের শূন্যতাকে অবসাদকে আরো গাঢ় করে ধরে না? হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর ঘোর তপস্যা ক'রে বিষ্ণুর দেখা পেয়ে বর চাইল : "কোনো প্রাণীই যেন তাকে বধ করতে না পারে—জলে স্থলে। তাহলে

আমার ত্রিলোকপতির পদটা থাকবে অক্ষুণ্ণ।" আচ্ছা। কিন্তু তারই ছেলে অসুর বাপের হাতে অশেষ যন্ত্রণা স'য়েও শেষে জলে ডুববার মুখে বিষ্ণুর দেখা পেয়ে প্রার্থনা করল—কী? —না,

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী
ত্বামনুস্মরতঃসা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু

অর্থাৎ বিষয়ীরা বিষয়কে যেমন ঐকান্তিক ভালোবাসে তোমার ধ্যানরূপে আমার হৃদয় তেমনি ঐকান্তিক হোক। এখানে কার শেষরক্ষা হল বলবে আমাকে—ত্রিলোকপতি পিতার না মজ্জমান পুত্রের? না বাবা, শেষরক্ষা হয় লুব্ধ মুগ্ধদের নয়—যারা সোনার হরিণ চায়—হয় কেবল তার, যে বলতে পারে মনে প্রাণে যে সে ভগবান ছাড়া আর কিছু চায় না—না সংসারী ফুলশয্যা, না কল্পনার ভাবোচ্ছ্বাস। ফুলবিলাস ভাবোচ্ছ্বাসে কিছুই মেলে না এমন কথা বলব না। তবে কখন মেলে কবে মেলে কার মেলে আর পাওয়ার পথে কবে হানা দেয় শূন্যতা—রসের প্রবাহে কখন বাঁধ এসে সব আনন্দের প্রেমকে দমিয়ে দেয়—আলো কেন হঠাৎ আঁধারের খড্ডায় ডুব মারে—ভেবে কেউ কোনোদিন তল পায় নি ভেবে পাওয়া যায় না বলেই। কেবল একটি কথা অকাট্য: সাধনা কখনই একটানা অগ্রগতির পথে যায় না। আলোর পরে অন্ধকার, তার পরে আবার আরো আলো, তারপরেই ফের আরো অন্ধকার, তার পরে আরো দীপ্ত আলোয় নবদিশা পাওয়া—এই ভাবেই চিরদিন সব সাধক সাধিকার সাধনা পথ কেটে চলেছে। সাধনা করতে করতে যাকে কখনই হাঁপাতে কি পোড় খেতে হয় নি, উষার পথে নিশার দেখা পেয়ে হতাশ হতে হয় নি—জেনো সে সাধনার পথে আদৌ চলেই নি —চলেছে আর কোনো পথে, কেবল ভেবেছে এরই নাম সাধনা। এ জীবন বাবা ওঠাপড়ার পথ—একটানা উচ্ছলতার বা অবাধ মিলনের পথ নয় নয় নয়। যে বলে সে বরাবর একটানা আরামের পথে চলেছে, জানবে সে উপরে উঠছে না বলেই তার হাঁপ লাগছে

না। শরণাগতি একদিনে আসে না বাবা, অনেক পোড় না খেলে বিষয়াসক্তির মোড় ফেরে না ভগবানের দিকে, আর তাঁর দিকে মনের মোড় না ফিরলে শেষরক্ষা হয় না বলেই উপনিষদে বলেছে: 'ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ—অর্থাৎ তাঁকে এ জীবনে জানতে না পারলে সর্বনাশ। আমাদের তন্ত্রে আরো জোর দিয়েছে এ-সর্বনাশের সর্বলাভ হয়ে দাঁড়ানোর অঘটনের উপরে। বলেছে: ভগবানকে সত্যি চাইলে 'ভোগো যোগায়তে'—কিনা ভোগ হয়ে দাঁড়ায় যোগ—পয়লা নম্বর। দোসরা—'দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে' অর্থাৎ কুকর্মও হয়ে ওঠে সুকর্ম, তেসরা 'মোক্ষায়তে চ সংসারঃ—মানে, সংসার বন্ধন না হয়ে মোক্ষসাধনার মণিপীঠে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এ-অঘটন ঘটে কখন? না, যখন সব ছেড়ে তাঁর শরণ চাই। তাই জ্ঞান ভক্তি কর্ম—সব যোগেরই সমাপ্তি এই পরম শরণাগতিতে—আত্মসমর্পণে। এরই নাম শেষরক্ষা, বুঝলে বাবা?"

চব্বিশ

সরলার কথা ভেবে মন খারাপ হলে ডায়রিতে টোকা গুরুদেবের এই ধরনের নানা উপদেশ পড়ে প্রাণপণে জপ করতাম: সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা: যেন সরলাও চায় শুধু শরণাগতি। তা হলে হবে ওর শেষরক্ষা, পাবে সব প্রশ্নের উত্তর। ও আমার কাছে কান্নাকাটি করলে ওকে আমার ডায়রি পড়ে শোনাতাম। ফলে তখনকার মত ওর বিষাদ কেটে যেত বটে, কিন্তু আবার মন ছেয়ে যেত অবসাদে, ব্যথায়—মার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

শেষে আমি ওকে বললাম: "এ দুনৌকোয় পা দিয়ে চললে চলবে না সরলা! সংশয়কে আসন দিলে চন্দুলালের মতন ভুগবে।

কারণ কোনো প্রশ্নের পুরোপুরি সন্তোষজনক জবাব পেলে তবেই গুরুবাক্য মানব নৈলে নয়, এ ধরনের দাবিও খতিয়ে বুদ্ধির দাবি, বিশ্বাস বা নির্ভয়ের ছন্দের সঙ্গে এর মিল নেই, তাই শরণাগতির সাধনায় এ শর্তের কোনো স্থানই থাকতে পারে না। সাধকের সাজে না দরদস্তুর করা। তার শুধু এক মন্ত্রঃ তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, বুঝলে মা ?"

ও সুবুদ্ধি মেয়ে তো, বুঝল। বিশেষ চন্দুলালের দৃষ্টান্ত তুলতে। বলল ঃ "না গুরুদেব, অত ভুগে মরার মুখে বাঁচতে চাই না। আমি শুনব আপনার কথা, করব যা বলবেন।"

মনের জোর ছিল ওর অসামান্য। মার চিঠি এলে আর পড়ত না। আমিও ওর কাছে মা বা মনীষীর আর নামও করতাম না। ও দিনরাত ধ্যান জপ সাধনায় ও গুরুসেবায় মন দিল।

ফলে ক্রমশঃ ওর মনে যেন প্রার্থনার ভাব গাঢ় হয়ে উঠল শনৈঃ শনৈঃ। তখন ওকে একদিন বললাম ওর ঘরে ঠাকুরের একটি নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে। এদেশে চমৎকার চমৎকার গণেশ মূর্তি হয়। ঘরে ঘরে গণেশের পূজা হয় গণেশ চতুর্থীতে। ওকে বললাম একটি নিখুঁৎ মাটির গণেশ দেখে এসেছি এক দোকানে। আনি কিনে ? ও রাজী হল না। বলল ঃ "না গুরুদেব, আমি স্বপ্নে পেয়েছি—আমার নিত্যপূজার বিগ্রহটি আমার কাছে ফিরে আসবেই আসবে।" বলতে কি, এই স্বপন দেখার পর থেকেই ওর সাধনার জীবনের শুধু যে এক নব পর্ব শুরু হল তাই নয়, ওর যেন একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল—জয় ঠাকুর !

কিন্তু বাধা কাটিয়ে উঠলে হবে কি, ঠাকুরের বিচিত্র লীলা !—তিনি শিষ্যাকে উঠিয়ে গুরুকে করলেন পাড়ু অর্থাৎ এবার আমিই পড়লাম সংশয়ের ফেরে।

আমি এটুকু জানতাম অবশ্য যে, ঠাকুর সব পারেন। তিনি যে অঘটন ঘটানোর রাজা এও তো বারবারই স্বচক্ষে দেখেছিলাম—

চন্দুলালের ভাষায়—অঘটনের শোভাযাত্রায়। তাই না তাঁর উপাধি দুটি—বিঘ্নহন্তা ও সিদ্ধিদাতা। কিন্তু এক্ষেত্রে সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙিয়ে কেমন করে তাঁর বিগ্রহ নাসিকে সরলার বেদীতে এসে হাজির হবে ভেবে পেলাম না। শেষে একদিন ওকে বলে ফেললাম একথা। ঈষৎ সলজ্জেই বললাম : "মা, তোমাকে ধমকাচ্ছিলাম সংশয়কে পোষার জন্যে। কিন্তু এবার আমিই পড়েছি সংশয়ে। কেমন করে ঠাকুর লণ্ডন থেকে এখানে উড়ে আসবেন কার পাখায় —ঠাহর পাচ্ছি না।" ও বলল একগাল হেসে : "কেমন হয়েছে। শোধবোধ। এবার আমার ধমক খেতে হবে। খবর্দার, সাধনায় সংশয়কে আমল দিলে হবে চন্দুলালের অবস্থা, মনে রাখবেন।" বলেই হাততালি!

হেসে বললাম : "শোধবোধ? তাহলে গড় করি—ধমক খেয়ে —পার্ট যখন উল্টে গেছে?"

ও জিভ কেটে বলল : "ছি ছি! এমন কথা বলে। আপনি যে কী!" বলেই টিপ করে প্রণাম।

পঁচিশ

মোহন মহারাজ বললেন :

এবার শুরু করি সিন্ধুলঙ্ঘন কাণ্ড—তবে হনুমানের নয়, গণেশ-দেবের। সংক্ষেপেই বলব।

লণ্ডনে আমার পাঞ্জাবী বন্ধু সত্যপাল ডাক্তারি করছেন আজ দশ পনেরো বৎসর। তার মেমবউ রবার্ট সাহেবের বোন—নাম ক্লারা।

সরলার স্বপ্ন দেখার মাস দুই পরে আমি হঠাৎ এক মস্ত চিঠি পেলাম—ক্লারার, মনীষাকে লেখা। মা সেটি আমাকে পাঠিয়েছিলেন তৃপ্তিপুর থেকে মনীষার অনুমতি নিয়ে। তার সারমর্ম এই :—

রবার্ট সাহেবের বন্ধুরা সবাই গণেশঠাকুরকে দেখে তো হেসে কুটি কুটি। বলাবলি করেঃ "এ কেবল প্রিমিটিভ বার্বেরিয়ানরাই পারে"—অর্থাৎ হিন্দুরা, বলাই বাহুল্য। ওদিকে তাঁর এঞ্জেলা বিবির সখীরা হেসে গড়িয়ে পড়ে, "এই রিডিকুলাস ফিগারকে কি না পূজো।" সাহেবেরা রায় দেয়ঃ grotesque মেমরা—fantastic! এরা হাসে guffow—হো হো হো! ওরা করে giggle—খিল্ খিল্ খিল্।

অথ, শনৈঃ শনৈঃ হাসি পেছুতে থাকে, কান্না আসে এগিয়ে। হল কি, প্রথমে গণেশঠাকুর ঢুঁ মারলেন রবার্ট সাহেবের স্বপ্নে। দিনের পর দিন তাঁর ঐ এককথাঃ "আমাকে যেখান থেকে এনেছ সেখানে ফেরত পাঠিয়ে দাও, নৈলে ভালো হবে না বলছি।"

শুনে এঞ্জেলা বিবি তো হেসেই অস্থির! কিন্তু হাসি ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসে যখন রাতের পর রাত ঐ মূর্তি স্বপ্নে এসে ঐ একই ভয় দেখাতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে রবার্ট সাহেবের শুরু হল অনিদ্রা। ক্রমশঃ নার্ভাস চঞ্চলতা, অগ্নিমান্দ্য—এইসব উপসর্গও এসে জুটল। শেষে তিনি লজ্জার মাথা খেয়ে বেপরোয়া বিবিকে বললেন মূর্তিটি প্যাক করে তৃপ্তিপুরে মনীষীকে পাঠিয়ে দিতে।

বিবি একে মেম তার উপর বিদুষী, সায়েন্সের ডিগ্রি। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে হেসে স্বামীকে ধিক্কার দিলেন যথারীতি 'কাওয়ার্ড' বলে। সাহেব করুণ হেসে বললেনঃ "The wearer knows where the shoe pinches, darling!"

বিদুষী বিবি একগাল হেসে বললেনঃ "ননসেন্স! আমার পাদুকা বৈজ্ঞানিক—দুর্ভেদ্য। আমি হাতছাড়া করতে পারব না এহেন মূর্তি। উঃ! মন খারাপ হলেও যাকে দেখলেই হাসি আসে—মন ভালো হয়ে যায়! How priceless!"

করুণ হেসে সাহেব বললেনঃ "তবে তোমার ঘরেই রাখো এ-অমূল্য নিধিকে। আমি এতে নেই কিন্তু—বলে রাখছি।" এই হল প্রথম অঙ্ক।

বিদুষী বিবি হেসে বললেন: তথাস্তু, আমার সখীরা আরো খুশী হবে এ-চীজটিকে নিয়ে নিরালায় হাসতে।"

এর পরে—দ্বিতীয় অঙ্কে—গণেশঠাকুর শুরু করলেন বিদুষী বিবির স্বপ্নে উঁকি মারতে। সেই একই কথা: "আমাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দাও। না দিলে তোমার অমঙ্গল হবে।"

দিন পনেরোর মধ্যে বিদুষী বিবিরও শুরু হল সাহেবের মত অনিদ্রা। ঘুমোতে ভয় করে, গণেশঠাকুর আসেন পেল্লায় মূর্তি ধরে—ছাদে মাথা ঠেকে! তার পরেই অন্ত্রে বেদনা। অগ্নিমান্দ্য। জ্বরভাব। তিনি মুখে কবুল না করলেও ভিতরে ভিতরে বিষম ভড়কে গেলেন। সোজা ক্লারার কাছে গিয়ে চুপি চুপি সব বললেন। ক্লারা দিদিকে বলল, বিগ্রহটি তৃপ্তিপুরে ফেরত পাঠিয়ে দিতে। দিদি ফিশফিশিয়ে বললেন: "তথাস্তু। কিন্তু এ ভার তোকেই নিতে হবে—আমি আর ওঁর ধার পাশ দিয়েও যাচ্ছি না।"

রবার্ট সাহেব শুনে একগাল হেসে বললেন: "কী ডার্লিং? তোমার বৈজ্ঞানিক পাদুকায়ও কাঁটা এল কোত্থেকে?"

এঞ্জেলা বিবির বালিশে মুখ ডুবিয়ে কী কান্না! "যাও, তুমি হৃদয়হীন···আমি পেটের বেদনায় মরতে বসেছি···" ইত্যাদি।

অগত্যা ক্লারা মরন্ত বোনকে বাঁচাতে গ্লাভ পরে গণেশঠাকুরকে ধরে সন্তর্পণে প্যাক করে ফেরত পাঠালো মনীষীর কাছে এক দীর্ঘ পত্রে সব কথা জানিয়ে। অথ তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

মনীষী তো সত্যপালের চিঠি পেয়ে একেবারে থ! এ কী কাণ্ড! গণেশঠাকুরকে নিয়ে সে তো নিজেও কতবারই বন্ধুমহলে হাসাহাসি করেছে—কই, কিছুই তো হয় নি!

শুনে মা এগিয়ে এলেন খুশী হয়ে। বললেন: "এবার ঠাকুরকে ফিরিয়ে দে, মণি, তাহলেই আবার পাবি তাঁর আশীর্বাদ সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মনীষী ছিল বিষম অভিমানী ও বদরাগী। বলল: "ফিরিয়ে

দেব? কক্ষনো না। সরলা আগে আসুক ফিরে, তবে সন্ধি হবে, নৈলে নয়।”

মা ওকে অনেক তুতিয়েপাতিয়ে বললেন: “অন্ততঃ সরলাকে এ-চিঠিটা পাঠিয়ে দে। সে হয়ত ফিরে আসবে বিগ্রহ ফিরে এসেছে শুনলে।”

মনীষী বলল: “চিঠি পাঠাতে হয় তুমি পাঠাও। কিন্তু খবর্দার, লিখো না বিগ্রহ আমি ফেরত দেব। সরলা না এলে আমি এ বিগ্রহ ফেলে দেবই দেব গঙ্গাজলে। লিখে দাও তাকে।”

মা এ চিঠিটি আমাকে পাঠিয়ে লিখলেন সরলাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তৃপ্তিপুরে পাঠাতে—বিগ্রহ যখন এসেছে তখন কেন আর মিথ্যে মিথ্যে তুপক্ষেরই কষ্ট পাওয়া?

চিঠি পেয়ে সরলা আনন্দে আত্মহারা হয়ে মনীষীকে লিখল: “ঠাকুর তোমাকে ক্ষমা করবেনই করবেন যদি বিগ্রহটি তুমি আমাকে পত্রপাঠ ফেরত দাও, আর গুরুদেবের কাছে ক্ষমা চাও।”

আমাকে না জানিয়ে এই চিঠিটি লেখার ফলেই ফের বাধল কুরুক্ষেত্র, জাগন্ত উষার পথে নেমে এল আবার নিশুতি রাত। মনীষী আগুন হয়ে লিখল সরলাকে: “তোমার যে গুরুর জন্যে আমার সর্বনাশ হয়েছে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব আমি কী তুঃখে? ক্ষমা চাইতে হয় তিনি চাইবেন—যিনি আমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে তোমাকে দিয়েছেন মিথ্যা কুসংস্কারের দীক্ষা। নৈলে তুমি কখনই এ হেন উদ্ভট মূর্তিকে ঠাকুর বলে তার জন্যে ঘর ছাড়তে পারতে না।”

অহঙ্কার মানুষকে এমনিই অন্ধ করে বাবা—বললেন মোহন মহারাজ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। যেখানে শুধু নত হলেই সব পাওয়া যায় সেখানেও মানুষ সব হারায় শুধু এই আত্মাভিমানের ফুশলানিতে। মনীষীর কাছে ঠাকুর ফিরে এসেছিলেন কৃপা করেই বলব। কিন্তু সে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলল এই এক অন্ধ মোহে। ওথেলোর একটি কথা আমার সেদিন মনে পড়েছিল বাবা: The pity of it, Iago, the pity of it!

নৈলে ভাবো কী হতে পারত। ভাঙা ঘরে নামত চাঁদের আলো। কিন্তু সব জানলা বন্ধ করে দিলে আলো আসবে কোন পথ দিয়ে বলো ?

সরলা এ-চিঠি পড়ে ফের রুখে উঠল। একবার কল্পনা করো তার দুঃখ। যার মন প্রাণ উন্মুখ হয়ে ছিল শুধু ওর "ফিরে এসো" ডাক শোনার জন্যে—তাকে যদি মনীষী তেমন একটি তারও করত যে তুমি ফিরে এলেই বিগ্রহটি পাবে তাহলেই ও যেত ফিরে পরমানন্দে—যখন ঠাকুর ফিরে এসেছেন দয়া করে। কিন্তু অহঙ্কারের মোহে মতিচ্ছন্ন হ'লে তো মনে শুভবুদ্ধি ঠাঁই পায় না বাবা। কাজেই পুনর্মিলনের কুঁড়ি না ফুটতেই ঝরে গেল। সরলা লিখল ওকে ঃ "আমি এরও পরে ফিরে যাব কেমন করে ? আমাকে কি তুমি চেনো নি এতদিনেও ? আমি গুরুদেবকে মনে করি আমার প্রাণের দিশারি। গণেশদেবকে মনে করি প্রাণের ঠাকুর। তাঁদের যে অপমান করে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দেয় তার সঙ্গে সন্ধি করলে কি আমি নিজের চোখে ছোট হয়ে যাব না ? মিটমাট করতে আমি চেয়েছিলাম সত্যিই। কিন্তু যা হবার নয় তা হয় না বোধহয় এই জন্যেই যে যা যায় তার আর ফেরে না। কেবল শেষবার বলি—ঠাকুরকে তুমি অন্ততঃ আমার কথা ভেবে আমার জিনিস আমার কাছে ফেরত পাঠাও।"

এ চিঠি পেয়ে মনীষী যেন ফের ক্ষেপে গেল। লিখল আমাকে ঃ "যে ঠাকুর সরলার মাথায় এমন কুবুদ্ধি দিয়েছে সেই তো যত নষ্টের গোড়া, তাকে এবার সত্যিই গঙ্গায় ফেলে দেব যদি সরলা পত্রপাঠ ভালোয় ভালোয় ফিরে না আসে।"

আমি ওর চিঠি পড়ে গম্ভীর মুখে বললাম ঃ "একেবারে অলটিমেটাম।" সরলা ঢুকল ঃ "না গুরুদেব, ব্ল্যাকমেল।" বলতে বলতে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে বলল ঃ "উনি যে এত নিচে নামতে পারেন কে ভেবেছিল ?"

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম ঃ "ঠাকুরকে পূজো করে এইটুকু অন্ততঃ শিখেছি মা, যে, তাঁকে যে চায় তার সাধন-পথে নানা অনর্থ দেখা দেয় অভাবনীয় রূপে।" বলে একটু ভেবে বললাম ঃ "কিন্তু আমি আর কিছুর জন্যে ভাবছি না মা, ভাবছি—ধরো, যদি ও ঠাকুরকে সত্যিই ফেলে দেয় ?"

সরলা ফের হাসল ওর সরল বিশ্বাসের হাসি, বলল ঃ "আমি ওসব হাবিজাবি ভাবি না গুরুদেব। ঠাকুর আমাকে যখন কথা দিয়েছেন তিনি আমার ঘর আলো করতে ফিরে আসবেন তখন—" বলেই হেসে ঃ "একটি বার ভেবে দেখুন তো কোত্থেকে তিনি কোথায় এসে পড়েছেন এরি মধ্যে ? কোথায় লণ্ডন আর কোথায় পাটনা। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে শেষে তীরে এসে ভরাডুবি হতে পারে কখনো ?—বিশেষ যখন তাঁর নাম বিঘ্নহন্তা—আপনিই বলেন নি কি বারবার ?"

আমার মনে যেন হঠাৎ আলোর ঝর্ণা নেমে এল। আমি বললাম ঃ "ঠিক বলেছ মা।" বলেই আমি চন্দুলালকে দিয়ে তার পাঠিয়ে দিলাম ঃ "সরলা তোমার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখতে চায় না এর পরে।"

* * *

এর দুদিন পরে—বললেন—মোহন মহারাজ—নলিনী এসে সরলাকে বলল ঃ "আপনার নামে একটি টেলিগ্রাম দিদি !"

সরলা তার খুলেই ভেঙে পড়ল আমার পায়ে। নলিনীও চোখে আঁচল দিল।

আমি সরলাকে শান্ত করে উঠিয়ে পড়লাম তার তার ঃ "মোটর দুর্ঘটনায় মনীষী সংঘাতিক আহত বাঁচবার আশা নেই বললেই হয়। কেবল সরলা সরলা করছে।"

পরে তৃপ্তিপুরে গিয়ে শুনলাম (মার কাছেই) যে, মনীষী বিগ্রহটি নিয়ে সত্যিই গঙ্গার দিকে মোটর ছুটিয়েছিল মদ খেয়ে! পথে বেটক্করে এক বাসের ধাক্কায় মোটর উলটে যায়।

ছাব্বিশ

মোহন মহারাজ বললেন ঃ

ট্রেনে সরলা কাঁদল না। বলল ঃ "ঠাকুরের কাছ থেকে ভরসা পেয়েছি। আমি তাঁর পায়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—ওঁকে শুধু বাঁচাতে নয় শোধন করে তাঁর পায়ে টেনে নিতে। ঠাকুর বলেছেন ঃ 'তথাস্তু'।" আমি একটু ভরসা পেলাম বটে, কিন্তু তবু বিশ্বাস যেন এসেও আসে না। এ কি ঘটে এযুগে—এহেন অঘটন ?…

তারপর—পঞ্চম অঙ্কে—সে যমে মানুষে টানাটানি যাকে বলে। সরলা সাতদিন ওর শিয়রে বসে। বিকারের ঘোরে ও কেবল সরলা সরলা করে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ চোখে ব্যাণ্ডেজ পায়ে ব্যাণ্ডেজ। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। কিছুই খেতে পারে না। গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু উপসর্গ জুটছে রকমারি—ফিটও হচ্ছে। ডাক্তার বলে গেল ঃ "Sinking!" মুখে জল দিলেও গড়িয়ে পড়ছে।

হার্ট-স্পেশালিস্ট ডাকা হ'ল। তিনি বললেন চোট লেগেছে অন্ত্রে—ডাক্তারের কিছুই করবার নেই আরো এই জন্যে যে, রোগীকে কিছুই খাওয়ানো যাচ্ছে না—একটু জল পর্যন্ত গিলতে পারছে না।

সরলার মুখ ছাইয়ের মতন সাদা হয়ে গেল। উঠে পাশের ঘরে ওর বিগ্রহ ছিল সেইখানে গিয়ে বসল। আমিও গিয়ে বসলাম ওর পাশে। ও হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা করতে লাগল। ঠিক প্রার্থনা নয়, শুধু গুরুমন্ত্র জপ ঃ "সদা তৎ গণেশং নমামো ভজামঃ।" আমিও ওর সঙ্গে জপ শুরু করলাম। মনীষীকে আমিও তো ভালোবাসতাম। তার উপর মা-র বেদনা—হাহাকার। মনে আমার আঁধার ছেয়ে গেছে।

কয়েক মিনিট জপ করার পরেই দেখি—সরলার নিথর অবস্থা। জপ করতে করতে প্রায়ই ওর ভাব সমাধি হত। কিন্তু এবার হল পূর্ণ সমাধি। স্পষ্ট দেখলাম—ওর মাথার চারদিকে এক সোনার আলোর পরিমণ্ডল ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমারও হল দর্শন। ওর বিগ্রহটি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে দীপ্ত হয়ে উঠল প্রসন্ন গণেশ মূর্তি ঃ সে যে কী অপূর্ব মূর্তি, কী বলব? মনে পড়ে, ভাগবতে গোপীরা কৃষ্ণরূপ দেখে বলেছিলঃ "অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ" —নয়নের এই শেষ পুরস্কার, এর পরে আর নেই। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ দেখলাম গণেশ মিলিয়ে গিয়ে ধরলেন আমার গুরুদেবের রূপ। সঙ্গে সঙ্গে সে রূপের চারদিকে আলো ফেটে পড়ল। তারপরে কী হল— সে ভাষায় বলা যায় না। শুধু বলি—আমাতে আর আমি বলে কোনো কিছু ছিল না, ছিল শুধু এক বিপুল অকায়া আমি হীন আনন্দের অনামী জ্যোতি।

সম্বিৎ ফিরে এল। দেখলাম সরলার চোখভরা জল, মুখভরা আলো। আমি তার চোখে চোখ রাখতেই আনন্দে সে লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ে।…

এই বিহ্বল অবস্থায় আমাদের কতক্ষণ কাটল জানি না। কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, জগতটাকে মনে হল যেন ছায়াবাজি। সব মূর্তিই হয়ে গেছে যেন ছায়া—এক অরূপ আলোর পাশে—বেদনার চিহ্নও নেই, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির ব্যাপ্ত আকাশ—কিন্তু না, ভাষায় যার বর্ণনা হয় না কেনই বা তার খবর দেবার অপচেষ্টা? সবশেষে কে যেন হঠাৎ বলল ঃ "চরণামৃত।"

যখন মন বশে ফিরে এল, সরলা বলল ঃ "ঠাকুর শুধু একটি কথা বললেন—"চরণামৃত।"

আমি সায় দিলাম মাথা নেড়ে যে, আমিও শুনেছি। ও উঠে পাশের পাথরের বাটিতে যে গঙ্গাজল ধরা ছিল সে জলে বিগ্রহের পা ছুঁইয়ে উঠে গেল। আমিও গেলাম পিছু পিছু।

মনীষীর তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। ডাক্তার অনেক আগেই শুধু শেষ একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে জবাব দিয়ে গিয়েছিলেন "আর কিছু করবার নেই বলে।" একা নার্স বসেছিল ম্লান মুখে। "নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। A matter of minutes."

সরলা চামচ নিয়ে একটু জল তুলে মুমূর্ষুর মুখে দিতে যেতেই নার্স বলল : "বৃথা, মুখে যাবে না, কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়বে।"

সরলা দৃঢ়স্বরে বলল : "না।" নার্স আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল, সরলা চামচ ওঠাল। ভাবটা—শোকে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ?

আশ্চর্য—সরলা রোগীর ঠোঁট ফাঁক করে চামচের জল মুখে ঢালতেই রোগী ঈষৎ কেঁপে উঠল সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

মা চুপ করে শিয়রে বসেছিলেন, বললেন : "দেখ দেখ, ওর চোখের পাতা নড়ছে।"

নার্স আনন্দে অস্ফুট চিৎকার করে, ওর মণিবন্ধ ধরেই বলল : "একি ! নাড়া ফিরে এসেছে·····"

সরলার দুগাল বেয়ে দুটি ক্ষীণ ধারা গড়িয়ে পড়ল···এক এক চামচ করে বাকি চরণামৃতটুকু ওর মুখে ঢেলে দিল।

নার্স চেঁচিয়ে বলল : "শেষ ইঞ্জেকশনে কাজ হয়েছে—delayed action ! Thank God !"

আমি হেসে বললাম : "ডিলেড অ্যাকশন ঠিকই, তবে ডাক্তারের ইঞ্জেকশনের নয়, যাঁকে ধন্যবাদ দিলেন তাঁরি কম্প্যাশনের।"

সরলা গাঢ় কণ্ঠে গেয়ে উঠল : "সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ।"

মনীষী চোখ মেলল···ক্ষীণ কণ্ঠে বলল : "সরলা···না স্বপ্ন ?"

আমি ওর কপালে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বললাম : "না··· স্বপ্ন নয়···সত্যিই সরলা···ঠাকুর ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

মা নিজের কপালে দু হাত ঠেকিয়ে উদ্দেশে প্রণাম করে জুড়ে দিলেন : "আর নিজে ফিরে এসেছেন।"

*　　　*　　　*　　　*

ঘরের মধ্যে শুধু টিক্ টিক্ শব্দ শোনা যায়।...

সোফিয়া বলল ঃ 'সরলা এখন কোথা দাদা ?'

অসিত বলল ঃ "গত বৎসর স্বামীকে নিয়ে নাসিকে গেছে।"

বার্বারা ঃ মোহন মহারাজের আশ্রমে ?"

অসিত বলল ঃ "হ্যাঁ।"

সোফিয়া শুধালো "বরাবরের জন্যে ?"

তপতী ঘাড় নেড়ে বলল ঃ হাঁ। আর দেখলাম সে আর এক অঘটন স্বচক্ষে। কিন্তু থাক বললে হয়ত ফের তোমাদের মনে—"

সোফিয়া বলল ঃ "না দিদি, মন আমাদেরও আর সে মন নেই, বলুন আপনি নির্ভয়ে।"

তপতী বলল ঃ "আমরা আমেরিকা রওনা হবার কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম নাসিকে। রোজ সকালে দেখতাম কি জানো ? মোহন মহারাজ আর তাঁর মা'র সঙ্গে সরলা ও তার স্বামী একত্রে গণেশ স্তোত্র গাইছে সরলার বিগ্রহের সামনে।" বলেই গুণ গুণ করে গাইল, এবার অসিত দিল দোয়ার ঃ

"অপার যাঁর কৃপার বর নিরন্তর বিছায় দোল,
রবির রাগ চাঁদের কর তারার ভায় দিগন্তে,
হৃদয় যাঁর রাতুল পায় প্রেমের অর্ঘ দেয়—সেই
পরম বিঘ্নহন্তার গাহি স্তব আনন্দে।"

—

অঘটনের সূত্রপাত

উৎসর্গ

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

বৈজ্ঞানিক বন্ধুবরেষু,

"অঘটনের সূত্রপাত" উপন্যাসটি আপনাকে উৎসর্গ করতে যাচ্ছি কেন? একাধিক কারণ আছে।

প্রথম কারণ, আপনার সঙ্গে তর্কাতর্কির সূত্রে একটি গভীর মিলের যোগসূত্র পেয়ে এ-মিলের দরুণ যে-তৃপ্তি পেয়েছি তার কিছুটা অন্ততঃ আপনাকে জানাতে চাই উৎসর্গের আত্মপ্রকাশে। আপনি জানেন নিশ্চয়ই প্রতি গ্রন্থকারই তাঁর প্রতি রচনার উৎসর্গের অঙ্গীকারে ঋণশোধা জাতীয় একটা কর্তব্য সাধন করতে চান। সব প্রীতির ঋণই অবশ্য অপরিশোধ্য। হোক না। ঋণ-স্বীকারের মধ্যেই যে একটা মহৎ আনন্দ রয়েছে এ-কথার তো মার নেই।

দ্বিতীয় কারণ, আপনি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্বেও অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধালু। বিদেশে এরকম বৈজ্ঞানিক আমার চোখে পড়লেও আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে উপলব্ধিভিত্তি ধর্মে শ্রদ্ধা আমার বড় একটা চোখে পড়ে নি—অন্ততঃ খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের সংসদে। তাই মনে হ'ল—এ উপন্যাসটিও আপনার কাছে আদর পাবে "অঘটন" ও দৈবী করুণা বিষয়ে মতভেদ সত্বেও।

তৃতীয় কারণ, "অঘটনের সূত্রপাত" আপনাকে উৎসর্গ করলে আপনাকে বেশি কুণ্ঠিত হ'তে হবে না। কারণ এ-বইটিতে অঘটন ও দৈবী করুণার স্বপক্ষে উপলব্ধিগত ও বিশ্বাসভিত্তি এজাহার কিছু থাকলেও এর উপজীব্য ভাগবতী কথা নয়। এর মুখ্য লক্ষ্য গল্প হাসি ও চরিত্রচিত্রণ—আলাপ তর্কাতর্কি ও নাটকীয় সংঘাতের চমকমঞ্চে। বলাই বাহুল্য যে, এ-চরিত্রগুলি সর্বৈব কল্পিত নয়—প্রধানতঃ ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার 'পরেই এদের ভর। এর বেশি বললে ফ্যাসাদে পড়ে যাব। কাজ কি?

কিন্তু সে যাই হোক্, শুভ কার্য যে শুভবুদ্ধিপ্রসূত এটুকু আপনি নিশ্চয়ই মানবেন ব'লে কারণের ফিরিস্তি আর বাড়াব না। শুধু বলা রইল—ইংরাজীতে যাকে বলে reading between the lines সে-ভঙ্গিতে এ-কাহিনী পড়লেও এর মূল উদ্দেশ্য যে রসসৃষ্টি এটুকু যেন আপনি ভুলেও না ভোলেন। অর্থাৎ কাহিনীর নানা চরিত্রচিত্রণে, রূপসজ্জায় ও বাগ্মিতণ্ডার মধ্যে দিয়ে নাটকীয় সংঘাতটুকুর স্বাদটুকু যেন সর্বাগ্রে চেখে চেখে উপভোগ করেন। বাকি সব—অঘটনবর্গীয় ঘটনা আপনি "এহো বাহ্য" বলে বরখাস্ত করতে চান করুন! কেবল হাসবেন মন খুলে—বলা রইল।

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
শ্রীদিলীপকুমার রায়
২৬ পৌষ ১৩৭১

ভূমিকা

"অঘটনের সূত্রপাত" সম্পর্কে কিছু বলার আছে। দৃষ্টিভঙ্গির বদল হবার সঙ্গে সঙ্গে একই ঘটনার রূপ বদ্‌লে যেতে পারে। অন্ততঃ এ-গল্পে বর্ণিত ঘটনার (বা অঘটনের) রূপ বদ্‌লে গেছে পর পর দুবার। প্রথমবার লিখি এটি "বিবাগীর বিড়ম্বনা" নাম দিয়ে। দ্বিতীয়বার "শিকারী বিড়াল"। এবার— "অঘটনের সূত্রপাত"। এ-তৃতীয় "পুনর্জন্মে" গল্পটির ছন্দ মেজাজ ভাষ্য সবই বদ্‌লে গেছে, যেমন "গল্প কিন্তু গল্প নয়" উপন্যাসটির বেলায়ও ঘটেছে তার "অঘটনের পূর্বরাগ" নবসংস্কারে। এ কেমন? না, একই শ্লোকের ভাষ্য বদ্‌লে যাওয়া জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে—ধাপে ধাপে। আগে এ-গল্পটি পরিবেশনের সময়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যতঃ যারা জানতে চায় তাদের চিত্তরঞ্জন। এখন আমার উদ্দেশ্য বদ্‌লে গেছে, যেহেতু অসিত ফুটে উঠেছে ভাষ্যকার হ'য়ে তপতী সোফিয়া বার্বারা ত্রয়ীর পরিবেশে। এ-ধরণের পরিবেশে আমার মনটা পুরোপুরি ছাড়া পায়, কেন না আমি চলতে পারি খুশখেয়ালে গল্প ছেড়ে কখনো হাস্য, কখনো ভাষ্য, কখনো উপমায়, কখনো গল্পের মধ্যে অন্য গল্পের অবতারণায় ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ে— পরমানন্দে। এ-শৈলী আমি ভেবেচিন্তে গ'ড়ে তুলি নি—গ'ড়ে উঠেছে আপনা থেকে আমার জীবনদর্শনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের দেশে আবহমান-কাল প্রশ্ন উত্তরের কাঠামোয় ফলে উঠেছে তত্ত্বজিজ্ঞাসাও যথা, গীতা তন্ত্র যোগবাশিষ্ঠ; গল্প কথিকাও: যথা, মহাভারত রামায়ণ পুরাণ ভাগবত। এতে সুবিধে এই যে একটা মনের বক্তব্য আর একটা মনের জেরায় বা দরদে ঝল্‌কে ওঠে। বিশেষ ক'রে বিদেশী মনের আলোকসম্পাতে।

শেষে কেবল আর একটি কথা বলার আছে। আমি কোনোদিনই নিছক গল্পের জন্যে গল্প বলতে যাই নি। আমার কাছে শিল্পকারু—art—কখনই লক্ষ্য বা উপেয় (end) হয় নি, হয়ে এসেছে বরাবরই উপায় (means) মাত্র।

কিন্তু তা ব'লে গল্পাংশটুকু ফুটে না উঠলে চলবে কেন? চরিত্রচিত্রণ যতটা সম্ভব নিখুঁৎ করতেই হবে, সংলাপ যতটা পারি স্বাভাবিক শোনাবে, সংঘাত আসবে অব্যর্থভাবেই পাঠকের মনে উদ্বেগ জাগাতে, নানা দৃশ্যের নাটকীয়তা মনকে যথাবিধি আবিষ্ট করবে, প্লটকে মেনে নিতে বুদ্ধি বাধা পাবে না · এসবই আমি চাই বৈকি। কিন্তু চাই এইজন্যেই যে, এসবের শিল্পকারু যত নিখুঁৎ হবে আমার অন্তিম লক্ষ্য সিদ্ধি ততই পূর্ণায়ত হ'য়ে উঠবে—মনের কথাটি বলা হবে মনের মতন ক'রে। কেবল, বলব কাকে? যাকে তাকে? না। সেই সব সহমর্মীকে ভাগবতে যাদের বলেছে "রসিকাঃ" তথা "ভাবুকাঃ" অর্থাৎ শুধু রসিকদের নয়—যারা বোঝে মাত্র আর্ট। তাদের হতে হবে ঐ সঙ্গে ভাবুকও বটে—যারা গভীর কথা গভীর স্বরে বলতেও চায়, শুনতেও চায়। আপনি এই গুণগ্রাহী সংসদের সভাসদ, তার উপর সুধী তথা দরদী। তাই এত কথা বলা আপনার সানন্দ গ্রহণের দরবারে সমাদৃত হ'তে চেয়ে। শিবা নো সন্তু পন্থানঃ ॥

ভবদীয় গুণগ্রাহী

এক

আজ সকালে সূর্যের সোনার আলোয় সোফিয়ার বাগান ঝলমল করছে। বার্বারা বলল ঃ দাদা, আজ গল্পের আসর বসুক বাগানেই।

তপতী বলল হাততালি দিয়ে ঃ এই-ই তো চাই দিদি! তোমাদের এ দারুণ মেঘের দেশে অরুণ সূর্যের আদর না করলে চলে?

পরিচারিকা কফি টোস্ট জ্যাম মধু সব সাজিয়ে আনল চলন্ত টেবিল-ট্রেতে। বার্বারা অসিতকে কফি পরিবেষণ করে বলল ঃ কাগজে ছাই কী এত দেখছেন দাদা? কফি জুড়িয়ে যাচ্ছে যে!

তপতী ঝুঁকে দেখে বলল ঃ দাদার ভাব লেগেছে দিদি, একটি ছবি দেখে।

সোফিয়া ঃ কার ছবি?

অসিত (মুখ তুলে) ঃ এই দেখ, ড্রেসডেনের জাদুঘরে এই ছবিটি আমি রোজ দেখতে যেতাম—Madonna-র কোলে শিশু খৃষ্ট। অবিশ্যি এটা আঁকা ছবিটির ফটোগ্রাফের ব্লক থেকে ছাপা। তবু চোখ জুড়িয়ে যায়।

সোফিয়া ঃ বার্বারা এই ছবিটির একটি কপির কপি ক'রে এনেছে —ভারি চমৎকার! (বার্বারাকে) দেখা না—না, ছাড়ব না আমি —এত সুন্দর আঁকিস তুই, দেখাতে লজ্জা কি? দৌড়ে যা।

বার্বারা অগত্যা ছবিটি এনে অসিতের হাতে দিল—স্ফটিকের-ফ্রেমে-বসানো ছবি।

অসিত (ছবিটা খানিকক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে দেখার পরে ফিরে বার্বারার দিকে চেয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কারী ভঙ্গিতে) ঃ

I bow to thee, O artist great and amazing!

Such art is truly marvellous, hair-raising !

তপতী ঃ সত্যি। (বার্বারাকে) কোথায় শিখেছিলে তুমি ছবি আঁকতে ?

সোফিয়া (হেসে) ঃ Thereby hangs a tale, দিদি !

অসিত (সোফিয়াকে) ঃ কী ব্যাপার ?

বার্বারা ঃ না সোফি ! লক্ষ্মীটি !

সোফিয়া (হেসে) ঃ দাদা-দিদি এত কথা বললেন তাঁদের জীবনের, তবু তোর এত লজ্জা ? ধিক্ ! দাদা সেদিন কী বলেছিলেন মনে নেই ? ধর্মজীবনে কৃতজ্ঞতা কত বড় সহায় ?

বার্বারা (তপতীকে) ঃ কারুর কাছে কৃতজ্ঞ হলে তাকে কি কেউ বাজে স্মৃতি উপহার দিতে চায় দিদি ? বলুন তো।

তপতী (মাথা নেড়ে) ঃ হোক বাজে, আমি শুনতে চাই।

অসিত (হেসে) ঃ সাহেবরা বলেন ঃ Alas, the eternal feminine !

তপতী ঃ Ephemeral masculine-এর চেয়ে ভালো অন্ততঃ।

বার্বারা (হেসে) ঃ মেমসাহেবরা আরো একটু বেশি দূর যান, বলেন ঃ Curiosity killed the cat.

তপতী ঃ কিন্তু curiosity বিজ্ঞানের প্রথম ধাপ, জেনো। (অসিতকে) তাছাড়া আরো একটা কথা দাদা। তুমি নিজেই তো কতবার সেই সংস্কৃত শ্লোকটা আওড়েছ যে, বন্ধুত্ব হ'লে তার একটি দাবি হল গোপন কথা শুনতে চাওয়া।

সোফিয়া ঃ কী শ্লোক দাদা ?

অসিত ঃ ছেলেবেলায় পড়েছিলাম স্কুলে একটি বইয়ে ঃ

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি
ভুংক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষ্যম্—

অর্থাৎ প্রীতির পরিচয় মেলে ছয়টি অভিজ্ঞানে ঃ দেবে ও নেবে ; গোপন কথা বলবে ও শুনতে চাইবে ; নিমন্ত্রণ নেবে ও করবে।

সোফিয়া (হাততালি দিয়ে) ঃ ঠিক। Bull's eye ! কাজেই (বার্বারাকে) বলতেই হবে তোকে। শাস্ত্রবাক্য যখন।

অসিত ঃ ঠিক শাস্ত্র বলা চলে না—হিতোপদেশ—

সোফিয়া ঃ তারই তো নাম শাস্ত্র দাদা। যদি কেউ অহিত উপদেশের কথামালা গাঁথত তাকে কি আর শাস্ত্র বলা চলত ? তাই (বার্বারাকে) বল না।

বার্বারা ঃ আমি পারব না, বলতে হয় তুই-ই বল।

অসিত ঃ কী এমন কথা দিদি ? এবার যে আমার টম্-ক্যাট্-মগজেও কৌতূহল উঁকি দিতে সুরু করেছে।

সোফিয়া (হেসে) ঃ এমন কিছু রোমাঞ্চকর রোমান্স নয় দাদা। ব্যাপারটা খুবই ঘরোয়া প্রায় প্রাত্যহিক, অন্ততঃ আমাদের দেশে—যদিও সন্ন্যাসীদের নিভৃত নিলয়ে হয়ত ঘটে না, যদিও ঘটতেও পারে হয়ত চোরা-গোপ্তা—কে জানে ?

তপতী ঃ সন্ন্যাসীর নিভৃত নিলয় ? Monastery ?

সোফিয়া ঃ না। যাকে বলে Retreat. দশবারো বৎসর আগে আমরা দুই বোনে একবার ইতালি বেড়াতে যাই। রোমে সেণ্ট পীটার্স চার্চে আমাদের আলাপ হয় এক চিত্রী মংকের সঙ্গে—তার তপোবনে। একলাই থাকত সে। তার ছবি দেখে বার্বারা মুগ্ধ হয়ে তার কাছে চিত্রবিদ্যায় তালিম নিতে শুরু করে। কিছুদিন শেখবার পরে সে একদিন ওকে বলে তার মডেল হতে। না, যেমন তেমন মডেল নয়, বুঝতেই তো পারছেন কী চেয়েছিল সে ?

বার্বারা ঃ তুই থামবি ? আর কোনোদিন যদি তোকে আমার মুখপাত্রী হতে বলি ! না দাদা, শুনুন, আমিই বলছি। আমি তাকে সত্যি বিশ্বাস করেছিলাম ব'লেই আমাকে এত বেজেছিল। ভেবেছিলাম সন্ন্যাসী তো—নিশ্চয় খুব পবিত্র মন। ওমা ! কিছুদিন তার কাছে ছবি আঁকা শেখার পর দেখি—তার চাহনি যেন কেমন কেমন ! তারপরেই এই প্রস্তাব ! আমি চটেমটে তখনি চ'লে

আসি সেখান থেকে দিদিকে নিয়ে—এক রকম জোর করেই বলব। কিন্তু আসবার আগে এ ছবিটির কপি করা হয়ে গিয়েছিল। তাই নিয়ে এসেছিলাম। এই হল ইতিহাস। হল?

অসিত (হেসে): সরলা বালা! এ ইতিহাস বলতেও কুণ্ঠা!

বার্বারা: হবে না কুণ্ঠা? (তপতীকে) বলুন তো দিদি? মংক—সন্ন্যাসী—তার যদি এমন আচরণ হয়—

অসিত: কিন্তু সন্ন্যাসীদের মধ্যে মেকি সন্ন্যাসী মিলতে পারে-না এ তুমি ধরে নিচ্ছ কোন যুক্তিতে? ভণ্ডামি কোথায় নেই শুনি? শুধু ধর্মের জগতেই থাকবে না—একি হতে পারে কখনো?

বার্বারা: আপনি দেখেছেন ভণ্ড সন্ন্যাসী?

তপতী (হেসে): শুধু দেখা নয় ভাই, ভণ্ড সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে নাজেহাল হয়েছেন বহুবার। একবার যে কী ভাবে—(হাততালি দিয়ে) বলো না দাদা সে মজার গল্প।

বার্বারা: মজার?

তপতী: একেবারে rollicking! (হাসি)

সোফিয়া (সোৎসাহে): তাহলে বলো দাদা। একটু মুখ বদলানো যাক।

অসিত (একটু ইতস্ততঃ করে): কিন্তু সে একেবারে নিছক হাসির গল্প—বার্বারার কি সইবে?

বার্বারা (হেসে): মানে, বলতে চাইছেন তো যে আমি গুরুগম্ভীরা—বেরসিকা? জানেন আমাদের সেণ্ট তেরেসা একবার Partridge খাচ্ছিলেন তাঁর কনভেণ্টে বসে। সেই সময়ে এক গম্ভীরানন এসে হাজির। সেণ্ট তেরেসা অকুণ্ঠে বললেন: "There is a time for partridge and a time for penance.

অসিত (হেসে): তবে বলতেই হল। আমার আর দোষ নেই কিন্তু—যদি এ গল্পের মধ্যে ভণ্ড সন্ন্যাসীর আবির্ভাব সত্ত্বেও কোন moral না খুঁজে পাও—আর এককথা: সে ভণ্ড হলেও

পুরোপুরি ভণ্ড ছিল না। কে এক রসিক বলেছিলেন না ঃ I may be a fool but surely not a damned fool ?

বার্বারা ঃ হয়েছে হয়েছে দাদা, অত অ্যাপলজি করতে হবে না।

অসিত ঃ আচ্ছা—কেবল (থেমে তপতীকে) আমি এ গল্পের নানা বর্ণনায় যেম্‌নি একটু বেশি ঘরোয়া ঢং ধরব বা ছড়া কাটব তুমি ওদের বুঝিয়ে দিও।

তপতী ঃ না, তাতে রসভঙ্গ হবে। তুমি বলে যাও একটানা, আমি টুকে রাখব। কোথায় কোথায় ব্যাখ্যা করতে হবে—গল্পের শেষে ব্যাখ্যা কোরো তুমি অ্যাপেণ্ডিকস-ভঙ্গিতে।

দুই

অসিত (তৃতীয় পেয়ালা কফি শেষ করে) ঃ একটু ভূমিকা করতে হবে কিন্তু। সংক্ষেপেই বলবার চেষ্টা করব।

আমি ষোলো বৎসর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি। ঠিক সেই সময়েই আমার বাবা মারা যান। আমার মার বাবা—দাদু ছিলেন কলকাতার মস্ত সার্জন ডাক্তার। একান্নবর্তী পরিবার, চার ছেলে আট মেয়ে। থাকতেন বৌবাজারে তাঁর মস্ত বাড়িতে। বড় ছেলে—আমার বড় মামা অমূল্য লাহিড়ী ছিলেন আলিপুর কোর্টের জজ। রগচটা মানুষ—একেবারে মূর্তিমান Martinet. বিশ্বাস করতেন মনে প্রাণে ঃ spare the rod and spoil the child। এদিকে আমি ছিলাম দিদিমার নেওটো—তাই বাড়িতে আমার সাতখুন মাফ। মামাবাবুর সইত না এ সব প্রশ্রয়। দিদিমাকে ঘড়ি ঘড়ি বলতেন ঃ "অসিতের মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছ মা ঃ পরে ভুগতে হবে, সাবধান!" দিদিমা হাসতেন ঃ "ওরে, ওকে ওর বাপ-মা আমার

কাছেই গচ্ছিত রেখে গেছে। ওকে কেউ কিছু বললে আমার ধৰ্ম্মে সইবে না।"

বড়মামা কী আর করেন—ভিতরে ভিতরে গজরাতে থাকেন। মাঝে মাঝে আমাকে ধমকান—স্বভাব যার ধমকানো সে না ধমকে থাকবে কেমন ক'রে?—কিন্তু আমার ছিল রক্ষাকবচ দিদিমার স্নেহ প্রশ্রয়—অর্থাৎ দিদিমার কাছে গিয়ে নালিশ করলেই জিৎ হত আমার। মামাবাবু আরও রেগে উঠতেন। কিন্তু উপায় কি? দিদিমা রাশভারি গিন্নি। সবাই ছিল তাঁর মুঠোর মধ্যে।

সেবার হল কি—হঠাৎ অর্ধোদয় যোগ এল। দিদিমা দিন দুই আগে উড়ে গেছেন কাশী। আমি হয়ে পড়লাম দিদিমা-হীন নাতি—ওরফে কৃষ্ণহীন অর্জুন। কী করি! সকালবেলা উঠে একাই গেলাম গঙ্গাস্নানে বাবুঘাটে। সে কী ভীড়! ফিরতে ফিরতে বেলা এগারোটা। বড় মামা সেদিন কাছারী যান নি মাথা ধরেছিল বলে। আমাকে এগারোটায় গঙ্গাস্নান ক'রে মালা প'রে তিলক কেটে ফিরতে দেখেই জ্বলে উঠলেন। হাঁকলেন "কলেজ গেলি নে?" আমি হেসে বললাম: "আজ আর হয়ে উঠল না মামাবাবু!" মামাবাবু গর্জে উঠলেন: "হয়ে উঠল না! মানে? গঙ্গাস্নান তো খাসা হয়ে উঠল!"

আমি দিদিমার আদুরে নাতি তো, পিঠ পিঠ জবাব মুচকে হেসে: "অর্ধোদয় যোগে পুণ্যি করতে হবে তো! পুণ্যি বড় না কলেজ বড়?" মামাবাবু পুণ্যি পুরুত পূজাপার্বণ দুচক্ষে পেড়ে দেখতে পারতেন না। তার উপর আমার দুরন্ত মুচকি হাসি—বললেন আগুন হয়ে: "বটে। বড় বাড় বেড়েছ, না? কিন্তু এখন মা কাশীতে। মনে রাখিস।" আমি অম্লানবদনে বললাম: "জানি। ভেবে দেখেছি তাঁর পুণ্যি হবে আরো বেশি।" মামাবাবু এবার সামলাতে পারলেন না, সকাল থেকে মাথা ধরেছিল বলে আরো রেগে উঠে এসে আমার কান ধরে বললেন: "বটে! কিন্তু তোর কী হবে ভেবে দেখিস নি বোধহয়।" বলেই ঠাশ ক'রে এক চড়।

দাদুও বাড়ি নেই—রুগী দেখতে বেরিয়েছেন। নৈলে তাঁর কাছে যেতাম নালিশ করতে। অসহায় হয়ে বললাম আরো রুখে উঠে: "দিদিমা নেই তাই এত পৌরুষ, না? তিনি থাকলে"—বড় মামা এবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। আমার দুকান ধরে টেনে পর পর দু গালেই ঠাশ ঠাশ করে আরো দুই চড়। আমি রাগে অপমানে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম: "আচ্ছা বেশ! আমার আর দোষ নেই কিন্তু।"

বলেই এককাপড়ে বেরিয়ে পড়লাম। চললাম সোজা যেদিকে দু চক্ষু যায়।

মাঘ মাস। গায়ে শুধু একটি ধোসা—ফ্লানেলের পাঞ্জাবীর উপর। রাস্তায় বেরিয়ে মনে হল বিবাগী হবই হব—অন্ততঃ মামাবাবুকে একটু শিক্ষা দিতে। দিদিমা কাল কাশী থেকে ফিরে আমাকে না দেখে হুলুস্থূল কাণ্ড বাধাবেন, মামাবাবুর মুখ চূন হয়ে যাবে। তাছাড়া আমি বিবাগী হলে দাদুও হবেন আমার দিকে! দু তিন দিন গা ঢাকা হয়ে যখন ফিরব তখন আমাকে আর পায় কে? ধুমধাম হবে আমাকে নিয়েই তো। মামাবাবু হবেন অপদস্থ। ভাবতেও যেন প্রাণ জুড়িয়ে গেল প্রতিহিংসার আগুনে। এ আর এক প্যারাডক্স।

বেরিয়ে গঙ্গার দিকে মুখ করে পাড়ি দিলাম বৌবাজার রাস্তা দিয়ে। ঐ যে সামনে পারুলির বাড়ি! ভাবলাম তার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। তারপরেই মনে হল: নাঃ, কাজ নেই। পারুলি যদি কান্নাকাটি করে লোক জড়ো করে—কাজ কী, যখন বিবাগী আমার না হলেই নয়—কোথাও থাকতেই হবে লুকিয়ে অন্ততঃ দু তিন দিন। কিন্তু মনটা কেমন যেন স্বস্তি পায় না। পারুলি কান্নাকাটি করবে আমি বিবাগী হয়ে গেছি শুনলে। করুক গে। ফিরে এসে ওকে চকলেট দিলেই ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। এখনো যে পুতুল খেলে……

তিন

অসিত : এখানে থেমে বলতে হবে একটু পারুলির কথা। ফুটফুটে মেয়ে। বয়স তখন বারো হবে। দু তিন বছর আগেও ছিল আমার খেলার সাথী। আমি কলেজে ঢুকে ওর সঙ্গে খেলা করা ছেড়ে দিয়েছিলাম—ভারিক্কি না হলে চলে?

সংসারে পারুলির থাকবার মধ্যে এক বিপত্নীক কাকা আর ঠাকুমা। ওর ছেলেবেলায় মা বাপ দুজনেই হঠাৎ কলেরায় মারা যায়। সেই থেকে ঠাকুমার ও নয়নতারা। কাকাও ওকে ভালবাসতেন—এমন সুন্দর মেয়ে, ভালো না বাসবে কে? একটু মুখফোঁড় এই যা। তা আদুরে মেয়ে একটু মুখফোঁড় হবে না? আমিই বা কোন মুখচোরা?

আমার দিদিমাও পারুলিকে স্নেহ করতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়। শুনে আমি হাসতাম। বিয়ে আবার কি? আমি যোগী হব না? ভয়ে দিদিমা আর উচ্চবাচ্য করেন-নি। কিন্তু পারুলিকে পূজাপার্বণে ডাকতেন ও পাশে বসিয়ে খাওয়াতেন নিজে হাতে।

ওর ঠাকুমাকে আমিও ঠাকুমা ডাকতাম। বেশ মনে পড়ে—আশি বছরের বুড়ীর সেই খেয়েদেয়ে লাঠির উপর ভর দিয়ে ঠক ঠক ক'রে পারুলিকে নিয়ে আমাদের ওখানে আসা। আর দিদিমার কাছে এসে বসে তাঁর ছেঁচা পানের সঙ্গে মেশানো দোক্তা চিবুতে চিবুতে কাশীরাম দাসের অমৃতসমান মহাভারতী কথা শোনা। দিদিমা সুর ক'রে পড়ে যেতেন নাকে চশমা এঁটে, আর ঠাকুমা অঝোরে চোখের জল ফেলতেন। দিদিমার নাম ছিল দুর্গামণি। ঠাকুমা বলতেন: "আহা হা—ঐ জায়গাটা আর একবার পড় না

দুগ্‌গা! ঐ রাবণের শক্তিশেলে অভিমন্যুর পটল তোলা। আহা, বাছারে!"

দিদিমা চশমার উপর দিয়ে সোজা তার পানে তাকিয়ে বলতেন: "রাবণ তো রামায়ণে দিদি, আর তার শক্তিশেলে যে পটল তুলেছিল সে তো অভিমন্যু নয়—লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ—শুনতে পাচ্ছ?"

ঠাকুমা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলতেন: "নে। তোর যেমন কথা। শুনতে পাব না আমি কী দুঃখে? চোখের তেজও এখনো তোর চেয়ে বেশি, বুঝলি? এখনো আমার নাকে চশমা আঁটতে হয় না—হুঁম্।"

দিদিমা বলতেন হেসে: "তোমার চোখের তেজ যে অফুরন্ত দিদি, তা কি আর আমি জানি না? এই সেদিন কলাগাছ থেকে অসিতকে বলেছিলে আম পাড়তে—ভুলে গেলে?"

ঠাকুমা রেগে বললেন: "কী যে বলিস দুগ্‌গা? তোর মুখে যেন আগল নেই। আর অসিতটা যা মিথ্যুক হয়েছে—হুঁম্! বলে কি জানিস? বলে পারুলির আর পুতুল খেলা সাজে না—বারো বছরের মেয়ের লেখাপড়া করা দরকার। বারো কোথায়? ও তো কচি মেয়ে—ফ্রক পরে। এই সবে আট পেরিয়ে ন-য়ে পা দিয়েছে—হুঁম্।"

পারুলি ফোঁস করে উঠল: "কী যে বলো ঠাকুমা! তোমার ভীমরতি হয়েছে। আমি কি এখনো ফ্রক পরি নাকি? শাড়ী শাড়ী। তা দেখতে পাবে কোত্থেকে—চশমা তো পরবে না কিছুতেই—পাছে লোকে বুড়া বলে! যাক দিদিমা, আপনি পড়ুন—তারপর কী হ'ল? অভিমন্যুকে যখন সাতজন মিলে ঘিরে দাঁড়াল?—আহা বেচারী!" ওর চোখে ফের জল ভ'রে আসে।

ঠাকুমা দোয়ার দিলেন: "হ্যাঁ হ্যাঁ দুগ্‌গা। তুই পড়ে যা না। তা কেবল গপ্প করবি, পড়বি কখন? বল—কাশীরামের রামায়ণ। কাশীতে লিখেছিলেন বলে বুঝি কাশীরাম এর নাম দিয়েছিলেন রামায়ণ?"

পারুলি বলল: "রামায়ণ কী বলছ, ঠাকুমা? মহাভারত মহাভারত—শুনতে পাচ্ছ?"

ঠাকুমা বললেন একগাল হেসে: "ছেলেবেলা থেকে ভাগবত পড়ে আসছি—তবু এ মেয়ে বলবে ভাগবত ভাগবত শুনতে পাচ্ছ! পড়্ দুগ্‌গা—ঐ কী বলে যেন শক্তবীজের কথা না? বিচি যে শক্ত হয় কে জানত বল?"

দিদিমা হেসে বললেন: "শক্ত বীজ নয় দিদি, রক্ত—টকটকে লাল—তার গোড়ায় বীজ জুড়ে দিলে যা হয়। কিন্তু মহাভারতে তো রক্তবীজের কথা নেই—সে যে চণ্ডী!"

ঠাকুমা হেসে বললেন: "গণ্ডী আর জানি না। সেই সীতাকে যখন হনুমান নৈমিষারণ্যে রেখে গেলেন—গণ্ডী দিয়ে গেলেন না?—বললেন না—এ গণ্ডী পেরুস নে, পেরুলেই জটায়ু এসে ধরে নিয়ে যাবে? আমার সব মনে থাকে রে, স—ব। কবে শুনেছি ছেলে-বেলায় নন্দীর কথা, মনে আছে আজো, জানিস? কী ফন্দীবাজই ছিল নন্দী! দক্ষযজ্ঞ করল কে? দক্ষের ঘাড়ে ছাগলের মুণ্ডু বসালো কে? নন্দী আর তার ভায়রাভাই ভৃঙ্গী। দেখ সব মনে আছে। মরুকগে, তুই গীতার নন্দীভৃঙ্গীর কথা ছেড়ে পড় এখন দেবীভাগবত যাতে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধু আছে।"

পারুলি খিল খিল করে হেসে চলে: "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে! দেবী ভাগবতে কুরু পাণ্ডব আসবে কোত্থেকে ঠাকুমা? মহাভারত—মহাভারত—শুনতে পাচ্ছ?"

ঠাকুমা বললেন: "হয়েছে—হয়েছে—অত চেঁচাতে হবে না—আমি পিঁপড়ে চলে গেলে শুনতে পাই তার পায়ের শব্দ; জানিস? তা পড়্ দুগ্‌গা—পড়ে যা সেই গজ কচ্ছপের যুদ্ধুর কথা যাতে শেষটা কচ্ছপই জিৎল যখন হাতী তাকে টেনে ডোঙায় তোলে—দেখ্, সব মনে আছে। আমি কি ভুলি রে নকুড় সরকেলের মেয়ে? তাঁর মুখস্থ ছিল চারটে পুরাণ আর আঠারোটা বেদ।"

পারুলি হেসে কুটিকুটি, বলল : "ঠাকুমা, তোমার কথা শুনে কাকাবাবু সেদিন কী বলছিলেন জানো। তুমি নাকি সেদিন হেঁকে-ছিলে পুকুর পাড়ে : "পুকুয্যে মশাই পুকুয্যে মশাই—মুকুরের ধারে দেখুন আপনার দাঁড়টা ষাঁড়িয়ে রয়েছে।"

এবার ঠাকুমাও হাসলেন, বললেন : "ঘেন্টুর কথা ধরিস নি। সে কী না বলে? ছাগলে কী না বলে পাগলে কী না খায়? (খক খক খক)—ও তুগ্‌গা! গঙ্গাজলের ঘটিটা কোথায়?—এই দেখ দেখি, বিষম লাগল—হুঁম! (খক খক খক) নিত্যি বলি—আমাকে বকাস নে বকাস নে। আমি কি বকতে আসি নাকি! (খক খক খক) আসি হরি কথা শুনতে—পুণ্যি করতে কিন্তু তোরা কেবল বকাবি—জিজ্ঞেস করবি কোথায় কী আছে—হুঁম? (খক খক খক) আঃ! জলের ঘটিটা কই? (খক খক খক) পানে বুঝি মৌরির গুঁড়ো ছিল? (খক খক খক) তা আমাকে যমের বাড়ি না পাঠালে তোদের চলবে কেন? (খক খক খক) নে—চল উঠি—হুঁম্। পারুলি—অ পারুলি! কোথায় গেলি? অ! ঘটি আনতে বুঝি? দে (জল পান)।

চার

তপতী নানা বর্ণনার একটা ভায্যমতন দেবার পর ওদের হাসি শুরু হল ফের। হাসি থামলে অসিত ফের খেই ধরল :

এ হেন পুণ্যার্থিনী হুঁশিয়ার ঠাকুমার নাৎনী পারুল ঠাকুমার আরও কত কীর্তিকলাপের কথাই যে বলত আমাকে—কবে বালিশ ভেবে তিনি বেড়ালের পরে মাথা দিয়ে শুয়েছিলেন, কবে চিনি ভেবে দুধে সাদা মরিচ মিশিয়ে খেয়ে কেশে মরেন, কবে দড়ি ভেবে লাঠি দিয়ে বিছানা বাঁধতে গিয়েছিলেন···ইত্যাদি। আর আমরা সবাই

হেসে গড়িয়ে পড়তাম। কিন্তু সে তো গেল বছর দুই আগেকার কথা—যখন আমি স্কুলে পড়ি। কলেজে উঠে অবধি আমি পারুলির এ ধরনের ছেলেমানুষি হাসিঠাট্টায় আর কান দিতাম না। বলতাম ঃ "ওসব বাজে কথা রাখ। শোন সীরিয়স কথা—পলাশীর যুদ্ধ!" মুরুব্বিয়ানা সুরে বলতাম ওকে ক্লাইভ ও মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা। শুনে পারুলি ওর ডাগর চোখ আরো ডাগর করে বলত ঃ "অ্যাঁ! বলো কি অসিদা? মীরজাফর এমন শয়তান? মাগো!"

ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বইছে তখন। বলি ওকে বীর ভঙ্গীতে ঃ "তাই তো এই দশা আজ আমাদের। শোন নবীন সেন কী লিখছেন—মোহনলাল মীরজাফরকে ধিক্কার দিয়ে বলছে ঃ

"সেনাপতি! ছি ছি, একী! হা ধিক তোমায়!
কেমনে বলো না হায়
কাষ্ঠের পুত্তলী প্রায়
সুসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ একধারে।......"

পারুলির চোখ চিক চিক ক'রে উঠত ঃ "আহা রে! অমন বীর মোহনলাল– কি না মরে গেল!"

আমি উদ্দীপ্ত হয়ে বলতাম ঃ "বীরের মৃত্যু এমনিই হয়। আমিও চাই এই রকম মরতে—গা আমার সঙ্গে কাজীর গান—

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান—
আজি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান হে?"

পারুলি সত্রাসে আমার মুখ চেপে ধরত ঃ "অমন অলুক্ষুণে কথা বলতে আছে? আমার বুকের মধ্যে ফাঁসি শুনলেই গুর গুর করে ওঠে। লক্ষ্মীটি ভাই—আমাকে অমন করে মিথ্যে ভয় দেখিও না।"

কিন্তু ও তো বোঝে না—ওকে ভয় না দেখালে আমি নিজে বীর বনি কেমন করে?

পাঁচ

অসিত বলল : এ হেন পারুলি—যার চোখে ভয়ের আয়নায় আমি নিজের বীরকান্তি দেখে পৌরুষ গর্বে শিউরে উঠি—তাকে না বলেই বা বিবাগী হই কেমন করে? একটু আগুপিছু করে শেষটা হনহনিয়ে এগুলাম—চোখে পড়েছে যে, পারুলি ওদের বাড়ীর দোতলার গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল : "অসিদা! ও—অসিদা! কোথায় চলেছ এই ঠিক দুপুরে, শুনি?"

আমি চেঁচিয়ে বললাম : "বিবাগী হয়ে।"

পারুলি দুহাত নেড়ে আরো চেঁচিয়ে হাঁকল : "বিবাগী! ওমা! সে কি গো? শোনো শোনো অসিদা, লক্ষ্মীটি ভাই—তোমার দুটি পায়ে পড়ি—মাথা খাও।"

পারুলি তার ঠাকুমার কাছ থেকে শিখেছিল দিব্যি দেওয়ার আর্ট। মনটা খুশী হল বৈ কি, কিন্তু বিষম অনিচ্ছার ভান ক'রে ফিরলাম : "আঃ, কী মুশকিল!"

পারুলি নিচে ছুটে এসেই আমার হাত চেপে ধরল : "কী ব্যাপার অসিদা? বিবাগী—"

সব কথা খুলে বলতে রাগে ক্ষোভে আমার গলা ধরে এল। কেবল কিছুতেই বলতে পারলাম না তাকে মামাবাবুর চপেটাঘাতের কথা। আর তাইতেই হ'ল উল্টো উৎপত্তি—ওর কাছ থেকে দরদের বদলে পেলাম হাসিঠাট্টা। ও খিলখিলিয়ে হেসে বলল : "ওমা! এই মাত্তর! মামাবাবু একটু বকেছেন—তাই তুমি সন্নিসি হতে ছুটেছ—" বলে হেসে গড়িয়ে পড়ে—"আমি ভয়ে মরি—না জানি কী কুরুক্ষেত্তর বাধিয়েছ!"

আমি রেগে উঠে বললাম ঃ "কুরুক্ষেত্তর ?—মানে ?"

পারুলি আমার হাত ধরে বলল ঃ "ছি! রাগ করে না। মামাবাবু গুরুজন—কাকাবাবুও তো আমাকে কত বকেন ঘড়ি ঘড়ি। আর ঠাকুমা তো বকতে বকতে ভির্মি যান বললেই হয়। গুরুজনের বকুনিকে বলে আশীর্বাদ।"

আমি জ্বলে উঠে বললাম ঃ "গুরুজন—না গরুজন!"

পারুলি আমার হাত ধরে বলল ঃ "ছি ছি! অমন কথা বলতে আছে? দেশ উদ্ধার করতে হ'লে কত সইতে হয়—তুমিই তো সেদিন বলছিলে—না হয় একটু গুরুজনের দুটো বকুনিই সইলে।" রাগে আমার মুখে কথা ফুটল না—ও বলল মুখ টিপে হেসে ঃ "তাছাড়া তুমি যে শান্ত শিষ্ট ছেলেটি—সাত চড়েও মুখে রা-টি নেই! মামাবাবুর মুখের ওপর চোপা করো নি?—বলো তো বুকে হাত দিয়ে?"

আমি আর সইতে পারলাম না—এ যে গোদের উপর বিষফোড়া! ঝাঁকুনি দিয়ে ওর হাত থেকে হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললাম ঃ "ব্যস্। আর না। আমি বুঝেছি তুমি কী। ভালো লোকের কাছে আদর কাড়তে এসেছিলাম—চললাম—"

ও কেঁদে ফেলল, কিন্তু আমার মন একটুও নরম হ'ল না। কাঁদুক—কেঁদে কেঁদে যখন শেষে চোখ উঠবে তখন দেখা যাবে। এখন ওকে সাজা দেওয়াই চাই—নাকের জলে চোখের জলে ক'রে। মনে মনে এই ধরনের দারুণ শাপমণ্যি আওড়ে হু হু ক'রে নেমে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে বীর ভঙ্গীতে।

"লক্ষ্মীটি অসিদা—তোমার দুটি পায়ে পড়ি—যেও না—আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি সব কথা। আমার মাথা খাও—মরা মুখ দেখ—"

ওষুধ ধরেছে—রুষ্ট মনে উল্লাস জেগে উঠল। কিন্তু পাছে ও ছুটে নেমে আসে ভেবে দে দৌড়। রাস্তায় বেরিয়ে বারান্দার দিকে চেয়ে দেখি কি, পারুলি রেলিঙের উপর হাত রেখে জলভরা চোখে

আমার দিকে চেয়ে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা গঙ্গাবাগে চলা শুরু করলাম।

একটু পরে মাথা ঠাণ্ডা হতেই মনে হ'ল--যেন বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল রবিবাবুর শ্লোক—

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে।

আর যাবে কোথা? ঝিমিয়ে পড়া প্রতিহিংসার ভাঁটায় ফের বান ডেকে গেল পৌরুষের। চৌরঙ্গিমুখো এক বাস ধরলাম। হাতে ছিল মাত্র একটি সিকি ও দুটি দু আনি। একটি দু আনি ভাঙিয়ে চৌরঙ্গির টিকিট কাটলাম। চৌরঙ্গিতে পৌঁছে বেহালার ট্রাম নিলাম। আর একটি দু আনি দিলাম কণ্ডাকটরকে—"বেহালার টিকিট।"

ছয়

সোফিয়া (হেসে): রাগ বটে দাদা!

অসিত (হাসিমুখে): ছেলেবেলায় নিশুদার মুখে প্রায়ই শুনতাম—"রাগই পুরুষের লক্ষণ।" সেই ছিল আমার প্রথম গুরু যে।

বার্বারা: গুরু?

অসিত: একেবারে জলজ্যান্ত। আমার মাসতুত ভাই। তার কথা বলব আর একদিন—সে আর এক অঘটন যাকে বলে—নিশুদাকে আমার গুরুবরণ করা—যার উদ্ভব তর্কাতর্কি ও ঝগড়ায়।

সোফিয়া: ঝগড়া? মানে?

অসিত: ঝগড়া মানে যা তা-ই। আমার জীবনে এ যে কতবারই হয়েছে—ভেবেছি এক, হয়েছে আর। বিঁধেছে কাঁটা, ফুটেছে ফুল।

কিন্তু সে হবে কাল পরশু। আজ শোনো এই অঘটনের সূত্রপাত এক তান্ত্রিক জটাধারীর ব্যাকগ্রাউণ্ডে। কিন্তু তার আগে আর একটু কফি। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।

সাত

অসিত কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ফের ধরল ঃ

বেহালার শেষ প্রান্তে নেমে সোজা চলা শুরু করলাম দক্ষিণ মুখে —ডায়মণ্ডহারবারকে নিশানা করে। গঙ্গার উদার মোহানা আমার ভারি ভালো লাগত ছেলেবেলা থেকেই। মাঝে মাঝেই সে-শোভা দেখতে উধাও হতাম—কখনো দাত্থর মোটরে, কখনো বা সাইকেলে বন্ধুদের নিয়ে—কখনো বা পারুলি আর তার কাকাকে নিয়ে। পারুলি ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গা কী যে ভালোবাসত!

বার্বারা ঃ কিন্তু গঙ্গার মোহানার দিকে কেন ?

অসিত ঃ নয়ই বা কেন ? বিবাগী যখন হতেই হবে—যত দূর হয় ততই তো ভালো। তাছাড়া ডায়মণ্ডহারবারে আমার খোঁজ করার কথা কারুর মনে হবে না। সেখানে আমার এক দূর সম্পর্কের দিদি ছিলেন। ভাবলাম তাঁর কাছে গিয়েই আশ্রয় নেওয়া মন্দ কি ?

কিন্তু দিদির বাসা যে ছাই অনেক দূর! ও-অঞ্চলে না মেলে ট্যাক্সি, না কোনো রিকশ। এক বাস যায় কিন্তু অর্ধোদয় যোগ বলেই হোক বা যে কারণেই হোক প্রায় সব বাসই রওনা হয়েছে উত্তর মুখে -কলকাতার গঙ্গায়। ডায়মণ্ডহারবারের সাংঘাতিক গঙ্গায় স্নান করবার মতন বুকের পাটা আছে কজন বীর পুরুষের ?

দশ মাইল পথ। মরীয়া হয়ে চলেছি তো চলেইছি। বেলা তখন তুটো। মাঘ মাস হলেও সূর্যের তেজে ঘেমে উঠলাম চলতে চলতে। একবার ভাবলাম দূর হোক—ফিরি। কিন্তু তারপরেই

মনে হল—পারুলি হাসবে, বলবেঃ "কেমন?—বলি নি—রাগ পড়লেই ঘরের ছেলে গুটি গুটি ঘরে ফিরবে?" মনে হতেই ফের বীর্যের উদ্দীপনা উঠল জেগে। আমি দেখিয়ে দিতে চাই—যে আমি ঘরের ছেলে নই—বিবাগী হতেই জন্মেছি—"নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী"—বলত নিশুদা। অর্থাৎ খাঁচা ভেঙ্গে সিংহ বেরিয়ে পড়লে তাকে আর ঠেকায় কে? তাছাড়া মনে পড়ল নবীন সেনের উক্তিঃ "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"—শোনাতাম পারুলিকে উঠতে বসতে। এখন প্রতিজ্ঞা করে পেছুলে চলবে কেন? এম্‌নি করেই বুঝি নিয়তি গড়ে ওঠে, অহঙ্কারের কারসাজিতে। হায় রে!

যাই হোক চলা ছাড়া উপায় ছিল না—যান বাহন যখন নেই। আর যখন বাড়ীমুখো হওয়া চলবে না, তখন দিদির ওখানে গিয়ে উঠতেই হবে যেমন করে হোক। হয়ত একটা ফালতো বাস মিললেও মিলতে পারে। কিন্তু সেখানেও মুশকিল। বাস থামবে আর এক মাইল দূরে—তারপর ফের চলতেই তো হবে। কাজেই বাসের কথা না ভেবে চলাই পন্থা—সাত পাঁচ ভেবে এইই ঠিক হ'ল।

আট

কিন্তু চলব বললেই কি চলা যায়?—ঘণ্টা দুই চলে বিষম ঘেমে উঠেছি! তার উপর হঠাৎ রাস্তায় খোয়া! চলেছে তো চলেছেই!..আর চটি পায়ে খোয়ার উপর দিয়ে হাঁটা যায় কখনো? খুব রাগ হ'ল নিজেরই উপরে। বিবাগী হয়ে বেরুবার সময় পাম্প সু পরে বেরুতে কী হয়েছিল। কিন্তু তখন গতস্য শোচনা নাস্তি—The milk is spilt—কাজেই রুখে উঠে চললাম সেই খোয়ার উপর দিয়েই—যদিও সন্তর্পণে—পাছে অতর্কিতে পা মচকে যায়। তাহলেই

তো গেছি—এই বিদেশে বিভূঁয়ে! মধুসূদনকে ডাক দিয়ে চললাম গুটি গুটি।

আধঘন্টা পরে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, বিষম ক্ষিধে পেয়েছে। পকেটে 'সবে ধন নীলমণি' সিকিটি বার করে বাঁদিকে এক ময়রার দোকানে ঢুকতে রাস্তা পার হব, এমন সময় চমকে উঠলাম "স-সালা অন্ধা!" শব্দে। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে চাবুক পড়ল—শপাং! ফিটনের অভ্যুদয়ে লাফ দিয়ে ওদিকে পৌঁছলাম বটে, কিন্তু একটি খোয়ায় পা পিছলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম! চোখে অন্ধকার দেখবার সঙ্গে সঙ্গে কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করল উচ্ছল কলহাসি। উঠে দাঁড়াতেই দেখি—তিনটি ফ্রকপরা ইস্কুলের মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে কুটি কুটি। রেগে উঠে ধমকালাম "হাসছ যে!" তারা ভয় পেয়ে পাশের গলিতে দে চম্পট।

আমি চেয়ে দেখি হাঁটুর কাছে ধুতি ছিঁড়ে গেছে ও কনুয়ে রক্ত ঝরছে। পাশের ময়রার দোকানে একটি ছোট ছেলেও হেসে উঠল। আমি রেগে তাকে শাসাতে যাব এমন সময় সিকিটি হাত থেকে প'ড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে সোজা খোলা ড্রেনের মধ্যে ডুব দিল।

হা অদৃষ্ট! দুটো কচুরি সিঙাড়া কিনে খাব তারও উপায় রইল না। কী করা যায়? ফের পথচলা শুরু করলাম—'দিদির বাড়ী', 'দিদির বাড়ী' জপতে জপতে।

আরও আধঘন্টা চলার পর ক্লান্ত হয়ে ডানপাশের একটি আটচালার রোয়াকে সবে বসেছি একটু জিরুতে—এমন সময়ে—খট্‌ খট্‌ খট্‌—খড়ম পরে গৃহকর্তা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন গাইতে, গাইতে নাকী সুরে:

যঁত আছে দীন কেঁউ নয় হীন
দীন তরেঁ তুমি যবেঁ পাগঁল,
নেরেঁ বুকেঁ তুলেঁ অনাথেঁ নইলেঁ
নাম হবেঁ তোর রাঁম ছাগল।

শুভদৃষ্টি! দেখলাম বেশ নধর ভুঁড়ি, গায়ে লাল বালাপোষের নামাবলী। কপালে তিলক, গলায় তুলসীর মালা, মাথায় টিকী। কিন্তু অত ভক্তি তাঁর চ'টে গেল আমাকে দেখবামাত্র। বললেন ফের নাকী সুরেই ঃ

"কেঁ মশাই! আহাঁ অঁতিথি দ্যাবতাঁ—এলেন আমার দাঁওয়াটিকে ধম্মশালাঁ বাঁনাতে বুঁঝি? আঁসুন ঠাঁকুর আঁস্তাজ্ঞে হোঁক। তাঁমাক সেঁজে দেঁব কি?"

আমি তো অবাক্। এ-ধরনের অশ্রুতপূর্ব রসিকতায় অভ্যস্ত নই তো—ঠায় চেয়ে রইলাম। বুকের মধ্যে গুর গুর করছে। উঠব উঠব ভাবছি এমন সময় সুভদ্র ভক্তবিটেল বললেন নাক সিঁটকে ঃ "কী ঠাকুর। ঠুটোঁ তোঁ নও, বোঁবা বুঝি?" ব'লেই হাঁক দিয়ে ঃ "এই রেমো! রেমোরে! নচ্ছার পাঁজি—তামাক কঁই। মরেঁছিস নাকি? তাঁ না হয় সেই কঁথাটাই খুঁলে বঁল না। আঃ, হাঁড়ে ভুব্বো গঁজিয়ে গেঁল ডাঁকতে ডাঁকতে।"

সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভুর উদয়—হাঁটুর উপরে কাপড়, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, হাতে ছিলিম। বুঝলাম ইনিই রামচন্দ্র ওরফে রেমো—যাঁকে ডেকে পাওয়া যায় না। নাম করণে অন্ততঃ ভুল হয় নি।

নব আবির্ভাব বললেন হাঁপাতে হাঁপাতে ঃ "অমন ড্-ড্ ডাকতে নেই বাবু। একটু খ্-খ্—খ্যামা ঘেন্নাও তো করতে হয়। আমার তো দ্-দ্-দশটা হাত নেই। তাৎ-তাৎ-তাছাড়া তামাক ধৎ-ধৎ-ধরাবো কোত্থেকে। ট্-ট্-টিকেয় ইঁদুর ও কম্ম করে ভ্-ভ্-ভিজিয়ে দিয়েছে। ব্-ব্-বাতি জ্বালিয়ে তবে ট্-ট্-টিকে ধরাতে হল। এই নিন ছ্-ছ্-ছিলিম।"

বাবু ছিলিম লুপে নিয়ে বললেন মুখ ভেংচে ঃ "খ্-খ্-খুঁব কঁরিৎ কর্মা। কিন্তু এঁদিকে চেঁয়ে দেঁখবি কবেঁ শুনি। ঠাঁকুর অঁতিথি হয়ে এলেন যেঁ আমার চোঁদ্দপুরুষ উদ্ধার কঁরতে। ওঁকে আগেঁ জঁল খাবার দেঁ। তাঁর পঁরে তোঁ ছিলিম।"

রামচন্দ্রের আমার পরে চোখ পড়তেই মুখের ভাব বদ্‌লে গেল। চোস্ত হিন্দিতে বললেন মুখ খিঁচিয়েঃ "এই ব্-ব্-বেল্লিক! ম্-ম্-মজা হোতা, না? দ্-দ্-দাওয়া কি তুম্‌কো বাপ্‌কা ভ্-ভ্-ভিটা হয়—যে ব্-ব্-বস্‌তা? ভ্-ভ্-ভাগো বোলতা। ন্-ন্-নহি তো কুত্তা ল্-ল্-লেলায় দেঙ্গা।"

বাবু সোল্লাসে দোয়ার দিলেনঃ "ঠিক ঠিক। দেঁ তোঁ কুঁকুরটার শেঁকল খুঁলে।"

কুকুর লেলিয়ে অভ্যর্থনা! এ কোন মহাপ্রভুর ধর্মশালায় এসে পড়েছি রে বাবা! আমি চক্ষের নিমেষে দাওয়া থেকে লাফিয়ে পড়লাম মাটিতে। এদিক ওদিক তাকিয়ে কুকুরের কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে বুকে বল এল। বললাম উষ্ণ স্বরেঃ "আচ্ছা ধার্মিক তো! রোয়াকে একটু জিরুতে বসেছিলাম—"

ধর্মধ্বজ তিরছা হেসে বললেনঃ "ওরে আমার বাঁপের ঠাঁকুর রেঁ। আঁপনাদের মত ফাঁজিল ছেঁলেদের জন্যেই না আমার রোঁয়াক গঁড়া—গাঁটের কঁড়ি খঁর্চা কঁরে। এঁটা কি মেড়োর চঁটি না খিঁশ্চানের বেঞ্চি শুনি, যে যিনিই এঁদিকে হাঁওয়া খেঁতে আঁসবেন কাঁয়েম হয়ে বঁসবেন জিঁরুতে। এই সেঁদিন নতুন সিঁমেণ্ট দিঁয়েছি রাঁজ্যির ভ্যাগাবণ্ডদের জন্যে, না? দেঁ-দেঁ-দু আনা সিমেণ্ট খইয়ে দেঁবার জন্যে, নৈলেঁ পুঁলিশ ডাঁকব। না, পুঁলিশ না, কুঁকুর। —আঃ, রেমোটা ফেঁর গাঁয়েব হঁল—তা ঠাঁকুর জিঁরুতে চান জিঁরুবেন বৈঁকি। বসুন—আমি কুঁকুর নিয়ে এঁলাম বঁলে।"

বলেই ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও চম্পট। বিবাগী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।

নয়

তপতী নানা ব্যাখ্যা করে ওদের বুঝিয়ে দিতে দুই বোনের সে কী হাসি! শেষে বার্বারা বলল: "জানি দাদা, এ ভাবে হাসা আমাদের খুবই অন্যায়। আমাদের উচিত ছিল ব্যথা দিয়ে ব্যথা বুঝে অঝোরে চোখের জল ফেলা—"

তপতী বাধা দিয়ে বলল: "রক্ষে করো দিদি! কান্নার বোঝা আর সাধ করে বাড়িও না। তোমাদেরই এক বিদুষী লিখে গেছেন একটি লাখ কথার এককথা:

'Laugh and the world laughs with you.
Weep and you weep alone.
For the sad old earth must borrow its mirth,
But has trouble enough for its own.'*

তাই—" ব'লে অসিতের দিকে চেয়ে—"তোমার কান্নায় আমরা হাসলেও রাগ না ক'রে বলে যাও দাদা, কে তোমাকে কী ভাবে কাঁদিয়ে জগতের হাসির খরচ জোগালো।"

অসিত (হেসে): "ঠিক বলেছ। সাধে কি গভীর সত্যের আভাস দিতে মুনি-ঋষিরা ঘড়ি ঘড়ি প্যারাডক্সের অবতারণা করতেন? এই দেখ না কেন, সে সময়ে যে বিড়ম্বনায় আমাকে চোখের জল ফেলতে হয়েছিল পরে বহুবারই কি সে কথা মনে করে মুখে আমার হাসি ফোটে নি? তাই শোনো।"

---

* হাসো যদি তুমি হাসিবে জগত সাথে তোমার,
কাঁদো যদি হবে কাঁদিতে একাই ভাই।
যুগে যুগে ম্লান ধরা হাসি-ঋণ চায় উধার,
দুঃখ ব্যথার অভাব তো কারো নাই।

কনুই ছ'ড়ে রক্ত ঝরছে। সিকি গড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গেছে। যাকে তোমরা বলো derelict অবস্থা। এমন কি, বাসে ক'রে ফেরবারও ছাই পথ নাই। পকেট হাতড়ে বেরুল হুটি হু আনির ভাংতি চারটি পয়সা—একুনে। পাশের দোকান থেকে হু পয়সার মুড়ি আর হু পয়সার বাতাসা কিনে রাস্তার কল থেকে এক পেট জল খেয়ে একটু সুস্থ বোধ করলাম।

কিন্তু এখন কী করা যায়? পারুলিটা নিশ্চয় মামাবাবুকে সব খবর পাঠিয়েছে। তিনি নিশ্চয় পুলিশে খবর দিয়েছেন। দাহু এতক্ষণে ফিরে নিশ্চয় তাঁকে বকেছেন। সব চেয়ে মনে পুলক জাগল ভাবতে যে, দিদিমার কাছে বকুনি খেয়ে মামাবাবুর নিশ্চয় কাল মুখ চুন হয়ে যাবে, এরূপ ক্ষেত্রে সাত তাড়াতাড়ি ফেরা কিছু নয়! কলেজে উঠেই নেপোলিয়নের এক জীবনীতে পড়েছিলাম তাঁর strategy-র গুণগান। আমাকেও দিতে হবে সেই চাল—অন্ততঃ মামাবাবুকে কিস্তি দিতে। হোক না বোড়ের চাল, কিশোরের কিস্তিও তো কিস্তিই বটে। এবার মামাবাবুকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যে, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন তিনি আমাকে শাসাতে না ভরসা পান।

কিন্তু সমস্যা হ'ল—যাই কোথায় এখন? এখানে কোনো একটা ধর্মশালা খুঁজে পাব না কি আর? কিম্বা কোনো একটা আশ্রম-টাশ্রম? সবাই তো আর ভক্তবিটেল নয় যে অতিথি দেখলে কুকুর লেলিয়ে দেবে! না হয় একটা রাত ক্ষিধেয় কাটালাম। মামাবাবু তো জব্দ হবেন। তার জন্যে একটা রাতের কেন—ত্রিরাত্রি উপবাসও সার্থক।

কাছে একটা মরা গাছের গুঁড়ি দেখে তার উপর বসে ভাবছি আথাল-পাথাল: To go or not to go that is the question—আর কি, বুঝলে না? এমন সময়ে চমকে উঠলাম: সামনেই একটি বাস থেমেছে—টার্মিনাসের সামনে। তার মধ্যে থেকে এক

মোটাসোটা টেকো মাড়োয়ারী চেঁচিয়ে ডাকছে: "আরে ও কুলি ভেইয়া! আইসো না। এক আনি দিব। এই মোটটা উৎরাওনা —জল্‌দি আইসো।"

আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি—কুলি কোথায়! ওমা, ফের তার চোখে চোখ পড়তেই শিউরে উঠলাম লজ্জায়—অপমানে! বেল্লিকটা যে আমাকেই কুলি ভেবে ডাক ছাড়ছে: "ও বাচ্চা ভেইয়া! আইসো না জল্‌দি। আচ্ছা দুআনি দিব। ভাগকে আইসো।"

মনে হ'ল মা বসুন্ধরা দ্বিধা হও, আমি নিরুদ্দেশ হই। বিখ্যাত ডাক্তার অতুল্য লাহিড়ীর নাতি, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা অমূল্য লাহিড়ীর ভাগনে আমি—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে হ্যামলেট পড়ি—আমাকে কিনা মোট বইতে বলে! আমি উঠে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে আহ্বান-কর্তাকে ধম্‌কাতে যাব এমন সময়ে, বাসের কণ্ডাকটর বলল হেসে: "এসো না বাচ্চা! ঐ সামনের গলি—মোটটা তুলে নাও—বাস আর কতক্ষণ দাঁড়াবে?" মাড়োয়ারী প্রভুও সঙ্গে সঙ্গে দোয়ার দিলেন ফের: "আইসো না বাচ্চা—আচ্ছা একটা সিকিই দিব। মরদকি বাৎ হাতীকি দাঁত। আইসো।"

আমি তাকে অগ্নিদৃষ্টিতে ভস্ম করে দিতে না পেরে চোখ ফিরিয়ে নিতেই চোখে পড়ল ওপারে একটি দোকানের দেয়ালে লেখা: "আসুন। আপনাদের চির পরিচিত পরাণ পোদ্দারের উচ্চাঙ্গের চা —এক আনা, আলুর চপ—দু আনা। তেলে ভাজা—দু পয়সা।"

আত্মাভিমান কুলীনের হ'লে কি হয়—শরীর তো রক্তমাংসের—কত সয়? মোট নামিয়ে নিলাম। মাড়োয়ারী হাত মুখ নেড়ে বললেন: "সাবাস বেটা—হাঁ হাঁ—ঐ গলি—সামনের ঐ লাল বাড়ী। ইকরার করেছি যখন দিবই দিব সিকি। চল বাচ্চা! লেকিন দেখিস মোট গিরা দিস নাই।"

উঃ! কী দারুণ ভারি! হাঁপিয়ে পড়লাম, দুমিনিটেই।

দশ

যাকে বলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাওয়া—তোমাদের খ্রীষ্টদেবের ভাষায়ঃ in the sweat of thy brow shalt thou eat thy bread! কেউ তো দেখতে পায় নি—ভয় কাকে? শুধু পারুলি জানতে না পারলেই হ'ল যে, আমি মোট বয়ে অন্নসংস্থান করেছি।

এক আনায় এক পেয়ালা চা, দুআনায় একটি গোটা আলুর চপ, বাকি এক আনায় দুটো টাটকা তেলে ভাজা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওকালতি শুরু হ'ল মনে মনেইঃ মোট নামিয়েছি তো কি হয়েছে? রেল স্টেশনে সাক্ষাৎ বিদ্যাসাগর এক বাঙালী বাবুর পোর্টম্যান্টো নামিয়ে নেন নি কি?

Dignity of labour- পড়েছিলাম কি একটা বইয়ে। তাতে লিখেছিলো যে, এডিসন যে এডিসন—তিনিও একদা রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজ ফিরি করতেন। এরি তো নাম নিজের পায়ে দাঁড়ানো। কেবল পারুলিটা না জানতে পারে।

ফের পথচলা শুরু করেছি - দিদির বাড়ী আরো সাত মাইল। হোক না। না হয় দুঘণ্টাই লাগবে। লাগুক। উপায় কি?

মরীয়া হয়ে চলেছি মালকোঁচা বেঁধে এমন সময় হঠাৎ পাশের গলি থেকে এক বিপুল জনসংঘ এসে মিশল ডায়মণ্ডহারবার রোডে। কী গর্জন—বলো হরি হরি বোল! আমাদের দেশে কেউ মারা গেলে লোকে এই ভাবে গর্জন করতে করতে খাটিয়ায় করে শবকে নিয়ে যায় শ্মশানে দাহ করতে। ভারী বিশ্রী!

প্রথমে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল বৈ কি কিন্তু তার পরে ভিড়ের মাঝে পড়তেই কৌতূহল এসে ভয়কে হটিয়ে দিল। দেখি কি,

খাটিয়া তো নয়—ফুলের পাহাড়! এত ফুল—কে ইনি?—শুধালাম সাগ্রহে এক প্রবীণ টিকীধারীকে।

তাঁর চোখ দুটি জ্ব'লে উঠল ভর্ৎসনায়। বললেন: "কী হে ছোকরা? জানো না? খোদ প্রভুপাদ সর্বতারণ জ্ঞান ভাস্কর। ঘোর কলি! আহা—তাই তো প্রভু—ওর নাম কি—দেহ রক্ষা করলেন।" বলে নামাবলী দিয়ে চোখ মুছলেন। আমি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম: "প্রভুর নামটি কি শুনতে পাই না?" টিকীধারী গর্জে উঠলেন: "নাম? তাঁর কি একটা নাম রে! দীনদয়াল, পতিতপাবন, অধমতারণ, জগৎগুরু, শ্রীশ্রী শ্রীশ্রী একশো আটটার পর ভবভয়ভঞ্জন পরমহংস কলির কল্কি—যিনি গীতায়—ওর নাম কি—গেয়েছিলেন 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ইনিই। সেই কৃষ্ণচন্দ্রই এসেছিলেন আমাদের উদ্ধার করতে—ওর নাম কি—দুকড়ি তর্কচঞ্চুর কুলতিলকের ছদ্মবেশে।"

এত দুঃখেও হাসি এল, যদিও তাতে ভয়ের মিশেল ছিল। ভক্ত-বিটেলের কাণ্ড ভোলা যায় কি। ইনিও তো সেই জাতের লোক। কাজেই হাসি চেপে সসম্ভ্রমেই শুধালাম: "তা, বয়স কত হয়েছিল ১০৮-শ্রী কুলতিলকের?"

টিকীধারী বললেন: "বয়স? যুগাবতারদের কি বয়স আছে? তাঁরা—ওর নাম কি—অজ যে।"

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম: "বলেন কি! মৎস্য কূর্ম বরাহ অবতার শুনেছি, কিন্তু ছাগল অবতারের কথা তো শুনি নি!"

টিকীধারী হুঙ্কার দিয়ে বললেন: "কে হে তুমি ডেঁপো ছেলে? ছাগল! না প্রভু আমাদের সে অজ নয়—অজ মানে যিনি—ওর নাম কি—জন্মান নি।"

আমি এবার অথই জলে পড়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "কিন্তু যিনি জন্মান নি তিনি মলেন কেমন করে?"

টিকীধারী এবার রাগ করলেন না, মৃদুহেসে বললেন: "মরেন নি তো, ওর নাম কি—তনুত্যাগ করেছেন মাত্র।"

আমি আরো সসম্ভ্রমে শুধালাম: "কী অসুখে তনু গেল?"

টিকীধারী মুহূর্তে ফের নরম থেকে গরম হয়ে উঠে বললেন: "কে হে ছোকরা! মুখ সামলে! অসুখে মরবেন কিনা আমাদের অমর ঠাকুর! অবশ্য তাঁর—ওর নাম কি—পিলেতে অস্ত্রোপ্রচার হয়েছিল বটে, কিন্তু সে তো শুধু ডাক্তারদের মান বাড়াতে। তিনি যে ইচ্ছা-মৃত্যু, দেহরক্ষা করলেন শুধু—ওর নাম কি—নরলীলার পোষ্টাই করতে?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম: "ইচ্ছামৃত্যু—মহাভারতে পড়েছি, —না কি ভীষ্মের ছিল। কিন্তু সে তো দ্বাপর যুগে। এ-যুগেও কেউ ইচ্ছামৃত্যু হতে পারেন কি সত্যি সত্যি? মানে একশো আটটা শ্রীপ্রভুপাদ শর্মা কি সত্যিই ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন?"

টিকীধারী গোল গোল চোখ পাকিয়ে বললেন: "ইচ্ছামৃত্যু নয়ত কী? একশো বার ইচ্ছামৃত্যু, হাজারবার ইচ্ছামৃত্যু—লক্ষবার ইচ্ছামৃত্যু। যিনি গোব্রাহ্মণ-হিতায় জন্মেছিলেন এ-ঘোর কলিযুগে জেনেশুনে—যে, লোকে তাঁর মহিমা বুঝবে না। যিনি—ওর নাম কি—হাঁচি-টিকটিকির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করে বিচারে ম্লেচ্ছ পণ্ডিতদের তুলোধুনে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, যিনি বেদান্ত গুলে খেয়ে কৃতান্তকে বলতেন, খবর্দার! যিনি জীবনে কোনোদিন—ওর নাম কি—কলের জল খান নি! গঙ্গাজলে ছাড়া স্নান করেন নি! যিনি বাংলার মাথার মণি, ভারতের কাঞ্চনজঙ্ঘা, বিশ্বের জগৎগুরু—তিনি রোগে পটকে যেতে পারেন এমন কথা উচ্চারণ করতে তোর মুখে বাধল না রে পাষণ্ড? ধিক্ এই পাপেই তো আমরা—আমরা—ওর নাম কি—যাচ্ছেতাই হয়ে গেলাম।"

তাঁর পাশের একটি পুষ্টকায় ভক্ত ব'লে বসল: "ভট্চাজ,

কেন মিথ্যে ব'কে মরছ এ ফোক্কড়টার সঙ্গে ? মাথায় ছুটো গাঁট্টা দিয়ে বলো ভেসে পড়তে।"

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এবার কী সাপ বেরুলো ? জ্ঞানার্থী ভোল বদলে গঙ্গার্থী হয়ে "ভেসে পড়লাম"—ছুটি লাল পাগড়ির পানে। দেখাই যাক না ব্যাপারটা—ইচ্ছামৃত্যু প্রভুপাদ চিতায় কি ভাবে জ্বলে ছাই হন তারও তো অন্ততঃ একটা চাক্ষুষ খবর পাওয়া যাবে।

ওরা সবাই চলেছিল উত্তর মুখে। নিমতলায় দাহ করবে প্রভুপাদকে—বলল লাল পাগড়ি। যাওয়াই যাক না নিমতলায় একবার। মন্দ কি ? একলা চলতে আর ভাল লাগছিল না। তাছাড়া ভিড়ের তো শুধু টানই নয়, হরির লুটের ভরসাও আছে কিছু।

•

এগারো

নিমতলার ঘাটে যখন পেঁাছলাম তখন রাত প্রায় ন-টা। জগদ্‌গুরু যুগাবতারের ভক্তবৃন্দ ফুল ছড়িয়ে, জিলিপির হরির লুট বিলিয়ে, অজস্র আধলা বিতরণ করে, আশেপাশের হাঁ-করা লোকদের ধাক্কা দিয়ে, নাচানাচি ক'রে, দাহ ও কীর্তন সমাপনান্তে যখন বাড়ী-মুখো হলেন তখন কোন একটা থামের ঘড়িতে ঠং ঠং করে দশটা বাজল। ততক্ষণ জঠরের অগ্নিদেব ফের জ্ব'লে উঠেছেন—এমন সময় চোখে পড়ল পাশে একটা ঠোঙা। খুলে দেখি পাঁচ ছ'টা জিলিপি। কে ফেলে গেছে। ছেলেবেলা থেকে কৃষ্ণ ঠাকুরকে কল্পতরু ব'লে মেনে নিয়েছি তো—তিনি অকিঞ্চন বুভুক্ষুকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দেবেন না—এ কখনও হয় ?

জিলিপি-যোগের শেষে সামনের গঙ্গাজল থেকে করপাত্রে জলপান ক'রে ধড়ে প্রাণ এল। কিন্তু অতঃপর কী করা যায় ভাবছি

—শেষটায় কি পুনঃমূষিক হয়ে ফিরতেই হবে নাকি ?—এমন সময় ইনি আবার কোন্ নব মহাপ্রভু ? নিমতলার ঘাটের এক কোণ সরগরম হ'য়ে উঠল—এক অভিনব আবির্ভাবে : এক বিরাট জটাধারী ভুঁড়িওয়ালা সাধু গুটি গুটি এসে বসলেন একটি চিতার পাশে। দেহটির কোমরে তখনো আগুন জ্বলছে—বোধ হয় ঘণ্টা দুয়েক আগে চিতায় বসানো হয়েছিল। জটাধারীর পিছন পিছন করজোড়ে এলেন তাঁর ডজন খানেক সাঙ্গপাঙ্গ। তিনি একটি বাঘছালে আসন নিতেই তাঁরা সামনে বসলেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ঠেশাঠেশি ক'রে। জটাধারী আসনে আসীন হয়ে তাঁর বিশাল ভুঁড়ি চাপড়ে বললেন : "কঁহা ?"

এক টিকীধারী সশব্যস্ত হয়ে এক সরায় ক'রে তাঁর সামনে ধরলেন লুচি ও পায়েস। জটাধারী লুচি পায়েস সেবা করে গাল বাজিয়ে ফের বললেন : "কঁহা ?"

সঙ্গে সঙ্গে আর এক তিলকধারী একটি ভাঁড়ে বোতল থেকে কারণ বারি ঢেলে ধরলেন তাঁর সামনে : "এই যে প্রভু !" জটাধারী তাঁর আনত মস্তকে চাঁটি মেরে আশীর্বাদ করলেন : "জীতা রহো বেটা !"

সোৎসাহে তিলকধারী করজোড়ে গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন : "আহা সেই, নিদেন কালে হেঁই গুরুজি হোয়ো হে সদয় !

যেদিন, যমের দূতে টিকি আমার ধরবেই নিশ্চয়
সেদিন, তোমার নায়েব পাঠিয়ে
যমের, পেয়াদাদের ভাগিয়ে
কৃপার, কারণ বারি ছিটিয়ে প্রাণে জাগিয়ো হে অভয়।
বিনা, তুমি কেই-বা করতে পারে নয়কে বলো হয় ?
বলি তাই, নিদেন কালে হেঁই গুরুজি, হোয়ো হে সদয়।

বলুন গুরুজি কেমন গান বেঁধেছি ! হুঁ হুঁ !"

জটাধারী খুশী হয়ে ফের তার মাথায় চাঁটি মেরে বললেন : "বহুৎ

আচ্ছা বেটা, নয় কে হয় তো করতেই হোবে। নহি তো কৃপা কেয়া? মগর আঁখর কহাঁ? ভুল গিয়া?"

তিলকধারী পুলকিত হয়ে বললেন: "আপনার কৃপায় কি ভুল হবার জো আছে গুরুজি? আমি যে কবির লড়াইয়ে ছড়া কাটতাম।" ব'লেই একটু গুনগুন করে ধরে দিলেন আঁখর:

"প্রভু কৃপা তোমার কী যে,
আমি টের আজ পেয়েছি যে,
নৈলে আমায় কি আর পুষ্যি নিতো বুড়ো জমিদার!
আহা, আর নেবার পরেই ফুঁকত শিঙে, বটিকায় তোমার।"

সঙ্গে সঙ্গে কৃপাধন্য সাথী ভক্তেরা দোয়ার দেয়:

"হায় হায় কৃপা তোমার কী যে,
আমরা জান্তে পেরেছি যে·····"

কৃপাকীর্তন থামলে জটাধারী ফের গাল বাজিয়ে বললেন: "ব্যোম্ ভোলা! জীতা রহো বাপধন সব! তোদের হোবে—হোবে। গুরুকী কৃপায় জিসকা বিস্‌ওয়াস হৈ উসকা হোবেই হোবে। সব বুলি ঠিক হোয়েসে। তাই তো আমি তোদের ঘড়ি ঘড়ি বলি কি— ঐসাই ভজনানন্দের সাথে কারণানন্দ ঔর গঞ্জিকানন্দ এই ত্রিবেণী সঙ্গমে ডুব দিতে না দিতে নৈয়া পার হোবে গুরু কৃপাসে। হোবেই হোবে। তাই বেদ পুরাণ সব কোই বোলেসে—গুরু বিনা গতি নাহিরে নাহি। জব হামি কৃপা করিয়েসে, তখন ভয় পালিয়েসে জানবি। লে বেটা লে, ঔর এক ছিলিম ফুঁকে লে।" বলেই পাশের এক নামাবলীধারীকে হাঁকলেন: "এই! তু কাহে চুপসে বৈঠা হায়? গাও—গাঁজা পীকে গাঁজাকা ভজন গাও।"

"যে আজ্ঞে, গুরুজি"—বলে নামাবলীধারী মহানন্দে গুরুদত্ত ছিলিমে আপ্রাণ টান দিয়ে গেয়ে উঠলেন:

"আহা গঙ্গায় স্নান, তারি জলপান।
যেই করে গুরু, সে-ই ভাগ্যবান্।

বোম্! গুরুদত্ত গাঁজা করে আরো তাজা
ব্রহ্মজ্ঞানের পয়লা সোপান।"

জটাধারী "ব্যস ব্যস" ব'লেই তার হাত থেকে ছিলিমটি ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে তারস্বরে গেয়ে উঠলেন :

"অজ্ঞানান্ধান্ ত্রাহি মাতর্গঞ্জিকে করুণাস্মিতে!
ত্বামেব যে প্রপদ্যন্তে জীবন্মুক্তা ভবন্তি তে।"*

গুরুজি গঞ্জিকাদেবীর কৃপায় জীবন্মুক্ত হোন বা না হোন উদারধর্মী মানতেই হবে। কারণ তাঁর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে দেখলাম শুধু টিকী-তিলক-নামাবলীধারী বাঙালীই নয়, লুঙ্গিপরা মাদ্রাজিও আছে, গেঞ্জি গায়ে ভোজপুরীও আছে, একজন লালটুপি মারাঠিও চোখে পড়ল। কেবল ওদের মধ্যে এক নিরুপাধি উৎকলবাসীকে চিনতে পারি নি দূর থেকে। কিন্তু গুরুদত্ত গঞ্জিকামাতাই হোক বা কারণ বারিই হোক সেবন করতে না করতে তিনি 'তাজা' হয়ে উঠে ধরলেন নিজমূর্তি, গাইলেন উড়িয়া ভক্তি সঙ্গীত—গোপীরা বকছে কালাচাঁদকে :

"তূ লাগি গোপ্—অ—দণ্ড মোনারে কালিয়া সোনা!
দধি দুধ্—অ—সর্— অ খাওরে কালিয়া
দধি—দুধ্—অ—সর্—অ খাও
(আর) কৌড়ি মাগিলে অম্‌নি কালিয়া মুরলী বাজাও
রে কালিয়া সোনা!"

তখন আমি ছেলেমানুষ তো—যাকে তোমরা বলো teen-age —এমন রংদার গান শুনে মন খুশী হয়ে উঠল মুহূর্তে। শ্মশান-মশান সব ভুলে ঝোঁকের মাথায় এগিয়ে এসে ব'সে গেলাম তোফা গুরুজির ভক্তচক্রে। আমাকে দেখে সেই উৎকলবাসী সাদরে

---

* অবোধে কোরো মা গাঁজা, ত্রাণ কৃপা হেসে তবে :
তোমার শরণাগত জীবন্মুক্ত হবে হবে।

বললেন ঃ "আসুন আসুন।" তাঁরা সবাই তখন রঙে ছিলেন তো, কাজেই বসুধৈব কুটুম্বকম্ অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে সেই গঙ্গা ও গাঁজার সমান ভক্ত নামাবলীধারী ধরলেন ঃ

"ডুব দে রে মন যখন তখন
কারণ বারির তারণ জলে।
কে ভবে কার? কাট্ না সাঁতার
লালপানিতে দুর্গা ব'লে।"

গানটি সে মজাদার কীর্তনের সুরে গাইতে আমার মন আরো খুশী হ'য়ে উঠল। ফুরতি দেখে ফুরতি জাগল ঃ সরাসর ওদের সঙ্গে দোয়ার দেওয়া শুরু করলাম। গানপাগল মানুষ কি গান শুনলে আগুপাছু ভেবে চলে? তাছাড়া রসচক্রে ব'সে রসভঙ্গ করতে নেই। এ-হাতেখড়ি তো পিতৃদেবের নানা আসরে দশ বৎসর বয়সেই হয়েছিল। ভগবান আমাকে আর কিছু দিন বা না দিন সুকণ্ঠ দিয়েছিলেন। তার উপর ছেলেবেলা থেকেই ওস্তাদি ট্রেনিং—যাকে বলে সাধা গলা। ওরা আমার কলকণ্ঠ শুনে সত্যিই চমকে গেল বিশেষ ক'রে গুরুজি। আমি সুর ধরতে না ধরতে তিনি সমজদারী মাথা নাড়া শুরু ক'রে দিলেন নিজেও মাঝে মাঝে দোয়ার দিতে দিতে। গুরুজি রসিক, মানতেই হবে ঃ গান শেষ হ'তেই শালপ্রাংশু লম্বা হাত বাড়িয়ে আমার পিঠ চাপ্ড়ে বললেন ঃ "বহুৎ আচ্ছা! ভৈয়া! তুম্ ওস্তাদকা লড়কা, ক্যা? জীতা রহো।"

যেই বলা, অমনি সবারই আমার ওপরে চোখ পড়া, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার উৎসাহ চুপসে যাওয়া—ফুটো ফুটবলের মতন। মনে পড়ল তখন আমাদের ঘরোয়া প্রবচন ঃ "সাধ করে খেয়েছ কচু, এখন তেঁতুল কোথায় পাবে বলো?" কিন্তু তখন যাকে তোমরা বলো "টু লেট।" দম্কা খুশীর উচ্ছ্বাসের কর্মফল ফলল বৈকি। তিলকধারী বসেছিলেন আমার বাঁ পাশেই, দিব্যি মৌজে ছিলেন! বললেন জড়িত স্বরে ঃ "গুরুজির কথা কি আর ভুল হবার জো

আছে রে দাদা! তুই একেবারে জাতসাপ—যাকে বলে। ধর্—ধর্ একটা ঠুংরি দাদা, আমি শুনে মশগুল্ হয়ে বাড়ী চ'লে যাই—ছাড়ছি নি আর তোকে রে শালা! আহা, এমন মাল!"

মাতালদের মজলিশে ঠুংরি! বিশেষ যাদের দাদা মুহূর্তে শালা হয়ে যায়! ভাবতেও শিউরে উঠলাম। মামাবাবু জানতে পারলে কি আর রক্ষে রাখবেন? কে জানে?—এসব কুকীর্তির গুজব যে স্ফুলিঙ্গের মতনই হাওয়ার পাখায় শনশনিয়ে পেঁছিয় বারুদের গোলাঘরে। কিন্তু এসব উড়ো চিন্তার ডানা মেলায় বাধা পড়ল আচম্কা অপ্রত্যাশিত ভাবে। গুরুজি অভয় হেসে বললেন: "বেটা, কুছ্ চিন্তা নেহি। তেরা মামাবাবুকো ডর ক্যা? হম হৈঁ—খুদ্ গুরুজি। মামাবাবু ক্যা করেগা? বোম্ ভোলা!"

আমি তো অবাক্। নিশুদার কাছে যদিও শুনেছিলাম যে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীরা অপরের মনের কথা পড়তে পারে—যাকে বলে সিদ্ধাই। কিন্তু শোনাকথা আর চাক্ষুষ করার মধ্যে তফাৎ যে আসমানজমীন। তাছাড়া নাবালকের মন তো—যাকে একটু আগেই ভেবেছিলাম বুজরুক তাকে এখন মনে হ'ল—মহাপুরুষ না হোক নিতান্ত কেউ কেটা নয়। কিন্তু সম্ভ্রম আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে কৌতূহলও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বৈকি, বললাম: "নমস্তে গুরুজি, মগর—মুশকিল—"

জটাধারী একগাল হেসে বললেন: "মুস্কিল ক্যা রে—জব মুস্কিল আসান মৌজুদ হৈ? কালীমাঈকি কিরপা হৈ তেরা শিরপড়—ইধর আ!"

কী সর্বনাশ! আরো কাছে ডাকে যে! ভয় খেয়ে এগিয়ে যাব না মানে মানে চম্পট দেব ভাবছি, এমন সময় তিলকধারী হেঁচে হেসে বললেন জড়িত স্বরে: "তোর কপাল খুলেছে রে শালা! স্বয়ং গুরুজির কিরপা হয়েছে তোর ওপর। তিনি আমাদের ঘড়ি ঘড়ি বলেন: 'উধর যা।' 'ইধর আ' শুনলাম এই প্রথম তাঁর শ্রীমুখে। যা যা

এগিয়ে বুক ফুলিয়ে চুল দুলিয়ে মন ভুলিয়ে—গুরুজি সাক্ষাৎ কল্পতরু, কী না দিতে পারেন তাঁর আশীর্বাদে। যা না—"

সঙ্গে সঙ্গে আমার ডানপাশ থেকে নামাবলীধারী ও পিছন থেকে উৎকলবাসী "গুরুজিকি জয়!" ব'লে আমাকে ঠেলে পেশ করলেন সটাং গুরুজির পায়ের কাছে। তিনি সুধামাখা হাসি হেসে বললেন : "আরে বেকুফ! ডর ক্যা? দেখ্"—বলেই মাটি থেকে একমুঠো ধূলো নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন : "ব্যস, লে।" আমি হাত মুঠো করতেই বললেন :—"অব খা লে—সিউজিকা প্রসাদ। খা লে!"

ওমা! শ্মশানের নোংরা ধূলোমাটি খাব কি? জুগুপ্সায় আমার শরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠল, বললাম সভয়ে : মাফ কর না গুরুজি। মিট্টি—মানে—হম্—হম্—"

তিনি হো হো করে হেসে বললেন : "আরে মূরখ্! হম্ হম্ ক্যা? খা কে তো দেখ্! মিট্টি কহাঁ? সির্ফ সক্কর, সক্কর—চিনি।"

বলে কি? পাগল না কি? স্বচক্ষে দেখলাম—তুলল মাটি থেকে কালো ধূলো—বলছে চিনি—সক্কর! কিন্তু তারপরেই ফিরে হাতের দিকে চাইতেই একেবারে হতভম্ব! তাই তো! মুঠোর মধ্যে করে কালো ধূলোমাটি কখন হয়ে গেল সাদা চিনি!!

সোফিয়া : বলেন কি দাদা!

বার্বারা : এ আর আশ্চর্য কি সোফি? হাতের কস্‌রৎ—

অসিত : আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম—বুজরুক বাজিকর মতলব করে যোগী গুরুজি সেজেছে। কিন্তু জিভে ঠেকাতেই গায়ে কাঁটা দিল। চমৎকার চিনি, তার উপর কর্পূরের সুগন্ধ! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল তাঁর মনের কথা জানতে পারা—যাকে তোমরা বলো টেলিপ্যাথি। কিন্তু তারপরেই ফের যেন দম্‌কা হাওয়ায়-উড়ে-আসা মেঘের মতন সংশয়ে শ্রদ্ধার আলো ঝাপসা হ'য়ে এল। কিন্তু সাহেবের লেখায় পড়েছিলাম—বুজরুকেরা নানা বিদ্যায় পটু হয়—কেন না

এই-ই তাদের স্টক-ইন্-ট্রেড। যে-ই ভাবা অম্‌নি গুরুজি ফের এক-গাল হেসে ব'লে বসলেন টুপ্ করেঃ "আরে, সাব লোগ ফিরিঙ্গি হৈঁ—নাসমঝ—অন্‌জান—অন্‌জান্। আচ্ছা—তু উঠা লে মিট্টি।" আমার বুকের পাঁজরায় তখন রক্ত হাতুড়ি ঠুকছে। আমি মাটি থেকে একটু কালো ধূলোমাটি কুরে তুলে নিতেই গুরুজি জটা দুলিয়ে হেসে বললেনঃ "ব্যোম্ ভোলা—ওঁ প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।" ব'লে আমার কব্জি ধ'রে নাড়া দিয়ে কী একটা হ্রী ক্লিং ফট্ ফুশমন্তর আওড়ালেন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেনঃ "লে বেটা, দেখ, ক্যা হো গিয়া সিউজিকা খেল!"

মুঠো খুলে দেখি—এবার বেগুনী রঙের দানাদার চিনি—ভায়োলেট রঙের—ক্রিস্টালাইজ।

বার্বারাঃ বলেন কি দাদা!

অসিতঃ আর বলি কি? তপতীর সমাধি অবস্থায় এর চেয়েও আশ্চর্য অঘটন দেখেছি—যদিও সে সব অন্য থাকের অঘটন। এ-জাতের Occult শক্তির খেলা নয়, Spiritual লীলার প্রকাশ। কিন্তু এ সবই ফুটে ওঠে যোগবিভূতির মাধ্যমে। (হেসে) তোমাদের সাহেব পণ্ডিতরা যাকে নাম দেন অটোসাজেস্‌চন, হিপ্‌নটিসম্ আরো কত কী! কিন্তু গুরুজির মাটিকে চিনি করার মধ্যে হিপ্‌নটিস্‌মের কারসাজি ছিল না মোটেই। কারণ সে-চিনি আমি আমার রুমালে মুড়ে পকেটে ক'রে নিয়ে এসেছিলাম—পরে পারুলিকে অবাক্ ক'রে দিয়েছিলাম চাখ্‌তে দিয়ে। সে সব শুনে তো থ। চোখ বড় বড় ক'রে বলেছিলঃ "এ যে হালুয়ার মতন খেতে অসিদা! অথচ হালুয়া তো কই বেগনি রঙের হয় না।" কাজেই বুঝতে পারছ—গুরুজি আমাকে অন্ততঃ হিপনটাইজ ক'রে বেকুফ করেন নি।

সোফিয়া (রুদ্ধশ্বাসে): আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে দাদা। যোগ-বিভূতিকে মেনে নিচ্ছি। আপনি বলুন। তারপর কী হ'ল?

অসিত ঃ "তারপর আর কি ? যাকে তোমরা বলো halleluja ! গুরুজির ভক্তবৃন্দ উজিয়ে উঠে ধরে দিল নামকীর্তন ঃ "জয় গুরুজি, জয় শিব, তারা ! জয় কালী, জয় ভবদারা !"…ইত্যাদি

দেখতে দেখতে সে কী কাণ্ড ! কোনোদিন কি ভুলব ? একে একে তারা উঠে গুরুজিকে প্রদক্ষিণ করে পর পর এসে আমার মাথায় চাঁটি মেরে বলে ঃ "সাবাস জোয়ান, কেয়াবাৎ, ধন্য হো" ।…ইত্যাদি আর আমি আরো যেন বোকা ব'নে যাই। এ কি ! স্বপ্ন দেখছি না তো ! ডাক্তার অতুল্য লাহিড়ীর নাতি আমি, কোথায় এসে কী খেলা খেলছি রে বাবা—শ্মশানের রঙ্গমঞ্চে !

বার্বারা ঃ তারপর, দাদা ?

অসিত ঃ খানিকক্ষণ রইলাম হতভম্ব হয়ে।…তারপর সাড় ফিরে এল নামাবলীধারী চেঁচিয়ে উঠতে ঃ "বুকে আয় দাদা, বুকে আয়—ছলতে এসেছিস তুই—এত কৃপা !"—ব'লে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে সে কী মাতাল ভক্তির বেতাল কান্না ! আমি উদ্‌ভ্রান্ত মতন হ'য়ে আকুল কণ্ঠে ব'লে উঠলাম ঃ "আমায় ছেড়ে দিন, দোহাই। আমি বাড়ী যাই।" অম্‌নি গুরুজি ফের হো হো ক'রে হেসে উঠলেন ঃ "আরে, বাড়ী ক্যা ? তু কিসমৎবর বাপকা বেটা হৈ। এক গীত তো সুনা দে বচ্চা ! শ্মশান-কালীমাঈকা গীত জানতা ? গা—ফির প্রসাদ মিল জায়েগা।"

নাচার ! শ্মশানে ব'সে গাইতে হ'ল একটি বিখ্যাত গান—গ্রামোফোন থেকে শেখা—অন্ধ গায়ক নিকুঞ্জবিহারী দত্তের গাওয়া ঃ

শ্মশান ভালোবাসিস ব'লে শ্মশান করেছি হৃদি
শ্মশানবাসিনী শ্যামা, নাচবি ব'লে নিরবধি।
আর কোনো সাধ নাই মা চিতে, সদাই আগুন জ্বলছে চিতে,
চিতাভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা আসিস যদি।

বারো

অসিতকে হাত তুলে থামিয়ে তপতী বলল ঃ রোসো, ওদের অনেক কিছু বোঝাতে হবে। তাই তুমি একটু জিরিয়ে নাও আমি বোঝাই।

বলে নিজের পকেটবুকে যা যা টুকে রেখেছিল দেখে দেখে এক এক ক'রে ব্যাখ্যা শুরু করল নানা শব্দের মানে তথা তাৎপর্য— ইম্‌প্লিকেশন ঃ হাঁচি, টিকটিকি, গঙ্গাজল, কল্পতরু, যোগবিভূতি, সিদ্ধাই, শ্মশানবাসিনী শ্যামা……ইত্যাদি—

সোফিয়া (একটু পরে) ঃ এসব তো হ'ল। কেবল একটা প্রশ্ন মনে কেবলই টোকা দিচ্ছে, করব ?

তপতী (হেসে) ঃ কী ? যে, মানুষ সত্যি সত্যি ইচ্ছামৃত্যু হ'তে পারে কি না ?

সোফিয়া (চমকে) ঃ ও মা! আপনি তো বড় সাংঘাতিক মানুষ দিদি। অপরের মনের কথা জেনে ফেলেন ?

তপতী (হেসে) ঃ না, না, ভয় নেই। সব সময় আমি জানতে পারি না। কখনো কখনো এমনিই অপরের চিন্তা ভেসে ওঠে আমার মনে। চেষ্টা করে কিছুই জানতে পারি না।

বার্বারা ঃ আঃ! বাঁচলাম। (অসিতকে) না একবার বলেছিলেন যে, এ-জগতে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব বা মেয়েতে মেয়েতে সখিত্ব টেঁকে কেবল এই জন্যেই যে, বন্ধু বা সখীরা কেউই এ ওর সম্বন্ধে সত্যিকার মনোভাব জানতে পারে না।

তপতী (হেসে) ঃ শ হলেন বিশ্ববিখ্যাত সিনিক—

সোফিয়া ঃ না দিদি, আপনার একথা কিছুতেই মানতে পারব না আপনি জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও। কারণ শ-র এ-ঠাট্টার সবটুকু সত্যি না হ'লেও এর মধ্যে কিছু সত্য আছেই আছে।

বার্বারা ঃ মরুক গে—(অসিতকে)—দিদির এই সব ক্ষমতাকেই কি সিদ্ধাই বলেন না কি আপনারা ?

অসিত ঃ হ্যাঁ। এর সুভদ্র নাম যোগবিভূতি—যার ব্যাখ্যা তপতী এইমাত্র করল। এ-শক্তি যোগাযোগে প্রায়ই লাভ করা যায়। তান্ত্রিকেরা তাঁদের সাধনায় অনেক সময়েই এই জাতের শক্তি লাভ করতে চান ও নামকরা তান্ত্রিকেরা যে অনেকেই পেয়েও থাকেন। (হেসে) কিন্তু হ'লে হবে কি, তোমাদের মিশনারি পণ্ডিতেরা আমাদের দেশে তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্বের কিছু না জেনেই রায় দিয়েছেন, একের পরে এক, যে, এসবই বাজে ভড়ং—hocus-pocus—তোমাদের বুদ্ধিমন্ত বিজ্ঞানীরা আরো গম্ভীর হ'য়ে বলতেন, দুদিন আগেও, যে মানুষ সবকিছু জানতে পারে কেবল ইন্দ্রিয়ের ঘটকালিতেই, কাজেই যোগাযোগ হ'ল সবই trick, mumbo-jumbo ঃ শেষে যেই টেলিপ্যাথি নামটা চালু হ'ল—তোমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে ঃ "এতদিনে কিনারা হ'ল কেমন করে একটা মন আর একটা মনের খবর পায়।" মেস্মেরিস্‌ম্, হিপ্‌নটিস্‌ম, ক্লেয়ারভয়াসের সম্বন্ধেও ঐ কথা। (হেসে) রকমারি গালভরা নাম ফাঁপিয়ে তুলে তোমরা যে কী অম্লানবদনে বৈজ্ঞানিকদের হাজারো মনগড়া ব্যাখ্যা হজম করো ভেবে না পেয়েই শ লিখেছিলেন তাঁর St Joan-এর ভূমিকায় যে "মধ্যযুগে মানুষ বেশি কানপাতলা ছিল একথা শুনলে তাঁর হাসি পায়—বিজ্ঞানের যে সব ব্যাখ্যা ভাষ্য আমরা আজ ভক্তি গদগদ চিত্তে বিশ্বাস করা শুরু করেছি, মধ্যযুগীয় সেন্টরা শুনলে নিশ্চয়ই শিউরে উঠবেন।" কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, দিদি। আমার মনে হয় একদিন Jung বা অম্‌নি কোনো দিক্‌পাল ইচ্ছামৃত্যু-র এক বৈজ্ঞানিক নাম খাড়া করতে না করতে তোমরা সবাই কোরাসে জয়ধ্বনি ক'রে বলবে ঃ "সাবাস্‌। এ না হ'লে বিজ্ঞান—সব জলের মতন সাফ হ'য়ে গেল রে! ধন্য বৈজ্ঞানিক যাঁর প্রসাদে আজ আমরা সত্যি জানি—যাকে

বলে জানার ম'ত জানা, আগে তো কেবল মেনে নিতাম—অন্ধ বিশ্বাসে।"

বার্বারা : কিন্তু টেলিপ্যাথি ক্লেয়ারভয়াস হিপনটিস্‌ম্‌ মানা আর ইচ্ছামৃত্যু মানা কি একজাতের অঙ্গীকার বলতে চান দাদা?

অসিত : আসল একটা তো মানা-না-মানা নিয়ে নয় দিদি, সত্যাসত্য নিয়ে। ভগবানের করুণাকে নাস্তিকে মানে না ব'লেই চিরন্তন বিশ্বব্যাপী করুণা বাতিল হয় না, বা অঘটনকে বুদ্ধিবাদীরা না মানলেই অঘটন লজ্জায় মুখ ঢেকে বলে না : "আমি থেকেও নেই।"

সোফিয়া : একথা মানতে বাধে না দাদা। বাধছে কেবল ঐ ভক্তটির কথা মেনে নিতে যে, প্রভুপাদ ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছিলেন। বলবেন কি আপনি যে, এ হেন অদ্ভুত কথাও সত্যি বিশ্বাস করা চলে?

অসিত : রোসো রোসো। প্রশ্নটা ঠিক কি? প্রভুপাদ ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছিলেন কি না এটা হল একটা তথ্য নিয়ে তর্ক। আর মানুষ সাধনা করে এ-বর পেতে পারে কি না এটা হ'ল একটা তত্ত্ব নিয়ে তর্ক—অর্থাৎ এ সম্ভব কি না? একটা হ'ল কোনো অঘটন ঘটেছে কি না জানতে চাওয়া; অন্যটা হ'ল সে-অঘটন কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঘটতে পারে তার হদিশ পাওয়া। আমাদের দেশে মহা-যোগীদের মধ্যে কারুর কারুর মুখে আমি শুনেছি যে, ইচ্ছামৃত্যু মানুষ হ'তে পারে সত্যিই—এবং কেউ কেউ এ-বর পেয়েও থাকেন এ-যুগেও।

বার্বারা : আপনি বলেন কী দাদা! কেউ কেউ এ-বর পেয়ে যদি অমর হন, তবে তাঁরা তারপরেও মরেন কী দুঃখে?

অসিত : পাল্টে বলি—তুমিই বা বলো কী দিদি? এটুকুও কি তোমাকে ব্যাখ্যা করে তবে বোঝাতে হবে যে, অমর হওয়া আর ইচ্ছামৃত্যু হওয়া এক নয়? শোনো বলি : আমি নিজে সত্যি জানি

না—কেউ কোনো যুগে ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিলেন কি না। প্রসিদ্ধি আছে ত্রেতায় বিভীষণ, দ্বাপরে ভীষ্ম ও কলিযুগে ত্রৈলঙ্গ স্বামী ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা এ বর পান তাঁরা যে, একই শরীরের জের টেনে চিরকাল বেঁচেবর্তে থাকতে চাইবেন এটা ধ'রে নিচ্ছ কেন? যোগীরা বলেন—তন্ত্রেও আছে শুনেছি যে, ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ণ না হলে কেউই ইচ্ছামৃত্যু বর পেতে পারে না। আর যাঁরই এ-আত্মসমর্পণে সিদ্ধিলাভ হয়েছে তাঁরই স্বেচ্ছাচার গ'লে ভগবানের ইচ্ছাচারে ফুটে উঠেছে। কাজেই এ-শ্রেণীর ভগবৎপ্রপন্ন মহাপুরুষেরা সিদ্ধিলাভের পরে আর এমন কোনো ইচ্ছা করতেই পারেন না যা ভগবত ইচ্ছার বিরোধী। একটা দৃষ্টান্ত দিই। শুনেছি, বিবেকানন্দ অমরনাথে গিয়ে শিবের কাছে ইচ্ছামৃত্যু বর পেয়েছিলেন। নিবেদিতার লেখায় এ-কথার উল্লেখ পাবে। আচ্ছা। তারপর কী হ'ল? না, তিনি ততদিন বেঁচে ছিলেন যতদিন শিব চেয়েছিলেন—অর্থাৎ, যতদিন তাঁর কাজ না সমাপ্ত হয়। যেই সমাপ্ত হ'ল তিনি দেহরক্ষা করলেন ইচ্ছা করেই সমাধিতে বসে। একবার আমি আমার এক বিদ্বান বন্ধুর একটি চিঠি পেয়েছিলাম নেপাল থেকে—সে চিঠি আমি ছাপিয়েছি। তবে তিনি আমাকে লিখেছিলেন যে, এক নেপালী সাধুকে তিনি জানতেন যিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন—মাস তিনেক পরে কবে কোথায়, কী ভাবে দেহরক্ষা করবেন—সজ্ঞানে। বলেছিলেন সমাধি খনন করতে যখন দেহে কোনো ব্যাধিই ছিল না, মনে রেখো। ঠিক সেই দিনে পূর্ণজ্ঞানে চোখ বুজে শ্বাস বন্ধ করে তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন। শাস্ত্রেও পাই একথা। ভাগবতের শেষে ব্যাস বড় রকমের ছবি এঁকেছেন কৃষ্ণের ইচ্ছামৃত্যুর। ব্যাধ দূর থেকে তাঁকে বাণ মারল হরিণ ভেবে। কাছে এসে দেখে—ঠাকুর। কেঁদে পায়ে পড়ে। কৃষ্ণ হেসে বললেন: "মাভৈ! উত্তিষ্ঠ, কাম এষ কৃতো হি মে"—অর্থাৎ, ভয় নেই. তুমি আমাকে মারবে এইই আমি চেয়েছিলাম—এজন্যে তুমি

স্বর্গেই যাবে, নরকে নয়"···ইত্যাদি। (থেমে) দিদি, যাঁরা অবতার হ'য়ে আসেন বলেই ইচ্ছামৃত্যু হন, বা যাঁরা সাধনা ক'রে ইচ্ছামৃত্যু বর পান তাঁদের মন তো গড়পড়তা মানুষের মন নয়। তাই জন্ম-মরণ নিয়তিকে তাঁরা দেখেন সম্পূর্ণ অন্য চোখে। কাজেই তাঁরা কখন কী জন্য দেহরক্ষা করতে চান তাঁদের সমধর্মী না হ'লে জানবে কী করে? গুহ্যতত্ত্বের সাধনা না ক'রে কি গুহ্যতাত্ত্বিক হওয়া যায়?

সোফিয়া (একটু ভেবে): কথাটাকে এদিক দিয়ে কখনো ভেবে দেখি নি দাদা। তবে আমাদের কী হয় জানেন? এর ওর তার কথায় ধরে নিতে বাধে যে, মানুষ সাধনা করে বা অবতার হয়ে এলে ইচ্ছামৃত্যু হতে পারে। মনে হয় এ অসম্ভব—মানে, আমাদের বুদ্ধিতে।

অসিত: এতক্ষণে দিদি নিদানটা ঠিক হয়েছে, সাবাস! বুদ্ধি, বুদ্ধি, বুদ্ধি—আবহমানকাল সেই গোল বাধিয়েছে ধরে নিয়ে যে, সে যতটুকু জেনেছে, দেখেছে, বুঝেছে সেইটুকুই জ্ঞানের চরম সীমা। তাই বুদ্ধি দিয়ে যার হদিশ পাই না তাকে নাম দিই আমরা উদ্ভট, আষাঢ়ে গল্প। কিন্তু এ ছেলেমানুষি যুক্তি ধোপে টেঁকে না কেন তাও কি বলতে হবে? বারবারই ভগবান মানুষকে দিয়ে কি এমন অসাধ্য সাধন করান নি যা বুদ্ধির নাগালের বাইরে, বা আগের যুগের মানুষের কাছে মনে হ'ত অসম্ভব? শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে একথা বেশ জোর দিয়েই লিখেছেন তাঁর ছন্দোময়ী ভাষায়:

The high gods look on man and watch and choose
Today's impossibles for the future's base.

(ঈষৎ হেসে) আর এ-রায় ঠিক এর ওর তার রায় নয় দিদি—যুগে যুগে দেশে দেশে ইতিহাসের পাষাণ-ফলকে উৎকীর্ণ হয়ে আছে স্বর্ণাক্ষরে।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি যখন আঁক ক'ষে ছক কেটে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মানুষ আকাশে রথ চালাবে, তখন সে যুগের

মানুষের বুদ্ধি কি ঠিক এই কথাই বলে নি যে এ আষাঢ়ে গল্প—যার তার কথায় এমন উদ্ভট সম্ভাব্যতাকে মেনে নেওয়া পাগলামি? জেম্‌স্ ওয়াট্ যখন প্রথম বলেন যে রেলের উপর ট্রেন চালানো যায় বাষ্পের ঠেলায় তখন সে-যুগের গাণিতিকেরাও আঁক কষে প্রমাণ ক'রে দেন নি কি যে, এ অসম্ভব? ওয়াট্ সে প্রতিবাদের উত্তরে শুধু হেসে বলেছিলেন জানো তো, যে, গণিতবিদ্‌দের আঁক-কষা প্রমাণকে তিনি অপ্রমাণ করছেন চোখের উপর গাড়ী চালিয়ে—"এই দেখ—চলছে" বললেন তিনি একটি গাড়ীর মডেল চালিয়ে। পণ্ডিতেরা তো হতভম্ব। (থেমে) আসল কথা কি জানো দিদি? আমরা যাতে অভ্যস্ত তাকেই মনে করি চিরন্তন সত্য। কাজেই যা কিছু আজকের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি তার বাইরেও যে সত্য থাকতে পারে একথা মানতে বুদ্ধির গুমর ঘা খায়। এই জন্যেই দেখবে অঘটন—miracle—ঘটে বলতে না বলতে বুদ্ধি-বাদীরা মারমুখো হয়ে ওঠেন। আপ্রাণ চেষ্টা করেন—যা ঘটেছে তাকে ঘটেনি প্রমাণ করতে। অঘটনের ঘটকদের মিথ্যুক বলতে, যারা এসব বিশ্বাস করে তাদের জাতে-ঠেলা করতে। প্যারাসাই-কলজির ও সাইকিক রিসার্চ সোসাইটির অজস্র অকাট্য এজাহারের ফলে তাঁরা আজ হিপ্‌নটিস্‌ম, টেলিপ্যাথি, একটোপ্লাস্‌ম্ ক্লেয়ার ভয়ান্স বর্গীয় কয়েকটি অঘটন মানতে বাধ্য হ'লেও যোগবিভূতির নানা প্রত্যক্ষ সিদ্ধিকেও এখনো বাতিল করতে চান জাল জুয়াচুরি ব'লে।—আজ তাঁরা নানা অঘটন ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানতে বাধ্য হয়েছেন বটে। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সংশ্রবে আসতে না আসতে এসব অঘটনকে তাঁরা বাতিল করেন মিডীভাল নাম দিয়ে। যেমন ধরো, সমাধি অবস্থায় মানুষের শূন্যে ওঠা—যাকে তোমরা বলো levitation, বা সূক্ষ্ম দেহে দূরে গিয়ে কাউকে দর্শন দেওয়া—bilocation, বা প্রার্থনা করে অসাধ্য রোগ সারানো, অন্ধকে দৃষ্টি-দান ইত্যাদি। তোমাদের মহীয়সী সেন্ট তেরেসা জানতেন যে এসব

অলৌকিক অঘটনকে পাঁচজনে বুজরুকি নাম দেগে হাসাহাসি করে। তাই তিনি এত বিব্রত হতেন যখন দেখতেন সমাধিতে তাঁর দেহ শূন্যে উঠছে। বিপন্ন হয়ে শেষে প্রাণপণে মাদুর আঁকড়ে মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকতে চাইতেন বারবারই। কিন্তু তিনি চাইলে হবে কি, ভগবান চাইতেন না যে! তাই হায় রে হায়, সে মাদুরও তাঁকে আশ্রয় দিত না—তাঁর দেহের সঙ্গে সরাসর শূন্যে উঠে ঝুলতে থাকত! আমাদের দেশে বিখ্যাত যোগী রামঠাকুর মশারির মধ্যে ধ্যান করতে করতেও বিছানা ছেড়ে শূন্যে উঠতেন। পাদ্রেপিও ইতালিতে বারবারই এভাবে শূন্যে উঠেছেন—তাঁর পাঁচ ছটি জীবনীতে পাবে। শুধু শূন্যে ওঠা নয়, সূক্ষ্মদেহে বারবার সুদূরে গিয়ে হাজির হয়ে নানা রোগীর রোগ সারিয়েছেন—নিজের দেহের সুগন্ধ সেখানে ছড়িয়ে দিয়ে। সমাধি অবস্থায় দেহ থেকে যে সুগন্ধ চারধারে ছড়িয়ে যায় এ অঘটন আমি বারবার দেখেছি—তোমরাও চাক্ষুষ করেছ। এসব অপ্রতিবাদ্য বিভূতিকে ভগবানের করুণার প্রকাশ বলে না মেনে হেসে উড়িয়ে দেওয়া অবশ্য শক্ত নয়, তার কারণও দুর্বোধ্য নয়—বুদ্ধির দম্ভ। শক্ত হচ্ছে—সত্যকে মিথ্যা ব'লে নামঞ্জুর করার প্রত্যবায়কে ঠেকানো। কারণ সত্যকে মিথ্যা বললে সত্য সত্যই থাকে, কেবল সত্যবিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায় মিথ্যুক, সংকীর্ণ যে তিমিরে সেই তিমিরে।

সোফিয়া (একটু ভেবে): তাহলে আপনি কি বলতে চান যে, ঐ জটাধারীর গাঁজাস্তবকেও হেসে উড়িয়ে দিলে ভুল হবে?

অসিত (হেসে): দিদি, দিদি, দিদি! তোমার থীসিস খতিয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, হয় সমস্তটাই মানব, নয় সমস্তটাই ছাড়ব, এই না?

"Once, when there were grand ladies in the chapel for a patronal festival, she had to get the nuns to hold her down: she was 'worn out with the worry of it all.' Another time, Ana De La Encarnacion, a nun at the Segovia convent, found her, between one and

two o' clock in the ofternoon, kneeling in the choir about half a yard above the floor. Bishop Diego De Yepes—her biographer, who knew her well—relates that one day, when she felt a rapture coming upon her, she caught hold of some mats in an effort to keep herself down and rose into the air with these still in her hands···Writing about her raptures to her brother Lorenzo, she says : 'Several times I have had them in public, during Matins, for example. It is useless to resist them and they are impossible to conceal. I get so dreadfully ashamed that I feel I want to hide away somewhere. I pray to God earnestly not to let them happen to me in public."

(THE GREAT TERESA by Elizabeth Hamilton···
Chapter 2)

বার্বারা (অনিশ্চিতস্বরে) : ঠিক তা না তবে এই গুরুজি নির্জলা ভণ্ড যখন দেখতে পাচ্ছি—

অসিত : রোসো রোসো। গোড়ায় premise-এই ভুল থেকে গেলে সিদ্ধান্ত ঠিক হবে কী ক'রে? এই গুরুজি নির্জলা ভণ্ড একথা ধ'রে নিলে কোন লজিক মেলে? অসতী মেয়ের মধ্যে মাতৃত্ব, ভক্তি, ঔদার্য কি দেখা যায় না অনেক ক্ষেত্রেই? লম্পটের মধ্যেও বীরত্ব, ত্যাগ? বিলাসীর মধ্যেও বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রসাধনের শক্তি? মানুষ বড় জটিল চীজ দিদি—উল্টা পাল্টামিতে ভরা, আজ উধাও হয় মাকুর মতন এদিকে, তারপরই সটাং একেবারে ওদিকে। তাই এই তান্ত্রিক সাধুটির নানা আচরণ নিন্দনীয় হ'লেও তিনি একটি নির্জলা ভণ্ড ছিলেন বা তাঁর সন্ন্যাসের প্রেরণায় ষোলোকড়াই কানা এমন বলা চলে না। অন্তত তাঁর সিদ্ধাই ওরফে যোগবিভূতি

যে মেকি ছিল না এ তো আমি স্বচক্ষেই দেখেছি। শুধু তাই নয়, তিনি শক্ত অসুখও সারাতে পারতেন তাঁর এই সিদ্ধাইয়ের প্রসাদে —তাঁর কথা পরে বলছি। অন্ততঃ দুজনের দুরোরোগ্য রোগ তিনি—

সোফিয়া (ক্ষুণ্ণস্বরে): দাঁড়ান দাদা, আমার সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। মানে, আপনি কি গম্ভীরভাবেই বলতে চাইলেন যে, এই গুরুজিটি আদৌ ভণ্ড ছিলেন না?

অসিত (হেসে): ঐ দেখ, ফের সেই একই ভুল করছ মানুষকে লেবেল মেরে তার জাতবিচার করতে চেয়ে। আমি সত্যিই বলছি দিদি, এমন সাধু আমি দেখেছি যাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতে না পারলেও আমার পরম শ্রদ্ধেয় মহাভাগ বন্ধু দুচারজন তাঁকেই গুরু ব'লে মেনে সাধনায় আশ্চর্য উন্নতি করেছেন। তাই আমি অনেক দেখেশুনে শেষে মানতে বাধ্য হয়েছি যে, আর সব মানুষের বেলায়ও যা খাটে এইসব মিশেল সাধুসন্তদের বেলায়ও তা খাটে, অর্থাৎ তাঁদের চরিত্রে খাদ থাকলেও তাঁদের সাধনার মধ্যে সোনার অভাব ছিল না। দিদি, জীবনে সত্যজিজ্ঞাসার পথ এত দুর্গম হ'য়ে এসেছে এইজন্যেই যে সর্বত্রই শুভ ফুলের সঙ্গে অশুভ কাঁটা প্রায়ই অঙ্গাঙ্গী হয়ে থাকে। তাই তো ভগবান্ দৃশ্যতঃ বদ্‌গুরুকে দিয়েও তাদের অনেক নির্মল সৎশিষ্যকে ভক্তিবিশ্বাসের পথে এগিয়ে দিতে পারেন ও অনেক ক্ষেত্রেই দিয়েও থাকেন। তোমরাই কি বলো না—even the devil is not nearly as black as he painted? শোনো, আমার বলবার কথা এই যে, কেউ কেউ তার সিদ্ধাই ভাঙিয়ে খাওয়ার লোভ সামলাতে পারে না ব'লেই যে তারা রাতারাতি ষোলো আনা দুরাচার হ'য়ে দাঁড়ায় একথা বলা চলে না।

সোফিয়া: কিন্তু তাই বলে সিদ্ধাই তপস্যা ভাঙিয়ে খাওয়াটা—

অসিত: নিশ্চয়ই অন্যায়—কে না মানবে। কিন্তু এ নিয়ে এত দুর্ভাবনাই বা কেন দিদি? আমাদের তন্ত্রে বলে—কর্মফল কেউ এড়াতে পারে না। এ জন্মে না ফললে সে কিছু নেবেই নেবে পরজন্মে শোধ

তুলতে। যারা যোগের পথে গিয়ে কিছু যোগবিভূতি পেতে না পেতে ধন মান প্রতিষ্ঠার লোভে যোগভ্রষ্ট হয় তাদের শাপ না দিয়ে দয়া কোরো দিদি, কেননা তাদের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংসারীদের দুর্ভাগ্যের তুলনাই হয় না এইজন্যে যে, তারা সুধার আস্বাদ পাবার পরেও সে স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে গুড় নিয়ে ঘর করতে বাধ্য হয়। মণিমুক্তার বেসাতি করে শেষে যারা দেউলে হয়ে ঝিনুকের দোকান খোলে তাদের মতন দুর্ভাগা কি আর আছে?

বার্বারা (সসঙ্কোচে): একথা মানি দাদা, কিন্তু—কিন্তু তবু তো বলতেই হয় এ-গুরুজি মেকি?

অসিত: আমার তো তাই মনে হয়েছিল—অন্ততঃ সে সময়ে। তাঁর সঙ্গে পরে আর দেখা হয় নি তো তাই বলতে পারি না জোর ক'রে তাঁর স্বরূপ কী ছিল। কিন্তু যদি তোমার কথা মেনেও নিই যে, তিনি ষোলো-আনা সাধু ছিলেন না, তাহলেও কি সাব্যস্ত হয় যে, তাঁর মধ্যে ভালোর ছিটেফোঁটাও ছিল না? শোনো এক গল্প বলি। ১৯২২ সালে আমি ভিয়েনায় অতিথি হয়েছিলাম এক বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান-জর্মন লেখকের। তাঁর সঙ্গে একদিন গিয়েছিলাম একটি যুদ্ধের ছবি দেখতে। ছবিটি ছিল ডকুমেণ্টারি—এটা পর পর ইংরেজ, ফরাসী, রুষ—শেষে দুর্ধর্ষ হিণ্ডেনবার্গ অভ্যুদিত হ'তেই মাইক গর্জন করে বলল: "Der fablehaft Von Hindenburg der 90,000 Russen in einem Krieg vernichtet hat." অর্থাৎ ইনি নব্বই হাজার রুষসৈন্যকে একটি যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। অম্‌নি—বললে বিশ্বাস করতে হয়ত বাধবে তোমাদের—এক হাজার দর্শক উঠে দাঁড়ালো সসম্ভ্রমে—কী তুমুল জয়ধ্বনি: "Bravo Hidenburgh!" আমার বন্ধুটি ছিলেন ইহুদী, মুখ বেঁকিয়ে বললেন: "দেখছেন কী কাণ্ড! এঁরা নিজেদের খ্রীষ্টান বলেন। আর ঐ দেখুন ওদিকে চেয়ে—এক ডজন পাদ্রিও আছেন যাঁরা পাগলের মতন হাততালি দিচ্ছেন! অথচ কালই এঁদের গির্জায় গিয়ে খ্রীষ্টের বাণীবাহ

হ'তে বাধবে না। সাধে কি খ্রীশ্চানিটির আজ এই অবস্থা, মাইন ফ্রয়েন্দ !"... ইত্যাদি।

সোফিয়া ও বার্বারা মুখ নিচু ক'রে রইল।

অসিত (স্বর নামিয়ে) : কিন্তু এজন্যে তোমাদের মাথা হেঁট করবার দরকার নেই দিদি। আমাদের দেশেও পাণ্ডাপুরুত ধর্মধ্বজদের এই একই অবস্থা। ধার্মিক লেবেল যারা কপালে আঁটে তাদের মধ্যে কজন সত্যিকার ভক্ত, জ্ঞানী, বিশ্বাসী? কিন্তু এদের ত্রুটি চ্যুতির জন্যে দায়ী তো আমাদের ধর্মবীরেরা নয়, দায়ী সাড়ে পনেরো আনা মানুষের বাঁদরামি যেজন্যে তোমাদেরই কবি শেক্সপীয়র কেঁদেছিলেন :

Man, proud man,
Drest in a little brief authority,
Most ignorant of what he is most assured,
His glassy essence, like an angry ape,
Plays such fantastic tricks before high heaven
As make the angels weep.

সোফিয়া : কিন্তু কেন মানুষ বারবার ঠেকে তবু শেখে না দাদা? বাঁদরামি করে কেন বারবার কাঁদায় স্বর্গের দেবতাদেরও?

অসিত : আমাদের গীতা এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে : "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"—অর্থাৎ অন্ধমোহ মেঘের মতন ঢেকে রেখেছে আমাদের অন্তরের জ্ঞানের জ্যোতিকে—তাই মানুষ অন্ধকারে এত দুঃখ পায়। নৈলে মনে করো কি—তোমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক দিকপালেরাও atom-bomb তৈরি করবেন এই বিশ্বাসে যে, আমার জাত বাঁচলেই মর্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্য নেমে আসবে? তাই সব দেশেই মুনিঋষিরা বলেন একবাক্যে যে, যতদিন মানুষ তার পশুপ্রবৃত্তির তাগিদে চলবে ততদিন যুদ্ধবিগ্রহের নরক এড়িয়ে চলবার দৃষ্টিবর সে পেতেই পারে না। চোখের উপরই দেখ না কেন, মানুষ মূলতঃ অজ্ঞান ও অন্ধ না হ'লে জর্মনদের মত উচ্চশিক্ষিত

জাতকেও কি হিটলারের মতন রাক্ষস মন্ত্রমোহে মুগ্ধ ক'রে ষাট লক্ষ ইহুদী নরনারী শিশু বৃদ্ধকে gas-chamber-এ পুরে হত্যা করতে পারত—আর তবুও লক্ষ লক্ষ জর্মন তাকে দেখে "হাইল হিটলার" ব'লে বরণ করত মহাউল্লাসে ?

বার্বারা ঃ আপনার নিদান অভ্রান্ত দাদা, না মানবে কে ? কিন্তু এর চিকিৎসা কী ? মানে দাওয়াই ?

অসিত ঃ নাস্তিকতার ব্যাধির কেবল একটি মাত্র দাওয়াই আছে দিদি ; আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই যে দেবদ্রোহী অসুর আছে তাকে আমল না দিয়ে আরো গভীরে যে দেবতা ঘুমিয়ে আছেন তাকে জাগানো। অর্থাৎ কি না, ধর্মসাধনা—জ্ঞান ও ভক্তির উজ্জীবনে মানুষকে তার দেবস্বরূপে জাগিয়ে তোলা। তাই তো সাধুসন্তেরা চিরদিনই ব'লে এসেছেন সব দেশেই আমাদের অন্তরে যে-স্বর্গরাজ্য আছে তার চাবিকাঠি আছে কেবল জ্ঞান ও ভক্তির হাতে—নাস্তিক প্রগতিবাদ ও বস্তুতান্ত্রিক শক্তিবাদের হাতে নয়, আর এই চাবিকাঠি বিনা মানুষ সুখ শান্তি আনন্দ কিছুই পেতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে এই ইঙ্গিতটি করেছেন বড় চমৎকার ভাষায় ঃ

> A dark concealed hostility is lodged,
> In the human depths, in the hidden heart of Time,
> That claims the right to change and mar God's work,
> Till it is slain peace is forbidden on earth.

বার্বারা ঃ কিন্তু এ-নাস্তিকতাকে মানুষ কেন প্রশ্রয় দেয় দাদা ?

অসিত ঃ আমাদের মনে দেবতা ও দানব পাশাপাশি থাকে বলেই দুয়ের যুদ্ধে চলেছে এ আলো-আঁধারী বিশ্বলীলা। মানুষ যদি প্রথম থেকেই শুধু দেবতা হয়েই জন্মাত তাহলে নরলীলা কেমন হ'ত, কোন্ ধারায় বিকাশ পেত কে জানে দিদি ? আমরা বিশ্বের

বাসিন্দা, বিশ্বকর্মা তো নই, কাজেই কেমন করে টের পাব তাঁর প্ল্যান? আমাদের আছে শুধু একটি মাত্র কম্পাস—আন্তরিকতা, sincerity—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—মন মুখ এক করা বা ভাবের ঘরে চুরি হতে না দেওয়া। এইখানেই আসে ধর্মের তারিণী শক্তি। মানুষকে বিজ্ঞান বা বুদ্ধি অনেক কিছুই দিয়েছে—স্বস্তি তথ্য, আরাম, বিলাস, স্বাস্থ্য। কিন্তু দিতে পারে নি তিনটি জিনিস—তত্ত্ব, শান্তি আর অভয়। পারে নি, কারণ বিজ্ঞান ও বুদ্ধির স্বভাব আলাদা, ক্ষেত্র ভিন্ন। স্বপ্ন যা দিতে পারে বাস্তব তা দিতে পারে না, মন যা দিতে পারে প্রাণ তা দিতে পারে না, যোগ যা দিতে পারে ভোগ তা দিতে পারে না, পদ্য যা দিতে পারে গদ্য তা দিতে পারে না, চিত্র যা দিতে পারে ফটোগ্রাফ তা দিতে পারে না—কত বলব? কিন্তু মজা এই যে, আর সব কিছুর বেলায়ই আমরা মানি যে, প্রতি শক্তি ব্যবস্থা দেয় তার স্বধর্ম মেনে, কেবল বিজ্ঞান বা বুদ্ধির বেলায় স্তবের সুর ধরি, "প্রভু তুমি শুধু সবজান্তা নও, সব পার্তা—ভগবান্ তো তুমিই! কী ভানুমতীর খেলাই না খেললে: স্থলে মোটর, জলে জাহাজ, আকাশে পুষ্পকরথ! শুধু তাই নয়, তুমিই মানুষকে মুক্তি দিলে বিশ্বাসের অন্ধকূপ থেকে মুক্তির আলোয় টেনে এনে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে—ধর্ম হ'ল কুসংস্কার, ঈশ্বর একটা রঙের কল্পনা, আত্মা ভাববিলাস, প্রেম নিছক gland-এর খেলা, চিন্তা ধ্যান সমাধি স্রেফ ইলেকট্রনে গড়া মগজের মর্জি। বাহবা বাহবা! তুমিই নিয়ে চলেছ আমাদের ধর্মের অন্ধকার থেকে অধর্মের আলোয়, শান্তির কাপুরুষতা থেকে হত্যার বীরত্বে, সহিষ্ণুতার দুর্বলতা থেকে ছত্রপতি শক্তির দাপাদাপিতে। আজ তুমি এলে বটে আমাদের সর্বলুপ্তির কিনারায়, তবু বলব তুমিই মানুষকে মহিমান্বিত করেছ শক্তির দম্ভতিলক পরিয়ে।" (থেমে) আমি হেসে বলছি বটে একথা দিদি, কিন্তু বলছি সত্যি বড় দুঃখেই, বিশ্বাস কোরো। কারণ আমি ভগবানের করুণায়ই জানতে পেরেছি—মুক্তির পথ শক্তিবাদে নয়,

প্রেমের প্রতিষ্ঠায়। দেখতে পেয়েছি—কেবল ধর্মই ডাক দিতে পারে প্রেমকে এ-হিংসার স্বার্থের নাস্তিক জগতে। বুঝতে শিখেছি যে, যে-ধর্ম মানুষকে ধারণ করে তারক হ'য়ে এসে তা মিলতে পারে না বিজ্ঞানের শক্তিবাদে বা বুদ্ধির দম্ভবাদে, মেলে শুধু দীন প্রার্থনায়ঃ "আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে" ব'লে চোখের জলে ঠাকুরের শরণ চাওয়ায়, পরম আত্মসমর্পণে, প্রশ্নহীন প্রণামে, অন্ধ বিশ্বাসে।

সোফিয়া (চমকে): অন্ধ বিশ্বাস?

অসিত (হেসে): বিশ্বাস মাত্রই তো অন্ধ দিদি, বলতেন না কি শ্রীরামকৃষ্ণ? মহৎ, মধুর, সরল সব কিছুরই ভিৎ কি এই অন্ধ বিশ্বাস নয়? শিশু যখন মাকে বিশ্বাস করে তখন কি সে অন্য সব মাকে দেখে তবে বিশ্বাস করে যে মা তাকে মেরে ফেলবে না? শিল্পী যখন সুন্দরের সাধনা করে তখন কি সে জানে সুন্দর মানুষের কী হিতসাধন করে? সে চলে নব সৃষ্টির এক অন্ধ তাগিদে—ঠিক যেমন পুরুষ নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এক দুর্নিবার অন্ধ তাগিদে। সন্তান আসে তো অনেক পরে—তখন সে বোঝে কেন মিলনের তৃষ্ণা তাকে পেয়ে বসেছিল বিধাতার কোন্ গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধন করতে। না দিদি, ধর্মকে মানো বা না মানো, বোলো না, বোলো না, বোলো না, যে ধর্মের ভিৎ অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু হতে পারে। আর তাই তো আমি বলি জগতের শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের বিশ্বাস না করলে আমাদের গতি নেই।—যাঁরা বলেন একবাক্যে—মানতে শিখলে তবেই জানতে পারবে, নৈলে নয়। মিলিয়ে নেবার সময় আসে পরে—আগে নয়। তোমাদের খৃষ্টদেব এই জন্যেই অন্ধ বিশ্বাসের গুণগান করেছিলেন ব'লে যে, খুঁজলে পাবেই পাবে এই বিশ্বাসই পাওয়ার অগ্রদূত, এই মন্ত্র যে, Seek and thou shalt find. বাস্তবিক অচিনের তৃষ্ণাই তো অচিন আছে এ-কথার প্রমাণ। আর তৃষ্ণার পথে চলার নামই তো বিশ্বাস— তা ছাড়া আর কি? এই বিশ্বাসের

অঙ্কুরেই ফলে জ্ঞানের তথা প্রেমের ফল—তখন আমরা প্রমাণ পাই মহাজনদের দীপ্ত জীবনচরিতে যে, বিশ্বাস ভুল দিশারি ছিল না। কিন্তু যখন বিশ্বাসের নির্দেশে চলি তখন মিলিয়ে নেবার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ তখন তো আদৌ জানিই না বিশ্বাসের পথ ধরে গেলে কোথায় পৌঁছব, কী পাব। (হেসে) আর তাই জন্যেই আমি তোমাদের এত মানা করি দিদি, ধর্মের ব্যভিচারের জন্যে ধার্মিককে অপদস্থ করতে—মনে রেখে যে যা অবিশ্বাস্য তাকে বিশ্বাস করার কুফল যদি হয় পাঁচ আনা তবে যা বিশ্বাস্য তাকে অবিশ্বাস করার কুফল যোগ দিলে দাঁড়াবে অন্ততঃ পনের আনা।

তপতী (অধীর স্বরে) ঃ দাদা, দাদা, দাদা, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না, ধান ভানতে শিবের গীত না গেয়ে তুমি থাকতে পারো না। সাধে কি তোমার শত্রুরা বলেন—তোমার ভাষণে গল্পের আর্ট ডোবে?

অসিত ঃ ঠিক বলেছ। কিন্তু মুস্কিল কি জানোই তো ঃ শুধু স্বভাব নয় তার ওপর স্বধর্ম। মানে আমি শুধু তো স্বভাবে শ্রদ্ধাবানই নই, তার উপর স্বধর্মে জিজ্ঞাসুও যে। তাই গল্পের ছলে আর পাঁচজনের মনেও শ্রদ্ধা ও জিজ্ঞাসা জাগাতে যার আলোয় দেখতে পাওয়া যায় যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি অসহিষ্ণু—খানিকটা পাহারা কুকুরের মতন যাকে দেখেনি তার আবির্ভাব হতে না হতে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে নিজের এলাকায় নিরাপদে বেঁচেবর্তে থাকতে চেয়ে। শ্রীঅরবিন্দ এই কথাটি বলেছেন বড় চমৎকার করে তাঁর সাবিত্রীতে!

It keeps close guard in front of custom's wall
And barks at every unfamiliar light
As at a foe who would break up its home,
A watch-dog of the spirit's sense-railed house
Against intruders of the Invisible.

বার্বারা ঃ কী চমৎকার উপমা!

সোফিয়া (অনিশ্চিত) : বটে, কিন্তু তবু—মানে বুদ্ধিকে watch-dog-এর সঙ্গে তুলনা করাটা কি—

অসিত : না, একটুও অন্যায় হয় নি। কারণ দম্ভকে সর্বত্রই ব্যঙ্গ করা চলে। আর বুদ্ধি যা বোঝে না তার সম্বন্ধেও বিজ্ঞ রায় দিতে চড়াও হ'য়ে এলে তাকে দম্ভ নাম না দিয়ে কি বলব বাহাদুর বিচারক ?

তপতী : তা বলব না, কিন্তু একথা বলবই বলব যে, তুমি অবান্তরের অবতারণা করছ।

সোফিয়া : না দিদি, এ তর্কে আমি দাদার দিকে। কারণ তোমাদের কাছে এসব অবান্তর হ'লেও আমরা এদেশে দাদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক কিছু শিখি—আরো এই জন্যে যে, দাদা এই সব মন্তব্যের মধ্যে দিয়েই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন বারবার যে, সায়েন্স যার পাত্তা পায় না তাকে নামঞ্জুর করার নাম সুবুদ্ধি নয়। শুনলে তো এইমাত্র যা বললেন ?

বার্বারা : ঠিক বলেছিস সোফি। আমি কেবল আর একটু জুড়ে দিতে চাই : যে, দাদা তো শুধু কবি বা কথকই নন—জীবনের ভাষ্যকারও হয়ে দাঁড়িয়েছেন নানা সাধুসন্তের জ্ঞানের সরিক হ'য়ে। দিদি, আমাদের দেশে শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, কথক, আর্টিস্ট—এসব মেলে অঢেল. অভাব যে কেবল খাঁটি দার্শনিকের, ভাষ্যকারের। আর জীবনের যে-ভাষ্য দাদা দেন উঠতে বসতে, তার মূলে রয়েছে আপনাদের প্রাচীন দেশের আশ্চর্য প্রভা—wisdom—তাই তো তাঁর নানা অবান্তর টীকাটিপ্পনি থেকেও আমরা অনেক কিছু লাভ করি। অতএব আমার অনুরোধ—আপনি তাঁকে টুকবেন না ঘড়ি ঘড়ি। মনে রাখবেন—আপনাদের কাছে যা স্বতঃসিদ্ধ তাদের বুঝতে বেগ পাই ব'লেই আমরা আপনাদের নানা অন্তর্মুখী সাধনার তথ্য থেকেও অনেক কিছুই লাভ করি।

অসিত (খুশী) : ধন্যবাদ দিদি। এমনি না হলে কি আর

তোমাদের স্নেহসঙ্গে এত সুখ পেতাম—না, খুশখেয়ালে বলতে পারতাম যা মনে আসে? দরদী না পেলে কি কেউ মনের কথা খুলে বলতে পারে অসঙ্কোচে? বলতে কি, আমার এ দেশে এসে প্রায়ই ধর্মের কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে এইজন্যেই যে, বহির্মুখী বুদ্ধির দরবারে অন্তর্মুখী প্রজ্ঞা তার প্রাণের কথাটি বলতে ভয় পায়। —কিন্তু তবু একটা কথা বলা যায়—না, থাক, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে—লাঞ্চের আগে গল্পটা শেষ করতেই হবে। তাই ফের গল্পের খেই ধরি।

তেরো

কিন্তু মনে রেখো, তখন আমার বয়স মাত্র ষোলো—যে-বয়সে মানুষ যা দেখে তা থেকেই চমকের খোরাক জোগাড় করে, যাকে তোমাদের কবি এডগার অ্যালেন পো মান দিয়েছেন একটি চমৎকার উচ্ছ্বাসে: "It is a happiness to wonder!" অর্থাৎ, হ'ল কি,—আমার দুরবস্থার কথা স্রেফ ভুলে গেলাম এ অভিনব গর্ভাঙ্কের চমকানন্দে। তাছাড়া শ্মশানে-মশানে অঘোরপন্থী সাধুরা শব-সাধনা করে এসব শুনেছিলাম বটে—নানা বইয়েও পড়েছিলাম—কিন্তু এ যে চোখে দেখা! —আর seeing is believing জানোই তো! আমি শুধু ঐ সঙ্গেই জুড়ে দিতে চাই rejoicing: তার এ-অঘটন চাক্ষুষ ক'রার সঙ্গে সঙ্গে আমার মিইয়ে-পড়া মন যেন ফুলের মতন ফুটে উঠল—বিশেষ ঐ শ্মশান-কালীর গানে তান লাগাতেই।

কিন্তু বাংলায় বলে যত হাসি তত কান্না—I rejoiced too soon, alas! হঠাৎ চমকে উঠলাম মোটরের ভোঁক ভোঁক শুনে। সঙ্গে সঙ্গে সাধুজীর উড়িয়া ও নামাবলীধারী চেলা যুগল মহানন্দে "ঐ এসেছে রে!"—বলেই ছুটল রাস্তার দিকে। আমারও কৌতূহল

জাগল—নিলাম ওদের পিছু, আর তাইতেই ডুবলাম। অঘটন আর ঘটে না এ যুগে কে বলে? ষোলো বছর বয়েসেই যে অঘটনের সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টি—শোনোই না। (থেমে হাসিমুখে) দেখলাম—মোটর থেকে নামলেন এক নধরকান্তি ঝাঁকড়া চুল বাবু। আর এমন বাবু যে মাতাল হয়েও কাবু হন নি।

ওরা দুজনে গিয়ে তাঁকে নমস্কার করতেই তিনি জড়িতকণ্ঠে বললেন: "কী রে গোবরা? তুই! বা বা বা! এ কী! তুইও! পেঁচো! তাহলে নরক গুলজার বল্? হা হা হা!"

পেঁচো ও গোব্‌রা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে যে ভঙ্গি করল তাতে বুঝতে বাকি রইল না যে নধরকান্তি প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নেই।

হাসি থামলে তিনি বললেন: "কী রে? গুরুদেব এসেছেন তো?" ওরা ঘাড় নেড়ে 'এসেছেন' বলতেই তিনি দুধারে দুজনের কাঁধে হাত রেখে টলতে টলতে এগিয়ে এলেন আর হবি তো হ, আমি পড়লাম ঠিক তাঁর সামনে।

অমনি নধরকান্তি সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন: "এই যে ভাই রে লক্ষ্মণ! কোথা ছিলি এতদিন গায়েব হয়ে—তোর বিধবা দাদাকে ছেড়ে? না হয় রাগের মাথায় একটা চড়ই মেরেছিলাম। কিন্তু তাই ব'লে কি মায়ের পেটের ভাইকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিতে হয় এমনি ক'রে?"

আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। বললাম: "আপনি ভুল করছেন, আমি আপনার ভাই নই।"

কিন্তু শুনছে কে? নধরকান্তি ছুটে এসে আমাকে মোক্ষম বুকে চেপে ধরলেন। আমি তো ভয়ে কাঁটা। কিন্তু তিনি আদর ক'রে বললেন: "ভুল? ভুল করে কোন্ শালা রে? ভুল করলে কি আর তোকে জাপ্টে ধরতে না ধরতে আমার বুক জুড়িয়ে যেত রে লক্ষ্মণ! চল আগে তোর দুঃখিনী সীতা বৌদির কোলে তোকে তুলে দিয়ে আসি, হারানিধি রে! ওরে তোকে যে সে নিজে হাতে মানুষ

করেছে রে? কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয় বুঝি বা! ওরে পাষণ্ড! কেমন করে তুই সব ভুলে গেলিরে, একটি চড়ে? কোন্ প্রাণে হলি এমন পাষাণ রে, বল্ তো?—না আর কথাটি না"—বলেই—ওঁর দুই পার্শ্বরক্ষীকে বললেন: "ওরে! গুরুদেবকে গিয়ে বল্গে—তাঁর আশীর্বাদ ফলেছে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। তা দেবতা গুরু যে রে—না ফলে পারে? রামপ্রসাদ কি সাধে গেয়েছিলেন: "গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তিবারি তায় সেঁচনা!" তাই তো রাম ফিরে পেল তার হারানিধিকে রে! আমি এক্ষণি ওকে ওর বৌদির জিম্মায় দিয়ে ফিরে আসছি গুরুদেবের চরণে ছুঁচোটি হ'য়ে।"

আতঙ্কে আমার বুকের মধ্যে গুর গুর ক'রে উঠল। আমি ব্যাকুলকণ্ঠে তাঁর পার্শ্বরক্ষীদের বললাম: "আপনারা আমাকে বাঁচান। আমি ওঁর ভাই নই—আমি—আমি—"

নধরকান্তি আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন: "ভয় কি ভাই? তোর কি সাজে নিমতলার শ্মশানে বেলেল্লামি করা মদ খেয়ে?"

আমি বললাম: "আমি মদ ছুঁই না। ও! ছাড়ুন আমাকে—" নধরকান্তি আমার দুই কব্জি তাঁর দুই মুঠোয় চেপে ধরে বললেন পার্শ্বরক্ষীদের: "হাঁ করে চেয়ে আছিস কী? হাত লাগা না।"

অমনি ওরা দুজন আমার দুই হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল। টিকীধারী বলল নধরকান্তিকে: "আপনি ছেড়ে দিন বাবুমশায়—আমরা ওকে তুলে দিচ্ছি মোটরে!"

নামাবলীধারী আমাকে সাম্লাতে সাম্লাতে বলল: "আমি বলি কি, কর্তাবাবু, এ-ছোঁড়াকে আপনি একলা এঁটে উঠতে পারবেন না, হয়ত আচম্কা মোটর থেকে লাফ দিয়ে চম্পট দেবে। তাই আমরাও ওর সঙ্গে যাই না কেন ওর বডিগার্ড হয়ে?"

নধরকান্তি খুশী হয়ে বললেন: "এই তো গুরুভাই-এর মতন কথা।"

অতঃপর ধস্তাধস্তি। কিন্তু ওরা তিনজন, আমি একা পারব কেন? আমি চিৎকার করতেই কর্তাবাবু আমার মুখে তাঁর গলাবন্ধ গুঁজে দিলেন, আর ওরা দুজন আমাকে চ্যাং-দোলা করে মোটরে গুঁজে দিয়ে দুজনে বসল দুপাশে। কর্তাবাবু বসলেন সামনে—সারথির বাঁয়ে।

চোদ্দ

মোটর থামল খিদিরপুর ডকের কাছে একটি তিনতলা বাড়ীর সামনে। ওরা আমার কব্জি চেপে ধরতেই আমি বললাম: "আমাকে ধরতে হবে না—কোথা নিয়ে যাবেন—চলুন। আমি পালাবো না, কথা দিচ্ছি।"

ততক্ষণে কর্তাবাবুর গোলাপী নেশা সিঁদুররাঙা হয়ে এসেছে, তিনি বললেন মোটর থেকে নেমে: "পালাবি কী দুঃখে, ভাইরে লক্ষ্মণ? নিজের আস্তানা ছেড়ে কেউ কখনও পালায় রে?" বলে ফের আমাকে জাপটে ধ'রে ডুকরে কেঁদে উঠলেন: "শুধু গুরুবলেই তোকে বুকে ফিরে পেলাম রে! নৈলে ধর্ না কেন—যে নিমতলায় মানুষ যায় সব বিসর্জন দিতে, সেইখানেই কি আগমনীর গান বেজে উঠতে পারত রে লক্ষ্মণ!"

আমি তাঁর মুখের মদের গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে কাতর কণ্ঠে বললাম: "ছেড়ে দিন। আমি যাব যেখানে বলবেন, কেবল আমাকে ছেড়ে দিন দয়া করে।"

অতঃপর তাঁর সঙ্গী দুটি বাড়ীর দোরের কড়া নেড়ে দোর খুলিয়ে চাকর ডেকে এনে আমাকে তার জিম্মায় দিয়ে দিল। কর্তাবাবু বললেন: "যেদো রে! গিন্নিমাকে বল্ গিয়ে আমার লক্ষ্মণ ভাইকে ফিরে পেয়েছি নিমতলায়। বলিনি—গুরুবাক্যি মিথ্যে হয় না।"

কিঙ্কর যত্ন ওঁর প্রমত্ত অবস্থা দেখে মুখ হেঁট করে আমাকে চাপা গলায় বলল ঃ "আসুন বাবু।"

কর্তাবাবু বললেন ঃ "ফিশফিশ করে কী বলছিস রে যেদো? ষড় করছিস বুঝি?"

যত্ন বিব্রত হয়ে বলল ঃ "না কর্তাবাবু। তবে গিন্নিমার শরীর ভালো নয় তো, সবে একটু ঘুমিয়েছেন, তাই—"

কর্তাবাবু বললেন ঃ "তাহলে এক কাজ কর—লক্ষ্মণকে নিয়ে যা বৈঠকখানা ঘরে—শুইয়ে দে তক্তপোষে। কাল সকালে গিন্নিমাকে বললেই হবে। তুই যা—আমি এলাম বলে। আহা ছ ছটি মাস ও শ্মশানে-মশানে ঘুরে একেবারে আধখানা হয়ে গেছে রে! তার ওপর মদ খেতে শিখেছে। তাই তো আমাকে দাদা ব'লে চিনতে পর্যন্ত পারল না রে! বলে কি জানিস? যে, আমার ভুল হয়েছে—ও আমার লক্ষ্মণ ভাই নয়। আহা, কেবল ওর মাথাটা যেন মদ খেয়ে খারাপ না হয়ে যায় গুরুদেব—দোহাই আপনার—" বলে অনুপস্থিত গুরুদেবের উদ্দেশে অমত্ত মানুষটি হাত জোড় করে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। যত্ন আমাকে আরো ফিশফিশ করে বলল, ঃ "আসুন বাবু, আর দেরি করবেন না। ভাববেন না।"

পনেরো

সোফিয়া বলল হেসে ঃ "কী কাণ্ড দাদা? ভারতবর্ষের গুরুদের ধরে সংকটমোচন হয় এই কথাই শুনে এসেছি—এখানে দেখছি উল্টো ব্যবস্থা।"

অসিত (হেসে) ঃ তোমাদেরই তো একটি প্রবচন আছে—exception proves the rule. তবে সংকটের এখন হয়েছে কি? এ তো সবে কলির সন্ধে।

বার্বারা (হেসে) ঃ কিন্তু ব্যাপারটাতো অন্য ভাবেও দেখা যায় দাদা। সেদিন শ্মশানে যে আপনাকে রাত কাটাতে হ'ল না এও হয়েছিল হয়ত ওঁর গুরুবলে, কে জানে? অমন দশাসই গুরুজির বরে কী না হ'তে পারে বলুন—গাঁজা খেয়েও যিনি রাজা হবার শক্তি ধরেন।

অসিত (হেসে) ঃ দিদি, ঠাট্টার স্বরে অনেক সময় মানুষ বেদবাক্য উচ্চারণ ক'রে ফেলে—এ-অঘটনও দেখা যায় সংসারে। কারণ যতুর কৃপায় যখন একটি সুন্দর ঘরে নরম বিছানায় শুয়ে পড়লাম তখন সত্যিই হাসি এসে মন হাল্কা হয়ে গেল। মনে হ'ল —আমার হঠাৎ পাওয়া দেবদূত দাদাটিকে পেয়ে গেলাম ঠাকুরের কৃপায়ই। লড়েছিলাম বটে দাদাটির সঙ্গে। তবে (বার্বারাকে) তুমি ধার্মিক নান্ হ'তে যাচ্ছ। দেখবেই দেখবে যে, মানুষ সব চেয়ে বেশি লড়ে ঠাকুরের করুণার সঙ্গেই। যাহোক, যতুকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম ঃ "কেবল এক কুঁজো জল রেখে দিও যতু।"

যতু, 'নিশ্চয়' বলে প্রস্থান করলে পর আমি বিছানায় শুয়ে ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতে যাব এমন সময় মনে পড়ে গেল একটি পুরোনো গান, নিশুদা গাইত ঃ

কাঁটাবনে ধায় শ্রীরাধা, জ্বলল মণি সাপের মাথায়।
ভয় দেখাতে এসে রাতে, পথ দেখালো তোমার কৃপায়।

সঙ্গে সঙ্গে কানে এল কর্তাবাবুর উল্লসিত কণ্ঠ ঃ "তোরা যা বাপধন! গুরুদেবকে গিয়ে বল আমি লক্ষ্মণ ভাইটিকে ঘুম পাড়িয়েই আসছি—" দোরে শিকল টেনে। "এই এলাম বলে রে!"

একটু পরেই কর্তাবাবুর প্রবেশ ও পরম স্নেহে প্রশ্ন ঃ "কী ভাই! ঘুমুলে?"

আমি ঘুমের ভান করে মিট্কি মেরে চোখ বুঁজে শুয়ে রইলাম। কর্তাবাবু আপন মনেই আর্দ্র কণ্ঠে বললেন ঃ "আহা, একেবারে থ'কে গেছে! তা যাবে না? শ্মশানে গিয়ে মদ খাওয়া"…ব'লে

বিড় বিড় করে কি বললেন শুনতে পেলাম না। একটু বাদে সন্তর্পণে চোখ খুলে দেখলাম মাটিতে ফরাসে দাদা আমার লম্বা। সঙ্গে সঙ্গে নাসিকা-গর্জন।···আমারও চোখের পাতা জুড়ে এল।

ষোলো

সকাল বেলা যখন ঘুম ভাঙল তখন সামনের ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজছে। এত দেরি! ধড়মড় করে উঠতেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কোথায় এসে পড়েছি কোন বিভুঁয়ে! সব মনে পড়ে গেল—অঘটনের সার—একের পর এক।

মনে হাসিও এল আবার—বলিষ্ঠ হাসি। দিনের আলোয় ভরসা এসে গেছে। এবার বাড়ীমুখো হ'লে আমায় ঠেকায় কে? এমনি সময় কর্তাবাবু পাশ ফিরলেন। জানালার একটা খড়খড়ি দিয়ে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে তাঁর মুখে। মনে হ'ল কোথায় যেন দেখেছি এঁকে, কিন্তু অনেক ভেবেও কিছুতে তাঁকে সনাক্ত করতে পারলাম না। উঠে স্নানের ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফিরেই দেখি—যত্ন। সে ডেকে নিয়ে গেল পাশের একটি ছোট ঘরে। বলল: "এটি ছিল ছোটবাবুর পড়ার ঘর।" বলে মৃদু হেসে: "মানে কর্তাবাবুর 'ভাইরে লক্ষ্মণের' ঘর।"

তার পরে আমাকে চা রুটি মাখন মধু দিয়ে যত্ন বলল সব কাহিনী গল্ গল্ করে। কর্তাবাবুর ভাইটির নাম সত্যিই লক্ষ্মণ ছিল, আর সত্যিই লক্ষ্মণ দাদার কাছে চড় খেয়েই গৃহত্যাগ করেছিল মাস ছয়েক আগে। তারপরই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে যত্ন হেসে ফেলল: "রাগ করবেন না বাবু, কিন্তু ছোটবাবুর সঙ্গে আপনার মুখের আদল আছে বলেই কর্তাবাবু কাল আপনাকে গ্রেপ্তার করে এনেছেন।"

আমি বললাম: "আমার সঙ্গে, সে কি! ঠাট্টা করছ নাকি?"

যত্ন জিভ কেটে বলল : "ছি ছি—আপনি কর্তাবাবুর অতিথি, বড় ঘরের ছেলে, আপনার সঙ্গে কি আমি ঠাট্টা করতে পারি? তবে হাসি আমার এক বদঅভ্যেস, কিছু মনে করবেন না।" বলেই ঘরের কোণে এক ছবির পানে আঙুল দিয়ে দেখালো : "ঐ দেখুন না তাঁর ছবি।"

তাকিয়ে সত্যিই অবাক লাগল। সাদৃশ্য এত বেশি যে সত্যিই মনে হয় যেন প্রায় যমজ ভাই। কেবল তার বাঁ গালে একটি বড় তিল ছিল—আমার ছিল না। ছবিটিতে ফুলের মালা ঝুলছে।

মনটা নরম হয়ে এল। কর্তাবাবু মাতাল হোন বা আর যাই হোন না কেন, ভ্রাতৃবৎসল মানতেই হবে। যত্নও বলল আরো ইতিহাস : "কর্তাবাবুর ভাইঅন্ত প্রাণ। ছোটবাবু চলে যাওয়ার পর থেকে এই ঘরেই তিনি মাটিতে বিছানা করে শোন। আর এক পেয়ালা চা—বাবু?"

চা খেতে খেতে যত্নর সঙ্গে গল্প আরো জমে উঠল। সে খুশখেয়ালে অনর্গল কত কথাই যে বলল। সব বলার দরকার নেই, শুধু এইটুকু বলি, শুনলাম কর্তাবাবুর নাম সনাতন সেন। ঘরের কর্ত্রী—তাঁর বিধবা মা—ডাক নাম মামণি—দারুণ দজ্জাল। স্ত্রী—মানে গিন্নীমাই লক্ষ্মণকে মানুষ করেছেন। দেশে মালদহে—কিছু জমিজমা আছে, অবস্থা বেশ ভালোই। তার উপরে আলিপুরে কাজ করেন। এ-ও-তা উপায়েও বেশ দু পয়সা কামান। সত্যিই বেশ সচ্ছল সংসার—কেবল এই ছমাসে বাবু মুষড়ে পড়েছেন ভাইরে লক্ষ্মণ চড় খেয়ে গৃহত্যাগ করার দরুণ। যত্নর কথার বাঁধুনি ছিল। বলল : "ভাইরে লক্ষ্মণের জন্যে কর্তাবাবুর মনস্তাপের আর সীমা নেই—কত খোঁজাখুজি, কাগজে নোটিস, ছবি ছাপানো, লোক পাঠানো এখানে ওখানে—কিন্তু বৃথা! শেষে মনের দুঃখে বাবু এক ভণ্ড জটাধারীর শরণ নিলেন—অবিশ্যি বাবুর চোখে তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গুরুদেব, সবজান্তা, মহাপুরুষ। কিন্তু যত নষ্টের মূল ঐ সন্নিসি।" একটু থেমে যত্ন

বলল : "কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জানেন ? ও কর্তাবাবুকে ভাই ফিরে আসবে ভরসা দিয়ে মদ ধরিয়েছে বটে, কিন্তু সবই ওর ভাঁওতা নয় বাবু ? তাই মনে হয়—কী জানি হয়ত ছোটবাবু ফিরতেও পারে !"

আমি বললাম : "মানে ? দৈবজ্ঞ ?"

যদু বিজ্ঞস্বরে বলল : "তাও বলতে পারেন—সিদ্ধাইও বলা চলে। সিদ্ধাই বলছি এই জন্যে যে, এতে মানুষের কিছু সত্যি-কারের লাভও হয়।"

আমি হেসে শুধালাম : "কী ধরনের লাভ ? ধূলোকে চিনি করা ?"

যদুও হাসল : "না, ও তো তুকতাক, ভেল্কিবাজি। আমি বলছি —অসুখ ভালো করা।" ব'লে স্বর নামিয়ে চোখ বড় বড় ক'রে বলল : "সত্যি বলছি বাবু, স্বচক্ষে দেখেছি, নৈলে বলতাম না একথা। ধরুন না কর্তাবাবুরই কথা। আজ দশ বৎসর ওঁর পেটে কী যে কষ্ট ! ডাক্তারে বলে আল্‌সার না কি। শিবের অসাধ্য রোগ। এ হেন রোগও তো দুদিনে সেরে গেল গুরুজির হাতের একমুঠো ভস্ম খেয়ে।" বলে আরো বিজ্ঞস্বরে : "কি জানেন বাবু ? এসব সন্নিসিরা শ্মশানে-মশানে শবসাধনা করে মা কালীর দেখা পায় কিনা জানি না, কিন্তু কিছু পায়ই পায়, নৈলে অসুখ সারায় কী করে ? কর্তাবাবুর এক উড়ে বন্ধু আছে, ভারি মজার উড়ে গান গায়। তার শক্ত বাতও ও এক সপ্তাহে সারিয়ে দিয়েছে ঐ ভস্মের জোরে। তাইতো কর্তাবাবু ওর এমন নেওটো হয়ে পড়েছেন—তাঁকে ও ঘোরাচ্ছে নাকে দড়ি দিয়ে।" ব'লেই কপাল চাপড়ে : "এই দেখুন না, কর্তাবাবু মদ ছুঁতেন না ও তাঁকে মাতাল বানিয়েছে। রাতে কোনোদিন বাড়ীর বার হতেন না, আজকাল তো প্রায়ই ভোর রাতে বাড়ী ফেরেন মদ খেয়ে। গিন্নিমা কেঁদে কেঁদে সারা। আহা কী সতীলক্ষ্মী যে—মনটা যেন মাখন দিয়ে গড়া—"

গল্পটা চা-রুটির সঙ্গতে বেশ জমে উঠেছিল—এমনি সময়ে রসভঙ্গ হ'ল কর্তাবাবুর এক হাঁকে ঃ "যেদো রে!"

"যাই বাবু!" বলেই যদুর প্রস্থান হন্তদন্ত হয়ে।

বেরুবার উপায় নেই। ওদিকে কর্তাবাবু, এদিকে তালা। মনে প'ড়ে গেল পরমহংসদেবের ছড়া ঃ "উত্তরে কলাগাছ দক্ষিণে পুঁই, একলা কালো বেড়াল কী করব মুই?" অগত্যা জানলার কাছে গিয়ে সামনের অশ্রান্ত যানবাহন ও যাত্রীর চলাচল দেখতে দেখতে ভাবি আথাল-পাতাল—যদি ধরো বাড়ী ফিরে দিদিমাকে বা মামাবাবুকে বলি যা যা ঘটেছিল পর পর, তাঁরা কি বিশ্বাস করবেন কখনো?

সতেরো

সোফিয়া ঃ বলেন কি দাদা! বাড়ী থেকে রাস্তায় বেরুতে পর্যন্ত পারলেন না?

অসিত ঃ বেরুব কেমন ক'রে। কর্তাবাবু আগের দিন রাতে যদুকে বলেছিলেন আমাকে ঘরে বন্ধ ক'রে বাইরে থেকে শিকল লাগাতে। তাছাড়া, ভাবো, তখন ও-ঘরে কর্তাবাবু হাঁক-ডাক করছেন। আমি আর তাঁর সামনে পড়তে ভরসা পাই নি। যদু বলেছিল তাঁর আলিপুরে যেতে হবে—চাকরি তো—রাতে মদ খেলেও দিনে হাজিরি দিতে হবেই। আমি ঠিক ক'রে রেখেছিলাম যে, তিনি বেরুলেই আমি যদুকে মোটা বকশিশ কব্‌লিয়ে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু যতক্ষণ কর্তাবাবু পাশের ঘরে আসীন—চুপচাপ থাকাই বিধি। Discretion is the better part of valour—জানোই তো।

বার্বারা (হেসে) ঃ কিন্তু আপনি যখন বীরত্ব করতে বেরিয়েছিলেন দাদা, তখন নিশ্চয়ই discretion-এর কথা মনে হয় নি?

অসিত (হেসে ফেলে) ঃ বলেছ ভালো। কিন্তু ব্যাপারটা কি

জানো, জীবনে শিক্ষণীয় অনেক কিছুকেই পাশ কাটিয়ে গেছি,আদুরে ছেলের সাতখুন মাফ তো—কেবল একটি শিক্ষাকে গড় করতে বাধ্য হয়েছি বারবার ভুগে : যে, বড়াই করলেই হয় উল্টো উৎপত্তি। —আমাদের একটি শ্লোক আছে—অতি দর্পে হতা লঙ্কা। রাবণ জানো তো—যাকে রাম মেরেছিলেন গো ? ঋষি বলেছেন সে-ও ডুবল বেশি হাঁকডাক ক'রে ? কাজেই বীরত্বের বড়াই ক'রে তুচ্ছ আমি ডুবব এতে আশ্চর্যের কী আছে ?

তপতী (হেসে) : এতে আশ্চর্যের কিছু না থাকতে পারে কিন্তু তুমি যে বুঝেও বোঝ না যে, গল্প বলতে গিয়ে বার বার থম্‌কে দাঁড়ালে গল্প ডোবে—জ্ঞানী হয়েও কিছুতেই ঠেকে শিখতে চাও না একে বলবই বলব পরমাশ্চর্য।

অসিত (হেসে) : বলো, প্রাণ খুলে। কিন্তু এবার তোমাদের শিক্ষা দেবই দেব—সোজা পাড়ি দেব গল্পের রাজপথে এদিকে ওদিকে গোচারণ না ক'রে। অতএব অবহিত হও কান দুটি খাড়া ক'রে। ব'লে থার্মস বোতল থেকে কফি ঢেলে নিয়ে চুমুক দিয়ে অসিত সুরু করল :

আঠারো

রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দুঃখের মধ্যেও মনে গুন গুনিয়ে উঠল একটি রামপ্রসাদী গান :

যে-ভালো করেছ শ্যামা, আর ভালোতে কাজ নাই
(এখন) ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা,
আলোয় আলোয় চলে যাই।

মনে হ'ল—ঠিক, আর না, এই দিনের আলোয়ই ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরতে হবে। বীরত্ব ঢের হয়েছে।

হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম। ফিরে দেখি যতু।

শুধালাম ঃ "এতক্ষণ কী করছিলে ?"

যতু কপাল চাপড়ে বলল ঃ "আর কী করব বলুন বাবু, চোখবাঁধা বলদকে ঘানি-গাছে জুড়ে দিলে সে যা করে তাই। কর্তাবাবুর আপিস যাওয়া তো জানেন না। রাতে মাতাল হলেও দিনে একেবারে ফিটফাট। তাঁর হাজারো হাঁক-ডাকের টাল সামলে, নথিপত্র মোটরে তুলে দিয়ে, আপিস রওনা ক'রে তবে তো ছুটি।"

আমি হেসে বললাম ঃ "তা তো হ'ল। কিন্তু আমাকে ছুটি দেবে কখন ? কী বললেন তিনি ? আমাকে পোষ মানাতে ?"

যতু ফের কপাল চাপড়ে বলল—কপাল চাপড়ানো দেখলাম তার একটা মুদ্রাদোষ ঃ "হা অদৃষ্ট ! আপনার কথা কি আর তাঁর মনে আছে বাবু ? এ আর এক আশ্চর্য। দিনের বেলায় শুধু শেয়ানা নন, পান থেকে চুনটি পর্যন্ত খসে না, কিন্তু মদ খেয়ে যেসব বেলেল্লামি করেন পরদিন কিছুই মনে থাকে না তাঁর—একেবারে ফর্সা, বেভুল ! তাই তো গিন্নিমা এত কান্নাকাটি করেন—'হায় হায় এমন চতুর মানুষটা কিনা শেষে ফতুর হতে চলল !' হ্যাঁ ভালো কথা বাবু, আজ ভোরেই মামণি জেরা সুরু করেছিলেন—তাঁর চোখ কান তো এড়াবার জো নেই। কাজেই বলতে হ'ল সব কথা খুলে। শুনতে শুনতে গিন্নিমার চোখ ছল ছল ক'রে উঠল, বললেন ঃ 'আহা, কোনো ভালো মানুষের পো রে !' মামণি অমনি ঝংকার দিয়ে বললেন ঃ 'ভালো মানুষের পো-র নিকুচি করেছে। ওকে বিদেয় ক'রে দে এক্ষুণি।' গিন্নিমা বললেন ঃ 'আহা, অতিথ্ দেব্‌তা—দুপুরে খাইয়ে দাইয়ে'—অম্‌নি মামণি ফের তড়বড়িয়ে উঠলেন ঃ 'অতিথ্ না হাতী ! শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায় কারা ! দেবতা না অপদেব্‌তা ! আমি তোমাকে বলছি বৌমা লিখে রাখো—ও নির্ঘাৎ পকেটমার। না, এক্ষুণি ওকে বিদেয় ক'রে দে বলছি।' গিন্নিমা বললেন ঃ 'না মা, আপনার দুটি পায়ে পড়ি। শুনছি উনি ঠাকুরপোর মতন দেখতে। একবার

দেখতে চাই। তার মুখের সঙ্গে আদল আছে, দেখলেও প্রাণ জুড়োবে।'—ব'লে আঁচলে চোখ মুছলেন। মামণি একটু নরম হয়ে বললেনঃ 'আচ্ছা, ডেকে আন্ ওকে—দেখি কী রকম চেহারা। আমার মন ভগবান—চোর-ছ্যাঁচড় দেখলেই চিনতে পারি।' চলুনই না বাবু দর্শন দিতে একবার।"

আমারও কৌতূহল জেগে উঠল, দেখাই যাক না কেমন এই গিন্নিমা—যাঁর বুকে এত মায়া মমতা। গেলাম যত্নর পিছনে পিছনে—আর কিছু না হোক একটা নাটকের মত নাটক যে ঘটছে এতে তো আর ভুল নেই।

উনিশ

উঠোন পেরিয়েই সিঁড়ি। উঠলাম দোতলায়। একটি খাসা ঘর—বুঝলাম কর্তাবাবুর অবস্থা সত্যিই ভালো। মাটিতে এক মোটা কার্পেটে ব'সে বৃদ্ধা মামণি। খাঁড়ার মতন নাক, মাথায় টাক, পাশে মস্ত রূপোর পানদানি। সুর ক'রে কৃত্তিবাস রামায়ণ পড়ছেনঃ

"রাজ্যখণ্ড ছাড়ি' রাম যান বনবাসে
শিরে হাত দিয়া কাঁদে সবে নিজ বাসে।"

আমি হাজিরি দিতেই চশমার উপর দিয়ে মাষ্টারণীর মতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে মামণি বললেনঃ "এই যে ছেলে! বোসো—মাটিতেই!" সঙ্গে সঙ্গে গিন্নিমা পাশ থেকে ব'লে উঠলেনঃ "না না, মাটিতে কেন বসবে ভালমানুষের পো! বোসো ভাই—কার্পেটেই ঐখানে।" আমি কৃতজ্ঞচিত্তে বসলাম কার্পেটে। গিন্নিমা ছিলেন মাথায় কাপড় দিয়ে। শ্রীমন্তিনী বটে। ডাগর চোখ দুটি জলে ভরা। দেখেই মন নরম হয়ে এল। ছেলেবেলায় হারানো মার কথা মনে প'ড়ে গেল।

মামণি শুধালেনঃ "কী নাম তোমার ছেলে?"

আমি বললাম ঃ "মনোমোহন চৌধুরী।"

মামণি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন ঃ "নাম তো নয়—উপাধি। মনোমোহনই বটে, উস্কোখুস্কো চুল, ময়লা কাপড়, পিরানের হাতা ছেঁড়া, কনুই ছ'ড়ে গেছে দেখছি,—শ্মশানে মদ খেয়ে বেলেল্লামি করেছিলে বুঝি ?"

গিন্নিমা টুকলেন সন্তর্পণে ঃ "কী বলছেন মা ?"

মামণি ঝাঁঝালো সুরে বললেন ঃ "কী বলছি ! বলছি হক কথা —আর কি ? দেখছ না নয়নমোহনের রূপের জৌলুষ ! মরি মরি ! —তা বলো তো ছেলে, তোমার বাপের নাম কি—না তাও জানো না ?"

রাগ সামলে বললাম ঃ "জানব না কেন ? জগমোহন চৌধুরী।"

মামণির দৃষ্টি আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চক্র দিল আর একবার, বললেন ঃ "চাঁড়াল-টাড়াল নও তো বাছা ? সত্যি বলো।"

আমি বললাম উষ্ণ সুরে ঃ "চাঁড়াল হব কী দুঃখে ? আমরা ব্রাহ্মণ, নিকষ কুলীন।"

মামণি ব্যঙ্গ হেসে বললেন ঃ "নিকষ কুলীনের মতনই চেহারা বটে—মরি মরি ! একেবারে ঝোড়ো কাক। কিন্তু গায়ে তো খাসা পুরু ধোসা দেখছি—চুরির মাল নয় তো ?"

এবার রাগ সামলানো একটু কঠিন হয়ে উঠল। একটা কড়া জবাব দিতে যাব এমন সময় গিন্নিমা ফের টুকলেন নরম সুরে ঃ "ভদ্দরলোকের ছেলেকে কি নাহক চোর বলতে আছে মা ?"

মামণি চোখ থেকে চশমা নামিয়ে খনখনে সুরে বললেন ঃ "তুমি থামো বৌমা ! ভদ্দরলোক হওয়া অম্‌নি মুখের কথা নাকি ?" ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "কাল শ্মশানে গিয়েছিলে কেন শুনি ?"

আমি বললাম ঃ "এম্‌নি।"

মামণি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন: "এম্‌নি? কী করো তুমি? পড়াশুনো ছেড়ে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াও-ই বা কী দুঃখে শুনি?"

আমি বললাম: "বীরভূম থেকে কলকাতায় এসেছি চাকরি খুঁজতে।"

মামণি বললেন: "মিথ্যে কথায় তো এর মধ্যেই বেশ পাকা হয়ে উঠেছ দেখছি। শ্মশানে কি চাকরি মেলে নাকি?"

আমি কারে প'ড়ে প্রথম সত্যি কথা বললাম, বা অর্ধসত্য বলাই ভালো: "এক মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্গে এসেছিলাম তাঁর দেহ দাহ করতে।"

গিন্নিমা হঠাৎ উঠে গিয়ে শাশুড়ীর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কী বললেন। মামণি শুনে ভ্রূভঙ্গি ক'রে "তুমি চুপ করো বৌমা" ব'লে আমাকে বললেন: "তুমি যে চাকরি করতে চাও বাছা—তা—কী ক'রে বুঝব তুমি ভদ্দর ঘরের ছেলে, বেরাহ্মণ? কারুর চিঠি-টিঠি আছে?"

গিন্নিমা এবার একটু জোর দিয়েই বললেন: "কী যে আপনি বলেন মা? ভালোমানুষের পো এসেছে কোন মফঃস্বল থেকে—তোমার ঘরে কে আছে ভাই?"

আমি বললাম: "কেউ নেই! মা বাবা দুজনেই মারা গেছেন কলেরায় মাসখানেক আগে। বৌদি ঘরে রাখতে চান না।"

গিন্নিমার চোখ জলে ভ'রে এল: "আহা রে! মা, ওকে আমাদের খোকাখুকুর মাষ্টার রাখুন। আপনার দুটি পায়ে পড়ি।"

মামণি চ'টে গেলেন: "তুমি থামবে বৌমা? কথায় কথায় চোখের জল! জানো না কিছুই—আচ্ছা শোনো, এই ছেলে! তুমি কে কী বৃত্তান্ত না জেনে কেমন ক'রে তোমাকে খোকাখুকুর ম্যাষ্টের রাখি বলো তো? কী ক'রে জানব যে, তুমি শাল-দোশালা হাতিয়ে স'রে পড়বে না?"

আমি বললাম পিঠ পিঠ ঃ "আজ্ঞে, আমাদের বাড়ীতে শাল-দোশালার অভাব ছিল না কোনো দিনই।"

মামণি ভুরু উঁচিয়ে বললেন ঃ "বটে ? অথচ ঘুরে বেড়াও শ্মশানে-মশানে ! ঘরে এতই যদি শাল-দোশালার ছড়াছড়ি তবে তা মুড়ি দিয়ে নব কাত্তিকটি সেজে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ালেই তো পারতে ?—মরুকগে। শোনো, এই ছেলে ! বৌমা একটা কথা মিথ্যে বলে নি : তোমার মুখের সঙ্গে লক্ষ্মণের সত্যিই আদল আছে ঃ আমারও মনে হচ্ছে তুমি আর যাই হও চোর-টোর নও।"

আমি থাকতে পারলাম না, বললাম ইংরিজিতে ঃ "Many thanks !"

মামণি বললেন ঃ "হুম্। ইংরিজিও জানো দেখছি। আচ্ছা দেখ, এই ছেলে ! আমাদের খোকাখুকীর জন্যে একটা ম্যাষ্টের খুঁজছি। তাদের পড়াতে পারবে ?"

আমি বললাম ঃ "কেন পারব না ?"

মামণি বললেন, মুখ ভেংচে ঃ "কেন পারবে না ? বলি, বিদ্যে থাকলে তবে তো পারবে ?"

গিন্নিমা বললেন ঃ "কেন এসব কথা বলছেন মা, ওকে দুদিন পড়াতে দিয়েই দেখুন না। আপনার সব তাতেই সন্দেহ—একটা বাতিকের মতন হয়েছে।"

মামণি সুর একটু নামিয়ে বললেন ঃ "সন্দেহ করি কি সাধে বাছা ? এই গেল মাসে এক ম্যাষ্টের এসেছিল সে খোকাকে এমন বিষম চড় মেরেছিল—"

আমি বললাম ঃ "আমাকে বাবা মা কোনদিন চড় মারেন নি, আমিও কখন কাউকে চড় মারি নি। তবে মিথ্যে এতশত তকরারে ফল কী – যখন আপনি মুখ খারাপ করছেন তখন আমি চলি।"

মামণি বললেন ঃ "হুঁম্। মেজাজী মানুষ দেখছি। বিষ নেই

কুলোপানা চক্র !—মরুকগে। শোনো বাছা, তোমাকে খোকাখুকীর ম্যাষ্টের বাহাল করতে পারি—কেবল ব'লে রাখছি মুখ বুঁজে কাজ করতে হবে। কথার উপর কথা বললেই গলাধাক্কা।"

এবার আমার মাথায় রক্ত চ'ড়ে উঠল! কিন্তু আমি জবাব দেবার আগেই গিন্নিমা কোমল কণ্ঠে বললেন: "তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই! মামণির অম্‌নি ধমকানো স্বভাব। তুমি এখানে থাকো। খোকাখুকীর সঙ্গে তোমার বেবনতি হবে না। কেন শুনবে? তোমার মুখের সঙ্গে ঠাকুরপোর মুখের আদল আসে। পাশ থেকে দেখলে মনে হয় যেন তার মুখ বসানো। খোকাখুকীর—মানে, কাকা-অন্ত প্রাণ। তোমাকে তারা ভালোবাসবেই বাসবে। খোকা একটু দুরন্ত—কিন্তু একটু ভালোবাসলেই বশ মানবে। ঠাকুরপো আমার বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে"—ব'লে আঁচলে চোখ মুছে—"তাই তোমাকে দেখে মায়া করে। তুমি থাকো। কেবল একটা কথা: মামণি একটু রাগী মানুষ—তাই কখনো কড়া কথা বললে কিছু মনে কোরো না। মনটা তাঁর গঙ্গাজল।"

মামণি একটু নরম হয়ে বললেন: "বৌমার যে একটু বেশি নরম প্রাণ বাছা, তাইতো আমাকে কড়া হ'তে হয়—সামলাতে। তা শোনো—তুমি যদি কাজ ঠিক করো তো আমি কথাটি বলব না। আমাকে তুষ্ট রাখলে আমি রুষ্ট হই না কক্ষনো। আর, আর কী? হ্যাঁ—তোমাকে খেতে পরতে দেব—আর মাসে পনেরটি টাকা মাইনে। আর বছরে এক জোড়া ধুতি পিরাণ আর দুজোড়া গামছা। কাজের মধ্যে তোমাকে শুধু খোকাখুকীকে পড়াতে হবে, আর—হ্যাঁ, রোজ বাজার করতে হবে।"

গিন্নিমার কথায় মনটা সত্যিই নরম হয়ে এসেছিল—তখন অল্প বয়েস তো, অ্যাডভেঞ্চারের নামেই মন খুশি। মন্দ কী? সাম্‌নে ছুটি আছে। দুদিন এখানে গা ঢাকা হ'য়ে খোকাখুকীর ম্যাষ্টের হ'য়ে দেখাই যাক না—একটা নতুন অভিজ্ঞতা তো হবে। আর

মামাবাবুও শায়েস্তা হবেন, ভাবতেও আনন্দ! কিন্তু ঐ বাজার করতে হবে শুনেই দ'মে গেলাম। অস্ফুট স্বরে বললাম: "আজ্ঞে? বাজার!"

মামণির নরম সুরও মুহূর্তে গরম হ'য়ে উঠল, বললেন: "হ্যাঁগো হ্যাঁ। ব-য়ে আকার বা, জ-য়ে আকার জা আর র জুড়লে যা হয়। নৈলে মাস মাস পনেরটি ক'রে যে ট্যাঁকশালের চাকী দেব সেকি শুধু নীল জল লাল ফল পড়াতে? এর আগের ম্যাষ্টেরকে দিতাম মাত্তর বারোটি করে চাকী, তা তুমি যখন কলেজে পড়েছ বলছ তখন তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে তোমাকে রাখছি। কিন্তু দেখো বাছা, অধর্ম কোরো না, মাথার দিব্যি রইল। শোনো, এই ছেলে! আজ এখনি বেরোও যতুর সঙ্গে, সে তোমাকে বাজার করা শিখিয়ে দেবে। এই নাও দুটি টাকা। মাছ আট আনার, আলু ছ' আনার, পটোল তিন আনার, পালংশাক তিন আনার, দু আনার গুড় আর দু' আনার ডুমুর—আর কী, বৌমা?"

গিন্নিমা বললেন: "আজ রোদ্দুর চড়ে গেছে মা, যতুই বাজার ক'রে আনুক না রোজকার মতন।"

মামণি ফের রেগে উঠলেন: "রোজকার মতন! মানে? যতুটার যে হাতটান আছে জানো না না কি? ম্যাষ্টের থাকলে ও বাজারের পয়সা সরাতে পারবে না—বুঝলে? তোমার আর কী বলো! টাকা তো কোনোদিন রোজগার করতে হয়নি—তাই দয়া করতে পারো একে ওকে তাকে। চোখ চেয়ে দেখ না তো সনুবাবুর আমার কত কষ্টের রোজগার বারো ভূতে লুটে পুটে খাচ্ছে। কিন্তু আমি ছিদাম গুপ্তের মেয়ে কুড়োরাম সমাদ্দারের নাৎনি, আমাকে যে ঠকাবে সে আজো জন্মায় নি, বুঝলে?"

ঠিক এম্‌নি সময়ে খোকা-খুকী ছুটে এল একসঙ্গে। দুটিই ফুটফুটে শিশু। খোকার বয়স দশ, খুকীর নয়। আমাকে দেখেই 'কাকাবাবু' 'কাকাবাবু' ব'লে দৌড়ে এসে পেছিয়ে গেল। খোকা বলল: "ধ্যেৎ!

কাকাবাবু নয়।" খুকী ভয় পেয়ে গিন্নিমার আঁচল ধ'রে বসল তাঁর কাছে।

আমি হেসে খোকার কাছে একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম: "আমি তোমাদের কাকাবাবুর কাছ থেকেই এসেছি ভাই। এসো ভাব করি!"

খোকা উজিয়ে উঠল: "কাকাবাবুর কাছ থেকে? তাঁর কাছে আমায় নিয়ে চলুন না?"

আমি বললাম: "তার দরকার হবে না। কাকাবাবু বলেছেন তোমাদের আমার কাছে ইংরেজি শিখতে হবে। যেই ইংরিজিতে কথা বলতে পারবে দেখবে তিনি এসে হাজির।"

খোকা বলল: "তাহলে আমি শিখবই শিখব ইংরিজি।"

খুকী ভরসা পেয়ে বলল: "আমিও। কিন্তু কাকাবাবু আসবেন তো আমরা ইংরিজি শিখলে?"

আমি বললাম: "নিশ্চয়।"

খোকা বলল: "কথা দিয়েছেন?"

আমি অম্লান বদনে মিথ্যে কথার ফুলঝুরি কেটে চললাম একটানা: "দিয়েছেন শুধু নয়—তিন সত্যি করেছেন—আসব আসব আসব আর আরো ভালো বাসব বাসব বাসব।"

খুকী কাঁদো কাঁদো সুরে বলল: "কিন্তু তিনি চ'লে গেলেন কেন তাহলে?"

আমি বললাম: "ফিরে এসে আরো ভালোবাসতে।"

গিন্নিমা হঠাৎ ঝর ঝর ক'রে কেঁদে ফেললেন: "তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ভাই। এই কথাই যেন সত্যি হয়।"

এবার মামণিও আঁচলে চোখ মুছলেন, বললেন: "আচ্ছা আচ্ছা আজ তোমাকে বাজার করতে যেতে হবে না, কাল যেও। যাও ওদের একটু গল্প বলো।"

খোকা বলল: "আপনি গল্প জানেন?"

আমি বললাম ঃ "জানি না তো কি ? তোমাকে কাকাবাবুর কত গল্পই যে বলব।"

খুকী ভরসা পেয়ে এসে আমার ধোসা চেপে ধরল ঃ "আর আমাকে ?"

আমি তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললাম ঃ "তোমাকেও বলব।"

খোকা বলল ঃ "না, আগে আমাকে।"

খুকী কাঁদো কাঁদো সুরে বলল ঃ "না, আগে আমাকে। ও ভারি দুষ্টু।"

খোকা বলল ঃ "আর ও যে দজ্জাল—মামণির চেয়েও।"

মামণি রেগে উঠে বললেন ঃ "বটে—বজ্জাত ছেলে! আচ্ছা তাহলে এখন ও গল্প বলবে না—যদু! অ যদু!"

যদু বাজারের ঝুড়ি নিয়ে আসতেই মামণি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন ঃ "ও হল খোকাখুকীর ম্যাষ্টের। রোজ বাজার করবে তোর সঙ্গে। যা তুই ওকে নিয়ে সঙ্গে ক'রে।"

খোকা বলল ঃ "আমিও যাব মা!"

মামণি বললেন ঃ "তুই যাবি বাজারে ? পাগল না ক্ষ্যাপা ? না—কান্না নয়। এই! এক্কেবারে চুপ। ও বাজার করে এসে তোদের পড়াবে, কিন্তু গল্প বলবে না একটিও। যা মুখে আসে তাই বলবি আর পাজি ছেলে ?—না, এই ছেলে! যাও তুমি বাজারে—এক্ষণি, আর কথাটি না। হ্যাঁ, আর এই সঙ্গে দুটো ঝুড়ি নিয়ে যাও বাছা, একটা ঝুড়ি তুমি নেবে, আর একটা যদু। বুঝলে ? মুটে ডেকোনা যেন। আজকাল মুটেরাও চায় দু আনা।"

যদু আমার গা টিপল পাশ থেকে। আমি বেরিয়ে তার সঙ্গে নিচে আসতেই বলল ঃ "কিচ্ছু ভয় নেই বাবু। মামণির মুখই ঐ রকম। আপনি ভাববেন না। ঝুড়ি একটা নিলেই চলবে—আর আমিই বইব। আপনি এসে শুধু বলবেন না কিছু, বুঝলেন ? মানে

এমনি ভাব দেখাবেন যে একটা ঝুড়ির মোট আপনি রয়েছেন। মামণিকে ঠকানো খুব সোজা।”

কুড়ি

সোফিয়া হেসে কুটি কুটি ঃ কী কাণ্ড দাদা! ডন কুইক্সট মিডীভাল—এমন কথা এর পরে আর কে বলতে সাহস করবে?

বার্বারা (হেসে) ঃ যা বলেছিস সোফি! (অসিতকে) আর আপনিও বলছিলেন না একটু আগে যে, বেশি হাসলে কান্না হানা দেয়ই দেয়? আমার মনে পড়ল একটা বিখ্যাত ছড়া—আপনিও নিশ্চয় শুনেছেন?—

There was a young lady of Niger,
Who rode with a smile on a tiger.
They returned from the ride,
With the lady inside
And a smile on the face of the tiger.*

অসিত (উচ্ছল হাস্যে) ঃ যা বলেছ দিদি—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ভুগেছি বীরত্বের কর্মভোগ—আর সে এমন ভোগা যে, বোধ হয় সে-রাত্রে বাঘের পেটে ঠাঁই পেলেও ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতাম তাঁর 'লজ্জানিবারণ' উপাধির স্তবগান ক'রে। না, ঠাট্টা নয়। লোকে

---

*নাইগারে এক বীরবালা প্রাতে উঠে রুখে
চড়ল ঘোর এক বাঘের পৃষ্ঠে কৌতুকে;
ফিরল যখন দুজনায় ঘরে,
ছিল বীরবালা বাঘের উদরে,
বাঘটি কেবল ফিরে এল ওরে, হাসিমুখে!

কথায় কথায় বলে শুনি যে, এ-যুগে আর অঘটন ঘটার জো-টি নেই। শুনে আমি কেবল হাসি। কারণ বিবাগী বন্‌তে না বন্‌তে যে-অঘটনের সূত্রপাত সেদিন হয়েছিল আজও তো তারই জের টেনে চলেছি।

সোফিয়া (হেসে) ঃ একথা কাটবার জো নেই দাদা, তাই ব'লে চলুন।

অসিত (কফির পেয়ালা শেষ করে) ঃ কী বলছিলাম ? হ্যাঁ। সাহেব বা মেমসাহেবকে ফ্যাশনেব্‌ল ম্যুনিসিপাল মার্কেটে বাজার করতে দেখলেও খিদিরপুরের বাজারে ঢুকতে না ঢুকতে প্রাণ আমার অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। নিজে বাজার কখনো করি নি তো বটেই, চোখেও দেখি নি কোনোদিন। সবচেয়ে অসহ্য ঠেকল মাছের বাজারের দুর্গন্ধ। নাকে কাপড় দিতে হ'ল।

তোমাদের শেক্সপীয়র বলেছেন দুর্ভাগ্য একা আসে না, আসে সৈন্যদের মতন দল বেঁধে। একটুও বাড়িয়ে বলেন নি কবি। উঃ সেদিন দুর্দৈব ঢুঁ মারল—সে কি একটা ! এক ফাজিল ছেলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার হাতের একটা ছড়ি আমার পাঞ্জাবীর পকেটে বেধে গেল। সে ভ্রূক্ষেপও না ক'রে টান দিতেই আমার পকেট ছিঁড়ে চৌচির। কনুয়ের কাছে তো হাতাটা আগেই ছিঁড়ে গিয়েছিল তার উপর হাতে ঝুড়ি। যদু বলেছিল বটে ভরসা দিয়ে যে, দুটো ঝুড়ি লাগবে না, কিন্তু মামণির চোখ এড়ায় নি। খোকাকে দিয়ে ঝুড়ি পাঠিয়ে দিলেন। অগত্যা আমি ভরসা না পেয়ে ঝুড়িটা নিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে—যদি একটাতে শাক-সবজী সব না ধরে তবে অন্যটা কাজে লাগবে ভেবে।

এমন সময় যদু তার ঝুড়িটায় কী কী সব কিনে বাইরে এসে আমাকে বলল ঃ "এ ঝুড়িটা ফুটপাতে রেখে যাচ্ছি। একটু চোখ রাখবেন বাবু। ও-ঝুড়িটা এবার আমায় দিন—গিন্নিমা কিছু মিষ্টি আর ফল কিনে আনতে বলেছিলেন আপনার জন্যে। কিন্তু লুকিয়ে

নিয়ে যেতে হবে—নৈলে মামণি রক্ষে রাখবেন না। শুনলেন তো—তাঁর সন্তুবাবুর পয়সা বারো ভূতে লুটেপুটে খাচ্ছে কী ভাবে দল বেঁধে?" ব'লেই ঝুড়িটি ফুটপাতে নামিয়ে আমার হাত থেকে ঝুড়ি নিয়ে চ'লে গেল।

নিরুপায়। ফুটপাথে ঝুড়ি—আমি ঠায় চেয়ে আছি হেঁটমুখে: যদি চেনা কোনো মুখ চোখে পড়ে—ভাবতেও বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে।

হঠাৎ চোখে পড়ল ওদিককার ফুটপাথে একটি চায়ের দোকান। ভাবলাম—মোড়টা পেরিয়েই তো দোকান—যাওয়াই যাক না। তাছাড়া চায়ের দোকানে আত্মগোপন করলে কেউ দেখতেও পাবে না—ভালোই হবে।

কিন্তু ঝুড়িটা ফেলে তো যাওয়া যায় না। কী করি? ভেবেচিন্তে দুর্গা ব'লে ঝুড়ি কাঁধে ক'রে ফুটপাথ থেকে সবে রাস্তায় নেমেছি মোড়ের মাথায়—এমন সময় ডান পাশের এক রাস্তা থেকে একটা মস্ত মোটর ভোঁক ভোঁক করতে করতে বাঁদিকেই বেঁক নিল। আমি চম্‌কে উঠে লাফ দিতেই মাডগার্ডের ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলাম—ঝুড়িটাও প'ড়ে গিয়ে মামণির পটোল আলু পালংশাক সব ছত্রাকার! মোটর থেকে পাঞ্জাবী সারথি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল: "গিয়া, গিয়া—স্‌-সালা বেউকুফ্‌!"

সারথির সঙ্গে মোটরের আরোহীও মাটিতে লাফিয়ে পড়লেন। চক্ষের নিমেষে চারিদিকে ভিড় জ'মে গেল।

বিহ্বল ভাবটা কতক্ষণ ছিল জানি না, বোধ হয় মিনিটখানেক হবে। যখন সাড় এল, দেখি—আমি আমার দাদুর বাহুবন্ধনে।

অস্ফুটস্বরে বললাম: "দাদু!"

দাদু বললেন: "খিদিরপুরে এক রুগী দেখে বেরুচ্ছি—এমন সময়ে—"

আমি বললাম: "যদু....."

দাদু বললেন ঃ "যদু আবার কে ? এখন বাড়ী চল্ তো আগে। তোর দিদিমা তার পেয়ে কাল রাতের ট্রেনেই রওনা হয়ে আজ সকালে ফিরে কেঁদে সারা। চল্—বীরসিং ! পাকড়ো !"

ভীমকায় বীরসিং আমাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে মোটরের পিছনের সীট-এ শুইয়ে দিল। দাদু বসলেন বাইরে—সারথির পাশে।

একুশ

বাড়ী ফিরতেই দিদিমার সে কী কান্না ঃ "ওরে অসিত, কোথায় গিয়েছিলি রে !—" ব'লেই ঃ "ওমা ! একী গো ! রক্ত !"

আমি বললাম বীর ভঙ্গিতে ঃ "ও কিছু নয় দিদিমা, একটু ছ'ড়ে গেছে—রাস্তায় টক্কর খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলাম—"

দাদু ধম্‌কে বললেন ঃ "ও কিছু নয় ? মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিস বহু ভাগ্যে।" ব'লে দিদিমাকে সব বৃত্তান্ত বললেন বেশ ফলিয়েই।

মামাবাবু এসে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন, বললেন ঃ "কিন্তু ঝুড়ি হাতে ক'রে তুই খিদিরপুরের বাজারে—ব্যাপার কি ?"

দাদু রূক্ষ স্বরে বললেন ঃ "সে সব হবে। তুই আগে টেলিফোন কর মেডিকাল কলেজে। এক্সরে করাতে হবে। যা পড়ান্টা পড়েছে—দেখতে হবে কোন খচি-টচি ন'ড়ে গেছে কিনা। আর একটু হ'লেই হয়ে গিয়েছিল আর কি। মাডগার্ডটার ঘেঁষ লেগেছিল কোমরে—ব্যাণ্ডেজ আন।"

কোমরে লেগেছিল বিলক্ষণ। রক্তও ঝরছিল। কোনো গুরুতর আঘাত লাগে নি, কিন্তু দাদু শুনলেন না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এক্সরে করা হ'ল—দেখা গেল হাড় সব ঠিকই আছে।

তখন ফের সুরু হ'ল দিদিমার মুলতুবি-করা কান্না : "বড় বেঁচে গেছিস রে ভাই—ঠাকুরের কৃপায়। আমি মা কালীর মন্দিরে জোড়া পাঁঠা মানত করেছিলাম ব'লেই......"

দাদু বললেন : "কান্না রাখো! ও যে-পড়ান্‌টা পড়েছে—ব্রেনে চোট লেগেছে কিনা কে জানে। না—উঠতে পাবি না। চুপ ক'রে শুয়ে থাক্।"

মামাবাবু বললেন : "হ্যাঁ, সাবধানের মার নেই।"

বাইশ

বিকেলে দাদু দিদিমাকে নিয়ে মোটরে ক'রে রোজকার মতন হাওয়া খেতে গেলেন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হয়ে লাল রাস্তায়। আমি সুবিধা পেয়ে সোজা মামাবাবুকে গিয়ে বললাম : "মামাবাবু, আপনার মোটরে একটিবার বেরুই ?"

মামাবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন : "বলিস কি ? বাবা যে বললেন তোকে শুয়ে থাকতে ?"

আমি বললাম : "আমার কিছু হয় নি। আপনি তো জানেন ওঁরা কী রকম একটুতেই ব্যস্ত হন। আমি একবার যাব খিদিরপুরে।"

মামাবাবু বললেন : "কী করতে ?"

আমি বললাম : "সে বলব পরে। এখন আপনার মোটরটা পেতে পারি কি ?"

মামাবাবু ভেবে বললেন : "আচ্ছা যা।" ব'লে বললেন আদর ক'রে : "আর দেখ্ বাবা, এই কুড়ি টাকা নে—সন্দেশ-টন্দেশ বা চকোলেট-টকোলেট কিছু—বুঝলি না ?"

আমি উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বললাম : "এ বোঝা তো শক্ত নয় মামাবাবু! অনুতাপে তনু দগ্ধ!"

মামাবাবু হেসে ফেললেন: "যা, ফাজিল ছেলে! মার খাস কি তুই সাধে?" ব'লে সারথিকে ডেকে বললেন: "ওরে মধু—অসিতকে নিয়ে যা যেখানে ও যেতে চায়।" ব'লেই আমাকে: "কিন্তু ফিরতে দেরি করিস নে। নৈলে মা কুরুক্ষেত্র করবেন। জানিসই তো তাঁর আদিখ্যেতা আদুরে গোপালটিকে নিয়ে। বাপ্ রে বাপ্—কী বকুনিটাই খেলাম তোকে সামান্য একটা চড় মেরে।"

আমি টুকলাম: "একটা নয় মামাবাবু—তিনটে। আর সামান্য নয়—বিরাশি সিক্কা—"

মামাবাবু হেসে ফেললেন: "যাঃ—ফাজিলের সর্দার! কিন্তু দেরি করিস নে—বুঝলি?"

আমি বললাম: "না মামাবাবু, আমি যাব আর আসব। কেবল—আরো দশটা টাকা দেবেন?"

মামাবাবু বললেন: "আরো দশটাকা? কি করবি?"

আমি বিজ্ঞস্বরে হেসে বললাম: "সে হবে। দিন তো আগে।"

মামাবাবু কী আর করেন, দিলেন প্রায়শ্চিত্তের প্রতিভূ দশটাকার আর একটি নোট ধ'রে।

"ধন্যবাদ মামাবাবু," ব'লে ফিরেছি, এমন সময় মামাবাবু বললেন: "আর শোন্ অসিত! এই রেশমি চাদরটা নে। তোর জন্যে আজই কিনেছি।"

আমি মামাবাবুকে প্রণাম ক'রে বললাম: "কেবল একটি নিবেদন—আমাকে মাঝে-মধ্যে দয়া ক'রে একটু মারধোর করবেন। দিদিমার ভাষায়: 'এর নাম তো রাগ নয় লক্ষ্মী'।"

মামাবাবু হা হা ক'রে হেসে বললেন: "যাঃ, ফোক্কড় কোথাকার!"

তেইশ

আমি মামাবাবুর টকটকে রাঙা রেশমি চাদর উড়িয়ে, পায়ে বাহারে স্থঁড়-তোলা মারাঠি চটি চড়িয়ে, হাতে রূপো বাঁধানো বেতের ছড়ি তুলিয়ে মামাবাবুর মস্ত ডেমলার মোটরে চেপে গেলাম প্রথম ম্যুনিসিপাল মার্কেটে। সেখানে কিছু দামী খেলনা চকলেট টফি ও তুবাক্স বিস্কুট কিনলাম খোকা-খুকীর জন্যে। তারপর আমার স্থটকেসে সেগুলি পুরে বললাম সারথিকে ঃ "চলো খিদিরপুর।" রেশমি চাদরটা দোকানেই প্যাক করিয়ে রাখলাম একটি চমৎকার প্ল্যাস্টিকের মোড়কে।

* * *

সন্ধ্যা সাতটা হবে। যত্ন দাওয়ায় একা ব'সে খইনি খাচ্ছে। আমার প্রকাণ্ড মোটর গিয়ে ভোঁক ভোঁক করতেই চম্‌কে লাফিয়ে উঠে ছুটে এল ঃ "একী! মাষ্টারবাবু! আমি খুঁজে খুঁজে— কোথায় গিয়েছিলেন ?"

এদিকে আমার সারথি রাজরথের দোর খুলে ধরল। আমি নেমে যতুকে বললাম ঃ "যাব আর কোথায় যত্ন ?" ঝুড়ি নিয়ে পালাতে।—শাল-দোশালা যখন পেলাম না তখন ঝুড়ি ঝুড়িই সই।"

যত্ন জিভ কেটে বলল ঃ "ছি ছি, অমন কথা বলে বাবু। আমি কিন্তু এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছিলাম—"

আমি বললাম ঃ "তুমি খুব হুঁশিয়ার মানুষ যত্ন, এই নাও পাঁচটাকা—তোমার পান খইনি খাবার জন্যে। আর ধরো এই স্থটকেসটা—খেলনা আছে খোকা-খুকীর—বলতে না বলতে ওরা এসে প'ড়ে হল্লা স্থরু ক'রে দিল ঃ "মাষ্টারবাবু, মাষ্টারবাবু! কোথায় গিয়েছিলেন!" ব'লেই তুজনে আমার তুহাত ধ'রে টানতে

টানতে সোজা ভিতরে নিয়ে গেল। উঠোনে একেবারে খোদ মামণির সঙ্গে মুখোমুখি!

"এই যে"—মামণি উঠলেন ঝংকার দিয়ে—"কোথায় পালিয়েছিলে বাছা, ঝুড়ি নিয়ে?"

যদু আমার পিছনেই ছিল আমার সুটকেশ হাতে দাঁড়িয়ে, বলল ঃ "চুপ করুন মা, বাবু মোটরে ক'রে এসেছেন—মস্ত মোটরে—"

মামণি হকচকিয়ে গিয়ে বললেন ঃ "মস্ত মোটরে! বাবু! বলিস কিরে!"

আমি যদুর হাত থেকে সুটকেশ নিয়ে খুলে পর পর খেলনা ও বিস্কুট বার ক'রে বললাম ঃ "আলু পটোল সব প'ড়ে গেছে মা, রাস্তায়—তাই বদলে এসব দিয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি। পাব তো?"

এম্‌নি সময় কর্তাবাবু বেরিয়ে এলেন ঃ "কে রে, যেদো?"

আমি বললাম ঃ "আজ্ঞে আমি। খোকাখুকীর মাষ্টার পদ পেয়েছিলাম আজই সকালে। আমার নাম অসিতকুমার। থাকি আলিপুরে! আমার দাদুর নাম হয়ত আপনি শুনে থাকবেন—শ্রীঅতুল্যকুমার লাহিড়ী, ডাক্তার।"

কর্তাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন ঃ "বলেন কি? আপনি অতুল্যবাবুর নাতি?"

আমি হেসে বললাম ঃ "হ্যাঁ। তবে আজ সকালে ভোল বদ্‌লে হয়েছিলাম আপনার খোকাখুকীর ম্যাষ্টের প্লাস বাজার সরকার। মামণি আমায় চেনেন।"

কর্তাবাবু যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না, বললেন ঃ "আপনি—আপনি—মানে অমূল্যবাবুর"—

আমি পাদপূরণ করলাম ঃ "ভাগনে। অবিকল। কেবল তাঁর চড় খেয়ে বিবাগী হয়েছিলাম কাল। কিন্তু সে সব হবে—একটু চা আনান, আমি ততক্ষণ খোকাকে দেখাই রেলটা কেমন ক'রে দম দিতে হয়—আর খুকীকে দেখাই লাট্টুটা কেমন করে ঘোরাতে হয়?"

খোকাখুকী চেঁচিয়ে উঠল—"দেখান দেখান" ব'লে। এম্নি সময়ে তাদের থামিয়ে এগিয়ে এলেন গিন্নিমা। বললেন : "আপনি কি সত্যিই অমূল্যবাবুর ভাগনে ?"

আমি ওঁকে প্রণাম করে বললাম : "হ্যাঁ দিদি। কিন্তু আমাকে আপনি বলবেন না। মনে করুন আমি লক্ষ্মণেরই ভাই। বড় মিষ্টি লেগেছিল আপনার ভাই ডাক। আপনার জন্যে এনেছি এই এই—রেশমী ওড়নাটি—প্রণামী দিতে চাই। না করবেন না।"

মামণির এতক্ষণ যেন ভাব লেগেছিল। আমি মোড়ক খুলে লাল চাদরটা গিন্নিমার পায়ে উপহার দিতেই চেঁচিয়ে উঠলেন : "কী ব্যাপার যদু ? আমি কী স্বপ্ন দেখছি নাকি ? এ সেই ম্যাষ্টের না ?"

যদু বলল : "স্বপ্ন নয় মামণি, দেখেছেন আপনি ঠিকই। তবে উনি আসলে মাষ্টার মশাই নন—বিখ্যাত ডাক্তার অতুল্যবাবুর নাতি—আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট অমূল্যবাবুর ভাগনে।"

কর্তাবাবু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এতক্ষণে সাড় এল, ছুটে এসে ধপ্ ক'রে মাটিতে বসে আমার পা চেপে ধরলেন : "মা আপনাকে যা মুখে আসে তাই ব'লে গাল দিয়ে সকাল বেলায় ভাগিয়েছেন শুনলাম। আপনি আপনার মামাবাবুকে বললে আমার চাকরি যাবে।"

এবার আমার আশ্চর্য হবার পালা, বললাম : "চাকরি যাবে কেন ? আপনি কি—"

কর্তাবাবু হাত জোড় করে বললেন : "আজ্ঞে হ্যাঁ—এ-অধম তাঁরই পেশকার।"

তখন আমার মনে পড়ল একবার তাঁকে দেখেছিলাম মামাবাবুর কাছারীতে।

মামণি এবার ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন : "ও মা ! রক্ষেকালী ! ক্ষ্যামা ঘেন্না কোরো মা ! আমার কথায় কি কেউ কান দেয় মা ! আমি তখনই যেদোকে বলেছিলাম মা—এ রাম মনিষ্যি নয় রে,

কোনো বড় ঘরের পুত্তুর, ময়লা কাপড় দেখে বেবজ্ঞা করিস নি রে, বেবজ্ঞা করিস নে—ও ম্যাষ্টের সেজে আমাদের ছলতে এসেছে। তা আজকালকার চাকর-বাকর কি কোনো ভালো কথায় কান দেয় মা? ওকে টেনে নিয়ে গেল বাজার করাতে—তা আবার ঝুড়ি হাতে! ছিদাম গুপ্তর মেয়ে আমি—কুড়োরাম সমাদ্দারের নাতনি—আমার কি মানুষ চিনতে ভুল হয় মা! আমি দেখবামাত্র বলেছি বৌমাকে —ওরে, ও হ'ল শিকারী বেড়াল—যার গোঁফ দেখলে চেনা যায়—তা সে গোঁফ কামিয়ে ফেললেও···আমি—"

বাঁচালো শেষটায় খোকা, বলল: "কী সব বাজে বকছ মামণি —এই দেখ রেলগাড়ী কেমন দম দিলে চলে—ঝমর, ঝমর, ঝমর—"

খুকী আমার গলা জড়িয়ে ধরল, বলল: "কিন্তু আমার লাট্টু আরো ভালো, না মাষ্টার মশাই? কেমন ঘোরে—বন্ বন্ বন্?"

গিন্নিমা বললেন: "ওরে, ওকে তোরা দিক্ করিস নে। এসো ভাই—না, শুধু চা নয়, একটু মিষ্টি মুখ না করলে ছাড়ছি নে। কত কষ্টই পেলে সাধ ক'রে বিবাগী হ'তে গিয়ে।"

আমি হাত জোড় ক'রে বললাম: "কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায় দিদি? আমার একটিও দিদি নেই ব'লে বড় খেদ ছিল—বিবাগী হ'লে শুধু যে ভগবান্ পাওয়া যায় তাইতো নয়— দিদিও মেলে।"

চব্বিশ

ফিরবার পথে (বলল অসিত একগাল হেসে) গেলাম পারুলদের ওখানে। সব শুনে সে হি হি ক'রে হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল: "ধন্যি ছেলে তুমি অসিদা, ঠাকুমা মিথ্যে বলেন নি— তোমাকে পুঁতলে গাছ হয়।"

আমি ধম্‌কে বললাম ঃ "মুখ সাম্‌লে। গাছ-টাছে আমি নেই। আমার নাম শিকারী বেড়াল—যার গোঁফ দেখলে চেনা যায়—আর বলেছেন কে জানিস? সাক্ষাৎ ছিদাম গুপ্তের মেয়ে—কুড়োরাম সমাদ্দারের নাতনি—মামণি।"

পঁচিশ

হাসির কোরাস থামলে বার্বারা বলল ঃ "পারুলির কথায় আমিও সায় দিই দাদা—ধন্যি ছেলে আপনি!"

সোফিয়া হেসে সায় দেয় ঃ "Ditto! কিন্তু আমি কেন ধন্যি বলি জানেন দাদা?"

অসিত ঃ "শুনি।"

সোফিয়া ঃ "অঘটনকে আপনি ডাকলেই সে-পোষ-মানা পাখীর মতন কাছে এসে আপনার হাত থেকে ছোলা খায়। কবি চেষ্টার্টনের একটি চতুষ্পদী আপনার সম্বন্ধে খাটে অক্ষরে অক্ষরে ঃ

> When fishes flew and forests walked
> And figs grew upon thorn,
> Some moment when the moon was blood,
> Then surely I was born :"*

---

*যেদিন, উড়েছিল মাছ; হাঁটা পায় চলেছিল বন,
যেদিন, ফলেছিল ডুমুর কাঁটায়—অঘটনের যুগে;
যেদিন, উঠেছিল রঙিয়ে চাঁদ রক্তেরি মতন;
আমি, জন্মেছিলাম সেইদিনই নিশ্চয় এ-মাটির বুকে।

করুণা অলৌকিকী

দেবদুলালী বার্নাদেৎ

দেবতার করুণা যে মর্ত্য-মানুষকে অনেক সময়েই তা'র কাছে টেনে নেয় অঘটনের চমকে—এ-সত্য ঐতিহাসিক। মানুষ যখন আত্মসুখের মোহে ভগবানকে ভুলে সোনার হরিণের পিছনে ছুটে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে তখনও যে তাকে ভাগবতী করুণা মাঝে মাঝে ডাকে অতীন্দ্রিয় আলো ঝল্‌কে—এ-চিরন্তন সত্যেরও এজাহার দেয় দৈবী অঘটন। ফলে অনেক সময়েই কাটে তার নাস্তিক্যের আঁধার। দৈবী করুণার একটি মহৎ অবদান—অজ্ঞানের এই অন্ধকার থেকে মানুষকে উত্তীর্ণ করা আলোর চেতনায়।

অলৌকিকী করুণার এ-অঘটনের একটি ঝঙ্কার প্রায়ই বাজে—মানুষকে তার নানা দেহদুঃখভোগ থেকে মুক্তিদানের অলোক সঙ্গীতে। আমার অঘটনী পর্যায়ের কয়েকটি রমন্যাসে আমি দৈবী করুণার এই বিভাবটি আঁকতে চেষ্টা করেছি নানা সুরে তালে।

সাধুসন্তের ছোঁওয়ায় যে অনেক "শিবের অসাধ্য ব্যাধিরও" নিরাময় হয় এ কথারও বহু প্রমাণ মেলে নানা মহাভাগের জীবন-চরিতে। আমি নিজেও একাধিক বার তাঁদের এ-যোগবিভূতির লীলাখেলা চাক্ষুষ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে ভরসা পেয়েছি স্বচক্ষে দেখে যে, অলৌকিকী দেবকৃপা সাধুসন্তের মাধ্যমে আর্তের কাতর প্রার্থনায় সাড়া দেয় এ-কলিযুগেও। উদাহরণতঃ, আমার Sri Aurobindo Came To Me স্মৃতিচারণের দ্বাদশ অধ্যায়ে আমি বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি—কীভাবে শ্রীঅরবিন্দ ১৯৪৯ সালে তাঁর যোগশক্তি প্রয়োগে ইন্দিরাকে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। সে-সময়ে এদিকে পণ্ডিচেরিতে তিনি প্রত্যহ ইন্দিরার রোগমুক্তির জন্যে ধ্যানে বসতেন। (আমাকে লিখেছিলেন: "Of course I will try to

the end," কেননা এ-চেষ্টার ফলে ঘটতে পারে অঘটন—"the intervention of the miracle") ওদিকে আমি ইন্দিরার শিয়রে প্রার্থনা করতাম দিনরাত, আর রোজ তাঁকে ইন্দিরার অসুখের খবর পাঠাতাম খুঁটিয়ে।

জানি—স্বভাব-সন্দিগ্ধরা কিছুতেই আমার এজাহারে কান দেবেন না, মেনে নেবেন না যে, শ্রীঅরবিন্দের অলক্ষ্য যোগশক্তিই ইন্দিরাকে বাঁচিয়েছিল। তাঁরা চাইবেন গাণিতিক প্রমাণ—যে-ধরনের প্রমাণ ভাগবতী করুণার ক্ষেত্রে মিলতেই পারে না। মরুক গে। আনন্দের কথা এই যে, বহু বিশ্বাসী প্রকৃতির মানুষ তথা তত্ত্বজিজ্ঞাসু আমার নানা অঘটনী এজাহারে মনে প্রাণেই সাড়া দিয়েছেন। ধর্মের কথা আমি লিখি মুখ্যতঃ তাঁদেরই জন্যে, নাস্তিক অবিশ্বাসীদের জন্যে নয়।

ইন্দিরার জীবনে নানা দৈব শক্তি তথা যোগীর অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব এর আগেও হয়েছে—যার কথা আমার একাধিক অঘটনী রমন্যাসে লিখেছি।

ওর তের চোদ্দ বৎসর বয়সে কোয়েতাতে যখন ভূমিকম্প হয় তখন ও কীভাবে বেঁচে যায় আমার "অঘটন আজো ঘটে"—তে সতীর চিত্রে এঁকেছি। দৈবী স্বর ওকে বাইরে যেতে বলে ভূমিকম্পের একটু আগেই। ও রাত দুপুরে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাড়ী ধ্ব'সে পড়ে। ওর দশবারটি আত্মীয় আত্মীয়া মারা যায়। কেবল ও-ই বেঁচে যায়।

আর একটির কথা আজ বলব এ-ভূমিকায়।

বারো বৎসর বয়সে এক ক্ষেপা কুকুরের দংশনে জলাতঙ্ক রোগে ওর এমন অবস্থা হয় যে, ডাক্তারেরা হাল ছেড়ে দেন। পাঞ্জাবে মরণাপন্নদের ঘরের বাইরে এনে খোলা আকাশের নিচে শুইয়ে দিয়ে দুঃস্থদের দান করার প্রথা আছে। ইন্দিরার এক শোকাতুর আত্মীয় আতুরদের ভিক্ষা দিচ্ছেন এমন সময় ভিক্ষার্থীদের মধ্যে এক যোগী তাঁর মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে ইন্দিরার কাছে এসে তার মুখে নিজের

মুখামৃত দিয়ে বলেন ঃ "ওকে ঘরে নিয়ে যাও, ও মরবে না।" তখন ওর নাভিশ্বাস সুরু হয়েছে, তাই কেউ তাঁর কথা কানে তোলে নি। পরে যখন ও সেরে উঠল তখন যোগীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। বহুদিন পরে (পণ্ডিচেরিতে এবং পুণায়) ইন্দিরা এই যোগীকে দুবার ধ্যানে দেখে। কিন্তু সে অন্য কথা।

এ-ধরনের অভিজ্ঞতাও অনেকেরই হয়েছে। আমার এক গুরুভাইয়ের মুখে শুনেছি—তিনি প্রবন্ধেও সে কাহিনী লিখেছেন—যে, একদা যখন তাঁর জীবনের কোনো আশাই ছিল না তখন এক যোগীর অভ্যুদয়ে তাঁর অসুখ সেরে যায়। আমার আর এক প্রিয় বন্ধু (ইনি খ্যাতনামা বিদ্বান্ তথা রাজপুরুষ) আমাকে একাধিকবার বলেছেন কীভাবে এক যোগী (৺কেশবানন্দ স্বামী) তাঁর শয্যাশায়ী স্ত্রীকে চলৎশক্তি দিয়েছিলেন। শুনেছি বৃন্দাবনে ৺স্বামীজির একটি পঞ্চদেবতার মন্দির আছে।

বুদ্ধিবাদীরা এ-ধরনের "অবিশ্বাস্য" আরোগ্য লাভের কথা শুনে (খুশী না হ'য়েও) যদি বা কখনো মানতে বাধ্য হন তখনো সঘনে বলেন যে, এ-আরোগ্যলাভের সঙ্গে দৈবী করুণার কোনো যোগ আছে একথারও প্রমাণ চাই, নৈলে তাঁরা বিশ্বাস করতেই পারেন না; কিন্তু যে-ধরনের প্রমাণ তাঁরা চান সে-ধরনের প্রমাণ শুধু যে কোনো দৈবী করুণার স্বপক্ষে হাজির করা যায় না তাই নয়, কোনো গভীর আত্মিক বা উচ্চবিকশিত যোগশক্তির স্বপক্ষেও যোগীকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় তলব করা যায় না। সাধুসন্ত মুনিঋষিরা সবাই একবাক্যে ব'লে এসেছেন যে, কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তি বা অঘটনকেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কার্যকারণ সম্বন্ধী কাঠামোয় দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তাঁরা শুধু বলেন মৃদু হেসে যে, অলৌকিকী করুণা বা যোগশক্তিকে অবিশ্বাস করলে ক্ষতি হয় করুণাময়ের কি মুনিঋষিদের নয়, ক্ষতি হয় খতিয়ে অবিশ্বাসীরই। একদা আমার এক বন্ধুকে পাদ্রে পিও-র যোগবলে নানা মুমূর্ষুকে নিরাময় করার কাহিনী পাঠিয়েছিলাম (যাঁর কথা

আমার THE FLUTE CALLS STILL গ্রন্থে লিখেছি।) তাতে বন্ধু বলেছিলেন যে, এ-ধরনের শক্তি সম্বন্ধে তাঁর কোনো ঔৎসুক্যই নেই। প্রথমটায় একথায় আমি একটু ঘা খেয়েছিলাম বৈ কি। কিন্তু তারপর বুঝতে বেগ পেতে হয় নি—কেন তিনি পাদ্রে পিও-র পরার্থনিষ্ঠার বিষয়েও খবর পেতে এত নারাজ। কারণ, পাদ্রে পিও মহাত্মা তথা বস্তুতান্ত্রিক তথা ধার্মিক আর আমার বন্ধুটি ধর্মে শ্রদ্ধাহীন। যেখানে শ্রদ্ধা নেই সেখানে ঔৎসুক্য দাঁড়াবে কোন্ ভিৎ-এ? যদি এক অখ্যাত বিলিতি ডাক্তারেরও কোনো অভাবনীয় ইঞ্জেকশনের গুণকীর্তন কাগজে বেরুত তাহলে তাঁর মনে নিশ্চয়ই ঔৎসুক্যের অভাব হ'ত না। অলৌকিক করুণার কীর্তিকলাপে তাঁর ঔৎসুক্যের অভাবের অবশ্য আরো একটা কারণ আছে। সেটা এই যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাঁর বুদ্ধিগ্রাহ্য, করুণার হালচাল অবোধ্য—তার ছককাটাও সম্ভব নয়, পরিসংখ্যানেও নাগাল পাওয়া যায় না। সুতরাং ও বাতিল। যুক্তি বটে! কারণ মহাপুরুষদের প্রার্থনায় দৈবী করুণা যখন মানুষকে চোখের সামনে নাভিশ্বাসের মুহূর্তেও বাঁচিয়ে তোলে দেখা গেছে, তখন কেমন করে বাতিল করা যায় তাঁদের এ-সাক্ষ্যকে যে, তাঁরা এ-অঘটন ঘটিয়েছেন জীবনবিধাতার প্রেমের মৃতসঞ্জীবনী শক্তিরই ঘটকালিতে—কোনো ভৌতিক ভাঁওতায় নয়? পাদ্রে পিও-কে কেউ রোগমুক্তির পরে ধন্যবাদ দিতে এলে তিনি ব'লে থাকেন: "ধন্যবাদ দাও ভগবানকে, কারণ আমি শুধু প্রার্থনা করি, নিরাময় করেন তিনি।" ("I only pray, it is the Lord who heals.")

আমি এসব কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখি শুধু এইজন্যেই নয় যে, করুণার আশ্চর্য অঘটনের কথা ব'লে আমি গভীর আনন্দ পাই, এজন্যেও বটে যে, আমি বিশ্বাস করি—সৎচেষ্টা ক'রে হার মানাও ভালো, কিন্তু নাস্তিক বুদ্ধিবাদের সস্তা ওকালতি ক'রে ফাঁপা নাম করা কিছু নয়। তাই আজ অলৌকিকী করুণার আর একটি

দৈবী কীর্তির কথা বলব—কারণ যদিও এ-অঘটনটি বিশ্ববিশ্রুত, তবু আমাদের দেশে খুব কম ধর্মার্থীরাই জানেন সেন্ট বার্নাদেৎ-এর বিচিত্র দর্শনের কথা। তবে কাহিনী সুদীর্ঘ, তাই সংক্ষেপেই বলতে হবে।

অঘটনটির সূত্রপাত হয় ফ্রান্সের লূর্দ নামে একটি সামান্য গ্রামে ভার্জিন মেরীর আকস্মিক আবির্ভাবে। তাঁর আদেশে সেখানকার উষর পাহাড়ে এক শুভদা নির্ঝরিণীর অলৌকিক অভ্যুদয় হয়, যার জলে একের পর এক নানা রোগীর কঠিন রোগ সারতে থাকে। সে-সময়ে—এক শতাব্দী আগে—লূর্দ-এর নামও কেউ জানত না আশপাশের অধিবাসীরা ছাড়া। কিন্তু আজ লূর্দ একটি জগদ্বিখ্যাত মহাতীর্থ। সেখানে কত হোটেল, সানিটেরিয়ম, হাঁসপাতাল, নার্স, ডাক্তার। প্রতি বৎসর দেশদেশান্তর থেকে হাজার হাজার রোগী আসে লূর্দ-এর দিব্য প্রস্রবণে স্নান করে নীরোগ হ'তে, যাত্রী আসে ভার্জিন মেরীর মর্মরমূর্তির সামনে বা গির্জায় প্রার্থনা করতে, কৌতূহলীরা আসে খবর নিতে, গবেষকরা আসেন গবেষণা ক'রে বই লিখতে—ডাক্তারদের (Medical Board) রিপোর্টে পড়তে—কীভাবে, কবে কেমন ক'রে লূর্দ-এর ঝর্ণার প্রসাদে শত শত রোগীর বহু দারুণ রোগ সেরে গেছে মুহূর্তে। লূর্দ সম্বন্ধে অগুন্তি নিবন্ধ, থীসিস, গ্রন্থাদি ছাপা হয়েছে নানা ভাষায়। "অঘটন আজো ঘটে"—বর্গীয় ছুটি রমন্যাসও ছাপা হয়েছে—একটি লিখেছিলেন এমিল জোলা—(Emile Zola) বিখ্যাত Lourdes ; অন্যটি ফ্রানৎস্ ভেরফেল-এর (Franz Werfel) লেখা—'Song of Bernadette' যেটি বহু ভাষায় চিত্রায়িত হয়েছে সিনেমা সংঘের অধ্যবসায়ে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নোবেল লরিয়েট আলেক্সিস ক্যারেল লিখেছেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে লেখা : Journey to Lourdes. সম্প্রতি রুথ কারস্টন-এর প্রখ্যাত Miracles of Lourdes-এর "পপুলার"

সংস্করণও বেরিয়েছে।* আমি এই চারিটি বই থেকেই লূর্দ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি। সব তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নয় তাই এখানে শুধু চুম্বকটুকু পেশ করছি—বিশেষ করে ধর্মার্থীদের জন্যে।

ফরাসী বিশ্বকোষে লিখছে: "লূর্দ শহর হ্রদের কাছে…জনসংখ্যা ৭৭৫৮। এ শহরটি সারা জগতের একটি বিখ্যাত তীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫৮ সালে ফেব্রুয়ারি তারিখে বার্নাদেৎ (Bernadette) নামে একটি ত্রয়োদশী শ্রমিক বালিকার সামনে ভার্জিন মেরী আবির্ভূতা হয়ে তাকে বলেন—তিনি 'Immaculate Conception'; তিনি তাকে আঠারো বার দেখা দেন এবং তাঁর ইচ্ছায় সেখানে পাহাড়ে হঠাৎ একটি কলোচ্ছলা ঝর্ণা জেগে ওঠে এক মুহূর্তে।‡

গবেষক রুথ ক্রানস্টন তাঁর Miracle of Lourdes গ্রন্থে লিখছেন (৬ পৃষ্ঠা): "মহিমময়ী মেরী বার্নাদেৎকে বলেছিলেন: যাও ঐ ঝর্ণার জল পান করো। এখানে একটি গির্জা নির্মিত হবে—আমি চাই।"…সেখানে কোনো ঝর্ণাই ছিল না। কিন্তু বার্নাদেৎ হাতে মাটি খুঁড়তেই প্রথমে আঙুলের মতন সরু একটি জলস্রোতের অভ্যুদয় হয়, তারপর সেটি দেখতে দেখতে ধাবমান ঝর্ণা হয়ে উধাও হয়। পরে তিন তিনটি গির্জা নির্মিত হয়।

---

* এ বই কয়টি এই ঠিকানায় মিলবে: Examiner Press Book-Shop, Meadows Street, Bombay.

‡ Lourdes: non loin du pittioresque Lac Lourdes—7758 habitants…La ville de Lourdes est devenue le but d un p'elerinage fameux dans le monde entier. Le 11 fe'vrier, 1858, une enfant de treize ans, Bernadette Soubirous, fille d'un meunier, e'tant entr'ee dans une des grottes qui bordent le gave, de'clara avoir vu "une femme vetue de blanc, portant une ceinture bleue et environn'ee d'une clarte' surnaturelle"—qui lui dit e'tre l' Immacule'e Conception. Le meme fait se r'epe'ta dix-huit fois, et une source abondante jaillit, a' la voix, dit l'enfant, de l'Apparition……(Nouveau Larousse Illustre, Tome V, p. 771)

রুথ লিখেছেন যে, অচিরেই অঘটন ঘটা সুরু হয়ঃ এক অন্ধ এ-দিব্য ঝর্ণার জলে তার চোখ ধুতে না ধুতে দৃষ্টি ফিরে পায়; একটি মহিলা তার মুমূর্ষু শিশুকে এ-ঝর্ণার জলে স্নান করাতে না করাতে সে শুধু যে বেঁচে ওঠে তাই নয়—সুস্থ সবলও হয়ে ওঠে সেই সঙ্গে। (এই শিশুটির নাম Bouhouhorts, এর কথা বলছি পরে।) নানা শহর থেকেই আর্ত ও রুগ্নের দল এসে ভার্জিন মেরীর গুণগানে অখ্যাত লূর্দ গ্রামটিকে ঝংকৃত ক'রে তুলল। অতঃপর একদা লূর্দ-এর জলে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের শিশুপুত্রের দুরারোগ্য রোগ সেরে যায়—লিখেছেন নাটকীয় ভঙ্গিতে ফ্রান্‌ৎস্ ভেরফেল তাঁর "সং অফ বার্নাদেৎ" রমন্যাসে। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক এমিল জোলাও তাঁর "লূর্দ" রমন্যাসে লিপিবদ্ধ করেন বহু রুগ্ন ও মুমূর্ষু কী-ভাবে এ-ঝর্ণায় স্নান ক'রে নিরাময় হয়েছেন। আলেক্সিস ক্যারেল ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'Man the Unknown' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে লূর্দ-এর ঝর্ণার জলের অলৌকিক আরোগ্যশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন খুব জোর দিয়েইঃ

"Today, any physician can observe the patients brought to Lourdes, and examine the medical records kept in the Medical bureau. Lourdes is the centre of an International Medical Association, composed of many members."

তারপরে অগুন্তি গবেষক ও তথ্যার্থী লূর্দ-এ এসে এসব দৈবী রোগমুক্তি সম্বন্ধে বহু নিবন্ধ গ্রন্থ আলোচনাদি লিখেছেন। এঁদের মধ্যে রুথ ও ক্যারেলের বই দুটি শুধু যে প্রামাণিক তথ্যপূর্ণ তাই নয়, অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই সব অঘটনের জটলা থেকে রুথ শতাধিক রোগীর রোগমুক্তির খবর দিয়েছেন খুঁটিয়ে যাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই তিনি দেখা করেছেন। অবশ্য লূর্দ-এ সব রোগীই নীরোগ হয় না—হ'তে পারে না—কিন্তু হাজার হাজার লোক যে সারে এ-তথ্য

অনস্বীকার্য। রুথ তাঁর বইটির পঞ্চম অধ্যায়ে খবর দিচ্ছেন যে, প্রতি বৎসর লূর্দ-এ বিশ লক্ষ যাত্রী আসে ও ত্রিশ হাজার রোগী—যাদের মধ্যে অনেকেই মরণাপন্ন।···১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৪৪,০৫৫ রোগী স্নান করে লূর্দ-এর ঝর্ণায়। আজকাল প্রত্যহ গড়ে আড়াই হাজার রোগীকে স্নান করতে দেওয়া হয়।···ঝর্ণার জল পরীক্ষা ক'রে নতুন কিছুই পাওয়া যায় নি—একান্তই পার্থিব জল, সাদা মাটা। ঝর্ণা থেকে দিনে ৩০০০০ গ্যালন জল নিঃসৃত হয়। অনেক রোগী স্নান করতে না করতে নিরাময় হয়, কেউ কেউ ঝর্ণার সিঞ্চনে সেরে ওঠে, অনেকে জল পান না ক'রে বা জলে না নেমেও পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পায় শুধু তার পুণ্য আবহে এসে।

লূর্দ-এ জননী ভার্জিন মেরী চেয়েছিলেন একটি গির্জা। তিন তিনটি গির্জা তো উঠেছেই, তাছাড়া নির্মিত হয়েছে হোটেল সানাটেরিয়ম ইত্যাদি—রোগী তথা যাত্রীদের জন্যে। রুথ বিশদ বর্ণনা করেছেন—কীভাবে জনস্রোতের শোভাযাত্রা সুরু হয় ঝর্ণার দিকে—কীভাবে রোগীদের মধ্যে অনেকে চক্ষের নিমেষে রোগমুক্ত হয়—কীভাবে ডাক্তার তাদের পরীক্ষা করেন ও বহু পরীক্ষার পরে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে সার্টিফিকেট দেন যে, "অঘটনী রোগমুক্তি বটে।" খৃশ্চান কর্তৃপক্ষ—"অঘটনী" ছাড়পত্র দিতে আরো নারাজ—তবু বহু আরোগ্যকে তাঁরাও "মিরাক্ল" নামাঙ্কিত করতে বাধ্য হয়েছেন যথাযথ গম্ভীর গুঞ্জনে।

এ-রোগমুক্তির দৃষ্টান্ত এতই বেশি যে, রুথ বেছে বেছে শুধু সেই সব আরোগ্যলাভের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন যাদের সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা অসম্ভব।* আমি এখানে নমুনা হিসেবে মাত্র

---

* জোলা তাঁর বিখ্যাত "Lourdes"—রমন্যাসে বহু বিচিত্র রোগ নিরাময়ের কাহিনী এঁকেছেন এমনই মর্মস্পর্শী নাটকীয় ঢঙে যে, পড়লে মুগ্ধ না হ'য়ে পারা যায় না।

তিন চারটি উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব রুথ ক্রান্স্টনের দ্বিতীয় খণ্ড—Middle Years And Some Famous Cases থেকে।

১। হেনরি মিওজে শিশু—বয়স সাত বৎসর। তার বিশ্বাস থাকার কথা নয় যে বলা চলবে faith-cure। শৈশব থেকেই সে ভুগছে। রোগের নাম enteritis—অন্ত্রের বিস্ফোরণ বা inflammation—ডাক্তারেরা বললেন মাথা নেড়ে যে, লূর্দ-এ পৌঁছতেই পারবে না। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ তো, তাই খাটিয়া ক'রে তাকে কোনোমতে ট্রেনে তোলা হ'ল। ট্রেনে তার সাড় ছিল না বললেই হয়। তারপর—কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্?—লিখছেন রুথ (১০৪ পৃঃ):

"হেনরি এক মুহূর্তে সেরে গেল—রোগ মুক্তির পরে এমন কি convalescence-এরও দরকার হ'ল না। সে ফিরে স্বজনদের সঙ্গে পারিবারিক আহার করল সমানে। তার রোগমুক্তি সম্পর্কে ডাক্তার ভানিয়ের সার্টিফিকেট দিয়ে লিখলেন:

"It is a cure profoundly disconcerting to the physician."

২। দ্বাদশ অধ্যায়ে রুথ লিখছেন লুসিয়ঁ বেলাশ-এর আশ্চর্য রোগমুক্তির কথা—আশ্চর্য আরো এই জন্যে যে, সে এমন অবিশ্বাসীর পরিবারে মানুষ যে-পরিবারে পিতামাতার বিবাহ হয়েছিল "outside religion" এবং শিশুরা কেউ কস্মিনকালেও কোনো গির্জায় যায় নি—এমন কি কোনো পাদ্রী তাদের baptize পর্যন্ত করে নি।

এহেন পরিবারে লুসিয়ঁ বাইশ বৎসর বয়সে হঠাৎ এমন প'ড়ে যায় যে তার মেরুদণ্ড বিষম জখম হ'য়ে যায়, ফলে সে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারত না। ডাক্তার এক্স-রে ক'রে তাকে spinal jacket-এ পুরতে চাইলেন। এমন সময়ে লুসিয়ঁর পিতা পড়লেন লূর্দ-এর কথা। বিশ্বাসী না হ'য়েও ভাবলেন দেখাই যাক না—যখন সারবার কোনো আশাই নেই। লূর্দ-এ লুসিয়ঁ সেরে উঠলেন স্নানের পরে যাত্রীদের শোভাযাত্রায় যোগ দিতে না দিতে। চলৎশক্তি ফিরে এল। রুথ

লিখছেন লুসিয়ঁ এখন ফ্রান্সের রেডিওতে বড় চাকরে। ডাক্তাররা সবাই মিলে পরীক্ষা ক'রে এই রায় দিয়েছেন, "In the present state of science, the cure, in several hours, of caries with disintegration of a vertebral body, has no explanation."

৩। আর একজন, আবে ফিয়াম্মা—যিনি দারুণ কষ্ট পাচ্ছিলেন দুরারোগ্য অসুখে অথচ লূর্দ-এর আরোগ্য-শক্তিতে অবিশ্বাস। গেলেন লূর্দ-এ কেননা এক বন্ধু তাঁকে ব্যঙ্গ করে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল: "তুই এমন অর্বাচীন যে, পরখ করতে পর্যন্ত চাস না আর সবাইয়ের মতন!" গিয়েই পূর্ণ আরোগ্য।

(৪) আর একজন, আবে দে সাই-ই, হঠাৎ অসুখে পড়লেন। নির্বাক। Tubercular laryngitis; গিলতে বিষম কষ্ট। প্রতি মাসে সাড়ে পাঁচ সের ক'রে ওজন ক'মে যেতে থাকেন। জ্বর ছাড়ে না। একশো তিন ডিগ্রি। মেডিকাল বুরো রায় দিল, "মরণ আসন্ন।"

তিনি লূর্দ-এ গিয়ে প্রথম স্নানের পরই নীরোগ। মুখে কথা ফুটল। ক্ষিধে ফিরে এল। দু'মাসে ওজনে বাড়লেন—আধমণ, ছ'মাসে—একমণ দু'সের। পরের বৎসর যখন লূর্দ-এ ফের আসেন তখন পুরোপুরি সুস্থ। আর কখনো তিনি কাশেন নি বা ডাক্তারের কাছে যান নি।

এ-রকম আরো বহু দৃষ্টান্ত রুথ দিয়েছেন—এমন অনেকের এজাহার দিয়ে যাদের কাছে গিয়ে তিনি পুংখানুপুংখ খবর নিয়েছেন—কীভাবে ভার্জিন মেরীর করুণা তাদের মুহূর্তে রোগ থেকে মুক্তি দিয়েছিল—কখনো ঝর্ণার জলের স্পর্শমাত্র, কখনো বা ঝর্ণার কাছে আসবামাত্র। কেউ কেউ ভার্জিন মেরীর দর্শন পেয়েও সেরে ওঠেন।

রুথ এ-সব দৃষ্টান্ত দেওয়ার পর সব্যঙ্গে লিখছেন (ষোলো অধ্যায়ে): "সংশয়ীদের শেষ যুক্তি হ'ল বলা: দূর্! এ কখনো হ'তে পারে! আমি বিশ্বাস করি না।" কেন করেন না? না—

বলছেন রুথ—"আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধির বাইরে যে কিছু সত্য থাকতে পারে এ-কথা বিশ্বাসযোগ্যই নয়।"

খতিয়ে এইই হ'ল সংশয়ের মূল নিদান : যা জানি না, তা মানি না। কিন্তু অজানাকে জানার চেষ্টার অন্য নামই তো সাধনা। সে-সাধনা বিনা কি একটি ক্ষেত্রেও জ্ঞানের পরিধি বিস্তীর্ণ হয়েছে কোনোদিন? জোলা তাঁর উপন্যাসে বলছেন আরো তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে যে, চোখের উপর অনেক রোগীকে ঝর্ণার জলে স্নান ক'রে সারতে দেখা সত্ত্বেও একদল ডাক্তার গোঁ ধ'রে বলবে : "এ কী ক'রে হয়? হ'তে পারে কখনো? ভেবে দেখতে হবে যা দেখলাম সত্যি কি না।"

এমন কেন হয়? কারণ দিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাবিত্রীতে :

A dark concealed hostility is lodged
In the human depths, in the hidden heart of Time.

প্রতি মানুষেরই মনের মধ্যে আবহমানকাল দেবাসুরের দ্বৈরথ চলে আসছে। অসুরকে জয় করতে হ'লে শ্রদ্ধা রাখতে হবে এই দৈববাণীতে যে, ঠাকুরের করুণাকে চাইলে তবেই আসুরিক বৃত্তিদের জয় করা যায়, নৈলে নয়। এ-যুগে আমরা বিশেষ ক'রে বিজ্ঞানের বহির্মুখী দৃষ্টিকে বরণ করার ফলে—আরো সাদরে ঠাঁই দিয়েছি আমাদের মনের যত সব আসুরিক কুট যুক্তির বিড়ম্বনাকে যার ফলে করুণাকে চাক্ষুষ করলেও আজ চাই আমরা চোখকে অবিশ্বাস ক'রে তাকে নাকচ করতে—বলতে : "যা হ'তেই পারে না তা কেমন ক'রে হবে? অতএব সিদ্ধান্ত—ভুল দেখেছি, বা কোনো বুজরুকি আছে।"

মনে পড়ে—প্রায় বিশ বৎসর আগে আমার প্রিয়তম মহাসাধক বন্ধু কৃষ্ণপ্রেমের গুরুর কাছে শুনি—বন্ধুর রক্ত যখন একদা বিষিয়ে ওঠে, ডাক্তারে জবাব দিয়ে যায়, তখন তিনি (গুরু) বলেছিলেন : সে মরবে না, বাঁচবে চরণামৃতের প্রসাদে। গুরুর কথা ফলল, কিন্তু

ডাক্তার হার মানল না, বলল ঃ চান্স। না ব'লে করে কী ? দৈবী করুণা গুরুর চরণামৃতের মধ্যে দিয়ে সক্রিয় হ'তে পারে একথা বহির্মুখী ডাক্তারী দৃষ্টি, নাস্তিক বুদ্ধি কেমন ক'রে মানবে ?

এরপর আমি নিজে অগুন্তিবার প্রত্যক্ষ করেছি—দিনের পর দিন—চরণামৃত কীভাবে সংকটতারণ হয়ে রোগযন্ত্রণা থেকে রোগীকে মুক্তি দিতে পারে। এমন কি, চরণামৃতে গুরুর নিজের বিশ্বাস টলমলে হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শিষ্যের কাছে যে সে সংকটতারণ রূপে দেখা দিতে পারে এও বহুবারই চাক্ষুষ করেছি। চরণামৃতের এই দৈবী শক্তির কথা আমার "অঘটনের শোভাযাত্রা" রমন্যাসে লিখেছি জেনে অবশ্য যে, অধিকাংশ বুদ্ধিবাদীই বিশ্বাস করবেন না—রুথের উদ্ধৃত ভাষায় বলবেন ঃ "যা অসম্ভব তা সম্ভব হবে কেমন ক'রে ?" অন্য ভাষায় "যাকে আমার মন সম্ভব বলে চিনতে পারে নি তাকে মানতে পারা যায় কখনো ?"

জোলা তাঁর রমন্যাসে এক জায়গায় ভারি চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন—বিশেষ ক'রে এযুগের বুদ্ধিবাদী মানুষ কী গভীর দুঃখ পায় দৈবী করুণায় বিশ্বাস হারিয়ে। কী ভাবে—বলি সংক্ষেপে। কারণ কাহিনীটি সত্যিই বলার ম'ত।

রমন্যাসটির নায়িকা মারি পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী। পিয়ের তাকে ভালোবাসে। সারবার আশা নেই। মারি বিশ্বাসী। পিয়ের অবিশ্বাসী—সংশয়ী। তবু গেল মারির সঙ্গে লূর্দ-এ। গিয়েই দেখল পর পর ঝর্ণার জলে অনেকগুলি অঘটন—অবিশ্বাস্য রোগমুক্তি লূর্দ-এর। অনেকে ভার্জিন মেরীর দর্শনও পেল। তবু তার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। মারি এজন্যে গভীর দুঃখ পায়, কারণ সেও পিয়েরকে গভীরভাবে ভালোবাসে।

মারি রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে বহুকষ্টে পৌঁছল লূর্দ এ। প্রথমবার বিশ্বাসীদের শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে খাটিয়া ক'রে চলল ঝর্ণার দিকে। জোলা ও রুথ উভয়েই বর্ণনা করেছেন এ-বিরাট

শোভাযাত্রার। দলে দলে ক্লিষ্ট নরনারী কোনোমতে চলেছে স্তোত্র গাইতে গাইতে ঃ

Holy Virgin of virgins,

turn not thy face from thy children.

Lord, if it be thy will, thou cantst cure me.

O Lord, son of David, heal our sick···ইত্যাদি।

অতঃপর ঘটল অপ্রত্যাশিত ড্রামা!—মারি ঝর্ণায় স্নান ক'রেও সারল না। সে গভীর দুঃখ পেল। বলল পিয়েরকে যে, সে ভার্জিন মেরীর করুণায় বিশ্বাস হারিয়েছে। তখন আশ্চর্য ব্যাপার—অবিশ্বাসী পিয়ের তাকে বোঝায়—ছি, ভার্জিনের করুণা পাওয়া যায় না এভাবে ক্ষুব্ধ হ'য়ে তর্কাতর্কি ক'রে। বিশ্বাসকে হতে হবে প্রশ্নহীন, অন্ধ, নৈলে সে মেকি বিশ্বাস···ইত্যাদি। মারি বুঝল। অনুতপ্ত হয়ে কাঁদল অঝোরে। তারপরই পেল ভার্জিনের দর্শন। বলল পিয়েরকে ঃ এবার আমি সেরে উঠবই উঠব। কিন্তু পিয়েরের ততক্ষণে ফের অবিশ্বাস এসে গেছে—বিশেষ ক'রে মারির প্রথমবার রোগ নিরাময় না হওয়ার দরুণ। তবু সে গেল ফের মারির সঙ্গে সেই শোভাযাত্রায় বিমনা হয়ে। দেখল স্বচক্ষে পর পর কয়েকটি অঘটন—এক পঙ্গু উঠে সোজা হেঁটে এল লাঠি ছেড়ে! ঐ আর একটি মেয়ের অসুখ সেরে গেল! আর একটি! এক বধির শুনতে পেল! এক বোবা কথা কইল! এক যক্ষ্মারোগী নিরাময় হ'ল মুহূর্তে! এ কী? "আজ যেন অঘটনই হয়ে দাঁড়ালো দৈনন্দিন!"—(Le miracle devenait l'état même de la Nature!) এ-ও-সে উল্লাসে জয়ধ্বনি করছে ঃ "আমি সেরে গেছি!" সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের লোক বলছে ঃ "ওর ভাগ্য ভালো—সত্যিই সেরে গেল, দেখ দেখ রে, নয়ন ভ'রে!"

তুমুল কাণ্ড! পিয়ের পাঁচজনের নানা অত্যুক্তি শুনতে শুনতে প্রার্থনা করা সুরু করল ঃ "হে ভগবান্! আমার যুক্তিবুদ্ধিকে ধ্বংস

করো—যাতে ক'রে আমি আর বুঝতে না চাই—অবান্তর ও অসম্ভবকে অঙ্গীকার করতে পারি। ("Mon Dieu ! faites donc que ma raison s' ane´antisse, que je ne veuille plus comprendre, que j' accepte l' ire´el et l' impossible··· LOURDES)

তারপরই ঘটল বহুবাঞ্ছিত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত অঘটন! মারি অকস্মাৎ নীরোগ হয়ে তার ছোট্ট শকটে দাঁড়িয়ে উঠে, বিহ্বলভাবে কেঁদে ডাকল ঃ "হে বন্ধু, হে বন্ধু!" (O mon ami ! O mon ami !)

পিয়ের এগিয়ে যায় তাকে ধরতে। (কারণ মারির চলৎশক্তি নেই বহু বৎসর) কিন্তু মারি ইশারা করে পেছিয়ে যেতে। কী সুন্দর দেখায় তাকে···যেন কেউ তাকে নতুন ক'রে গড়েছে!··· মারি সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল ঃ "আমি সেরে গেছি! আমি সেরে গেছি !!"

শেষ অঙ্কে মারি পিয়েরকে বলল ঃ "বন্ধু শোনো। সেদিন সেই প্রেমের রাত্রে যখন আমি তীর্থে কাটিয়েছিলাম গভীর আনন্দে —সে-রাত্রে আমি ভার্জিন মেরীকে বলেছিলাম যে, আমাকে সারিয়ে তুললে আমি চির জীবন মা-র কুমারী থাকব। মা মেরী আমাকে নীরোগ করেছেন—আমি আর তো বিবাহ করতে পারি না। কারণ এ-জীবন এখন তাঁর।"

পড়তে পড়তে চোখে জল আসে। এ কী দৈবী নাট্যলীলা— divine drama !

একজন সমালোচক লিখেছেন জোলার এই রমন্যাসটির সম্বন্ধে ঃ "Masses of men in motion is Lourdes···moving drama of real life. Of all the books of Zola this has the distinction of widest circulation."

* * * *

এমিল জোলা তাঁর এই বিখ্যাত রমন্যাসে শুধু ভার্জিন মেরীর মহিমা কীর্তন ক'রেই সন্দেহবাদীদের বিশ্বাসে দীক্ষা দিতে চান নি, কারণ তিনি জানতেন তা অসম্ভব। পরমহংসদেব বলতেনঃ "পাথরের দেয়ালে কি পেরেক ঠোকা যায়?" যারা স্বভাব-সন্দিগ্ধ তারা বিশ্বাস করতে চাইবে না কিছুতেই। এ-যুগে বিজ্ঞানের জয়জয়কারের ফলে যুক্তিবাদীদের এই দৃঢ়মূল সন্দেহবাদ—scepticism—বুদ্ধির আত্মশ্লাঘার খোরাক পেয়ে আরো নধরকান্তি হয়ে উঠেছে। তাছাড়া মানুষের চেতনা একটা স্তরে না পৌঁছলে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা জাগে না, সে জানতেই চায় না দৃশ্যমান তথ্যের অন্তরালে অদৃশ্য কোনো ভগবদ্‌বিধান আছে কি না, সে বেশ খুশখেয়ালেই চলে বুদ্ধির পায়াভারি চালে—অলৌকিক কিছুকে দেখলেই ধমকে দিয়ে বা ব্যঙ্গ ক'রে the old old story নাম দিয়ে। এ-সন্দেহেরও দরকার ছিল, কারণ ধর্মবিশ্বাসী যখন অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির বনেদে দাঁড়ায় তখন তার ব্যক্তিরূপ আলোকস্তম্ভের মতন অচল অটল দীপ্তি বিকিরণ করলেও, যখন সে শুধু গুজবসম্বল বা চমকতৃপ্ত হয়ে খুশী থাকতে চায় আত্মিক অমৃতফলের রসদ না চেয়ে, তখন সে প্রায়ই নানা অবান্তর জনশ্রুতির আগাছার জালে আটকে পড়ে। বুদ্ধিবাদীর সংশয়-সম্মার্জনী এই সব আগাছাকে সরিয়ে দিয়েছে অনেকখানি—যে কথা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Life Divine-এ Denial of the Materialist অধ্যায়ে সুফল ও কুফলের জমা-খরচের প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন।

কিন্তু প্রতি মনোবৃত্তিরই সাধ্যের সীমা আছে। তাই বুদ্ধি অনেক জঞ্জাল সাফ করার পরে আত্মপ্রসাদে বিহ্বল হয়ে যেই নিজেকে "বারে আমি!" বলা সুরু করল সেই সে তার সাধ্যের সীমান্ত না মেনে আরো এগুতে চেয়ে অবিশ্বাসের খট্টায় প'ড়ে গিয়ে বলা সুরু করলঃ "বুদ্ধির দূরবীন ও অণুবীনে যে-তত্ত্বের দেখা মেলে না সে নামঞ্জুর। বুদ্ধির কাঠগড়ায় যে-অনুভূতি সাক্ষ্য দিতে নারাজ

সে বাতিল। তখন মানুষের কী দুরবস্থা হয় বলেছেন বাউল মুচকে হেসে ঃ

কমলবনে কে পশিল সোনার জহুরী !
নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি মরি !

অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শতদলকে বুদ্ধির নিকষে ঘষা বোকামি। তাদেরও পরীক্ষা হ'তে পারে কিন্তু বুদ্ধির কষ্টিপাথরে নয়—উপলব্ধির যাচাইয়ে, ঊর্ধ্বতর উপলব্ধি দিয়ে। বুদ্ধি এ-সত্য মানতে চাইলে তবেই সে ধর্ম-প্রগতির সহায় হয়ে আমাদের বন্ধু হ'তে পারে। কিন্তু আন্তর ভাবভক্তি ধ্যানধারণার অবদানকে যখন সে স্বাধিকার-প্রমত্ত হয়ে মনের নিকষে যাচাই করতে ছোটে তখন তাকে বলতেই হয় মৃদু হেসে ঃ

যাচিয়ে নিবি এমন নিকষ আঁধার ঘরে কোথায় তোর ?
দেখতে যদি চাস ওরে মন,
খোল ঠুলি, খোল গর্ববাঁধন,
নৈলে শুধুই বস্তুবণিক থাকবি রে তুই জীবনভোর ঃ
প্রাণের ক্ষুধার আবাহনেই নামে সুধার ঢল অঝোর।

কিন্তু বুদ্ধির এ-বাঁধন থেকে মুক্তি না চাইলে অহঙ্কারের ঠুলি খ'সে পড়তে পারে না তো, তাই সারা জীবন শুধু অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে ঠোকর খেয়েই চলতে হয়।

বুদ্ধিবাদী তার্কিক ও সংশয়ীদের জীবনের এই শোকাবহ বিড়ম্বনার কথা বড় সুন্দর ক'রে দেখিয়েছেন আলেকসিস ক্যারেল তাঁর Journey to Lourdes ভ্রমণকাহিনীতে। লিখেছেন তাঁর চিত্তগ্রাহী ভঙ্গিতে—কীভাবে তাঁর বদ্ধমূল বৈজ্ঞানিক সংশয়ের নিরসন হয় লূর্দ-এর প্রসাদে—ভার্জিন মেরীর অঘটনে।

তিনি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দেহবিজ্ঞান (physiology) ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান-এ (medicine) নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্ববিশ্রুত হ'য়ে ওঠেন।

অতঃপর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত Man the Unknown গ্রন্থে তিনি ধর্মকে সমর্থন ক'রে নানা গবেষণায় বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন আনেন ও বহু সংশয়ীকে খেই ধরিয়ে দেন ধর্ম-সাধনার। এ-পরিবর্তন তাঁর আসে লূর্দ-এ তীর্থযাত্রার ফলেই—১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। তার আগে তিনি ছিলেন মনে প্রাণে বুদ্ধিবাদী, সংশয়ী তথা নাস্তিকই বলব। কিন্তু হ'লে হবে কি, এ ছিল তাঁর বাহ্যরূপ ঃ অন্তরে তিনি ছিলেন অকপট সত্যার্থী তত্ত্বজিজ্ঞাসুই বটে। অবশ্য বিশ্বাস রাখতে পারতেন না ধর্মের নজিরে, কিন্তু বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যে আলো, স্থৈর্য, জ্ঞান ও শান্তি দিতে পারে এ-অকাট্য সত্যকে অস্বীকার করবার মতন গোয়াতু‌র্মি তাঁর ছিল না।

ফলে লূর্দ-এর বাতাবরণে ভার্জিন মেরীর কৃপায় বহু দারুণ ব্যাধিও সেরেছে এ-জনশ্রুতিকে তিনি আমল দিতে না পারলেও মনকে সাধ্য-ম'ত খুলেই রেখেছিলেন। তবু ক্যান্সার, পক্ষাঘাত, রাজযক্ষ্মা, মস্তিষ্কে ফোড়া (brain tumour), অস্থির স্থাণুত্ব (arthritis), ভাঙা-হাড়-জোড়া এ সবও কি সত্যি হ'তে পারে কখনো? তিনি নিজে মস্ত সার্জন—জানেন তো কিসে কী হয়···এই জাতীয় মামুলি বুদ্ধির অভিমান তাঁকে অশান্ত ক'রে তুলত—বিশেষ ক'রে অলৌকিক দেবীশক্তির জয়ধ্বনি।

অন্তরযামিনী জননী মেরী শুনে অলক্ষ্যে হাসলেন যেন! বললেন ঃ "আচ্ছা বাছা, তোকে দেখাব—আমার মাতৃশক্তি অঘটন-ঘটনী কি না, মানুষ যা পারে না অলৌকিকী দৈবী করুণা তা পারে কি না।"

কী ভাবে অহঙ্কারী বৈজ্ঞানিককে এই দৈবী করুণার কাছে মাথা নোয়াতে হ'ল তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ক্যারেল সাহেব তাঁর বিখ্যাত Journey to Lourdes গ্রন্থে। এ-স্মৃতিচারণটির শৈলী ও আন্তরিকতা এতই স্বচ্ছ যে, পড়তে পড়তে সত্যিই হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে ওঠে, স্থানে স্থানে চোখে জল আসে তাঁর নানা বর্ণনায়, প্রার্থনায়,

অভিমানের ঝাঁঝ গ'লে চোখের-জলে উপসংহারে। সমস্ত বইটির খবর দেওয়া সম্ভব নয়, তাই সংক্ষেপেই বলতে হবে।

হ'ল কি, একদা ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে, একদল রোগী ও যাত্রী যখন ট্রেনে চলেছে লূর্দ-তীর্থের পানে তখন সে-ট্রেনের এক ডাক্তার ক্যারেলকে বললেন: "চলো না, দেখে আসবে।" ক্যারেলের ইচ্ছা ছিল অনেকদিন থেকেই। বললেন: "তথাস্তু।"

হবি তো হ—ট্রেনে একটি তরুণী, মারি ফেরাঁ (Marie Ferrand) ছিল যাত্রী—ক্যারেলের ডাক পড়ে তার সঙ্কট অবস্থায়। তিনি শোনেন তার রোগের কাহিনী আদ্যন্ত: সতেরো বৎসর বয়সে তার কাশির সঙ্গে রক্ত উঠতে থাকে, আঠারোয় প্লুরিসি হয়, তারপর তার তলপেট ফুলতে থাকে—ডাক্তারেরা পরীক্ষা ক'রে রায় দেয়—tubercular peritonitis (মোটামুটি—জঠরে প্রদাহ, যক্ষ্মা-ক্ষয়মূলক)। ক্যারেল পরীক্ষা ক'রে দেখেন নিদান নির্ভুল; কিন্তু এ-রোগ তো সারবার নয়। তিনি ঝাঁঝালো সুরে বলতেন প্রায়ই: "যাদের দুরারোগ্য রোগও সেরেছে শোনা যায়, তাদের সে-রোগ সত্যিই দুরারোগ্য ছিল কি না, না জানলে মানতে পারি না যে, লূর্দ-এর জলে এমন রোগও সারে—" ইত্যাদি তীক্ষ্ণ সংশয়, বৈজ্ঞানিকের মামুলি বুদ্ধিমন্ত বুলি। করুণার প্রশ্ন তো পরে, আগে দুরারোগ্য রোগ সারল এইটুকুই প্রমাণ হোক তো!

কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব মিলল—এ-মেয়েটির যে-রোগ সে সারতেই পারে না। তিনি নিজে দেখেছেন—tubercular peritonitis-এর অকাট্য সাক্ষ্য—প্রায় নাভিশ্বাসের অবস্থা। ট্রেনেই সে যন্ত্রণায় মরে আর কি, ক্যারেল তাকে মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন দিতে বাধ্য হন। লূর্দ অবধি কি টিঁকবে রোগিণী? সন্দেহ!

লূর্দ-এ পৌঁছেই সেখানকার ডাক্তারের মুখে শুনলেন এক পঙ্গু-বুড়ী অতিকষ্টে লাঠি নিয়ে ঝর্ণা পর্যন্ত গিয়ে ঝর্ণার জল পান ক'রেই লাঠি (crutches) ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সদ্য দৌড়ে ছুটে এসেছে মহানন্দে।

গুহার সামনে ছিল ভার্জিন মেরীর মর্মরমূর্তি! (আপ্তবাক্যে পাই—করুণা পঙ্গুং লংঘয়তে গিরিম্—পঙ্গুকেও পাহাড় লংঘন করার শক্তি দেয়!)

ক্যারেল যথাবিধি তর্ক জুড়ে দিলেন। দীর্ঘ বিতণ্ডা: তার মর্ম এই: করুণা কিছুই নয়—বুড়ী সেরেছে অটো সাজেস্‌চনে—তথা বহু যাত্রীর জয়ধ্বনির যোগফলে।

লূর্দ-এর ডাক্তার আরো কয়েকটি চমকপ্রদ আরোগ্যের সুখবর দিলেন: হেনরি লাসের Varicose vein ও ulcer-এ ভুগছিল বহুদিন, লূর্দ-এর ঝর্ণায় একদিনেই সেরে গেল। একটি মহিলা পায়ে এক ফুট লম্বা ক্ষত নিয়ে ঝর্ণার জলে স্নান করতেই ক্ষত নিশ্চিহ্ন··· ইত্যাদি।

"And what of Pierre de Rudder," A. B. went on, "and the Grivotte woman whom Zola describes? They were certainly not neurasthenics, yet they were cured. Pierre de Rudder had a fractured bone in his leg that did not knit for eight years he was cured in five minutes:" P. 32)

("পিয়েরের সম্বন্ধে কী বলবে শুনি?" বললেন ডাক্তার এ, বি, "আর সেই গ্রিভৎ মহিলা যে-তুজনের সম্বন্ধে জোলা লিখেছেন? তাদের তো ছিল না কোনোই স্নায়বিক দৌর্বল্য। পিয়েরের পায়ের একটি হাড় এম্‌নি ভেঙে গিয়েছিল যে, আট বৎসরেও জোড়া লাগে নি। সেও পাঁচ মিনিটে সেরে গেল কেমন ক'রে!)

কিন্তু বৈজ্ঞানিক তার্কিককে তর্কে হারায় কার সাধ্য? ক্যারেল সাহেব বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—কাজেই তুই আর তুয়ে চার– তর্ক ফাঁদলেন এ ও তা। শেষে বললেন সজোরে: "এ-ধরনের খবর শুনে পুরোপুরি সন্দেহ করা অবশ্য কর্তব্য—পাছে অপরে ঠকায় বা নিজেই নিজেকে ঠকাই"—ইত্যাদি।

("But it is a duty to meet facts of that kind with complete scepticism. One must guard against being deceived and deceiving oneself."…৩৩ পৃষ্ঠা)

তারপর লূর্দ-এর নানা বর্ণনা, নানা কথাবার্তা। শেষে মারি ফের্ঁা-র অবস্থা এতই খারাপ হ'ল যে, ডাক্তারেরা বলল ঝর্ণা অবধি তাকে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয় পথেই ম'রে যাবে ঝাঁকুনিতে। ক্যারেল গেলেন অন্য ডাক্তারের সঙ্গে, কারণ স্থির হ'ল—মারির মৃত্যু যখন ধ্রুব তখন না হয় ঝর্ণার কাছে গিয়েই মরল, ক্ষতি কী!

চলল brancadier-রা (খাটিয়াবাহক) brancard খাটিয়ায় মারিকে নিয়ে। ঝর্ণার কাছে পৌঁছল যখন তখন মারির সাড় নেই। একদৃষ্টে ক্যারেল দেখছেন আর ভাবছেন—"ঐ, মরল ব'লে! ঐ দেখ, ছাইয়ের মতন সাদা মৃত্যুমলিন মুখ…নাকে মাছি বসছে…ঐ আর একটি রুগ্না মহিলাকে নিয়ে এল—ডান দিকে পক্ষাঘাত… একজন এল গলগণ্ড নিয়ে—ক্যারেল চেয়ে চেয়ে দেখছেন আর ভাবছেন—এই এই এই বুঝি মারির ইহলীলা সাঙ্গ হ'ল বা!

হঠাৎ ক্যারেলের কী হ'ল! তীব্র ব্যাকুলতা জাগল বিশ্বাস করবার! আহা এই সব দুর্ভাগাদের মতন যদি তিনিও বিশ্বাস করতে পারতেন যে, ভার্জিন মেরী মানুষের একটি স্বকপোলকল্পিত পূর্ণিমা প্রতিমা নন! আশ্চর্য!—ক্যারেল প্রার্থনা করা সুরু ক'রে দিলেন: "মা, মারিকে বাঁচাও, আর আমাকে দাও বিশ্বাসের বর।" (৪৬ পৃঃ)

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মনে বিশ্বাসের স্থিতি? মরুভূমিতে জলসিঞ্চন? ক্যারেলের উৎসাহ উচ্ছ্বাস উবে গেল দেখতে দেখতে। নাঃ, বৈজ্ঞানিকের মতন দ্রষ্টা থাকাই ভালো—বোঝালেন তিনি নিজেকে—বিশেষ যখন নিশ্চিত জানেন যে, মারি বাঁচতেই পারে না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন কম্বলের নীচে বেচারীর তলপেট ফুলে উঁচু হ'য়ে রয়েছে। এ সারবে ভার্জিনের ভেল্কিতে? দূর্!

তারপরে দীর্ঘ বর্ণনা—নানা যাত্রীর, নানা মিলিত আবেদন

সঙ্গীত, জয়ধ্বনি, প্রার্থনা : "পুণ্যময়ী ! আমাদের রুগ্নকে নিরাময় করো···পুণ্যময়ী !···আমাদের প্রার্থনা শোনো !···জীসাস ! আমরা তোমাকে ভালোবাসি···" ইত্যাদি।

ক্যারেল এক ডাক্তারকে বললেন : "এসো আমার রোগিণীকে দেখ সে। যদিও আমার মনে হয় সে মরল ব'লে। তাকে গুহার কাছে রাখা হয়েছে।" (৪৯ পৃঃ)

ডাক্তারটি বললেন : "আমি কয়েক মিনিট আগেই তাকে দেখে এসেছি। বড় দুঃখের কথা ! মিথ্যে কেন তাকে এখানে আনা হ'ল ? অপারেশন করাই উচিত ছিল···" ইত্যাদি।

তার ! এ কী !!···মরণাপন্না সেরে গেল দেখতে দেখতে !!!

ক্যারেল হতভম্ব হ'য়ে বললেন বন্ধুকে : "আমি জোলার 'লূর্দ' পড়েছিলাম অনেকদিন আগে···আমার বিশেষ ক'রেই মনে আছে এলিস রুথের সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা।···কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা গোত্রের। আমরা মনে করেছিলাম মারির মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ করলাম—সে নিরাময় হয়েছে। যখন বইয়ে এ-ধরনের অঘটন পড়ি, মনে সংশয় আসে—কোথাও কোনো বুজরুকি বা অত্যুক্তি আছে। কিন্তু এ যে আমি দেখেছি স্বচক্ষে।"··· ইত্যাদি (৬৪ পৃঃ)।

সবশেষে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল : "এ কি বিজ্ঞানজগতের কোনো অভিনব তথ্য যাকে ধরা ছোঁওয়া যায়—না, বলব একে কোনো অলৌকিক লোকের অবোধ্য অঘটন ? এ তো গাণিতিক প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার করা-না-করার প্রশ্ন নয়। এ যে এমন একটা সত্যকে মানা, যার ফলে আমাদের জীবন সম্বন্ধে ধারণাই বদ্‌লে যেতে পারে।" (৬৭ পৃঃ)

অশান্ত উদ্‌ভ্রান্ত মনে তিনি লূর্দ-এর গির্জা থেকে ভেসে-আসা স্তোত্র শুনে ধীরে ধীরে ঢুকলেন সে-দেবালয়ে। বসলেন একটি বৃদ্ধ কৃষাণের পাশে। দুহাতে মুখ ঢেকে শুনতে লাগলেন গির্জার মিলিত-

কণ্ঠের স্তোত্র। তারপর তিনি হঠাৎ প্রার্থনা সুরু করলেন যেন নিজে থেকেই :

"মা! যে-তুমি দুর্ভাগাদের সহায় হয়ে আছো—যারা তোমার কাছে প্রার্থনা করে—সে-তুমি আমাকে তোমার ক'রে নাও। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি আজ। আমার প্রার্থনায় তুমি সাড়া দিয়েছ এক অপূর্ব অঘটনী লীলা প্রকট ক'রে। কিন্তু আমি যে এখনো অন্ধ মা! এখনো যে সন্দেহ আসে। কিন্তু তবু বলব : আমার প্রাণের সবচেয়ে বড় কামনা, প্রার্থনা—যেন আমি বিশ্বাস করতে পারি একান্তী হয়ে, যেন আমি আর বিচার না করি, সংশয়কে মনে ঠাঁই না দেই, মা! মা! মা!

"মা গো! প্রভাতসূর্যের চেয়েও করুণাঝরা তোমার নাম। মিথ্যে আলেয়ার পিছনে ছুটে মরি আমরা মা! বড় ক্লান্ত আমি আজ। তাই চাই তুমি গ্রহণ করো এ-উদ্‌ভ্রান্ত পাপীকে। মা, আমার প্রখর বুদ্ধির অভিমানের তলে এক নিহিত স্বপ্ন রুদ্ধশ্বাস হয়ে আছে। চায় সে জাগরণে মূর্ত হয়ে শুধু তোমাকে বিশ্বাস করতে, তোমাকে ভালোবাসতে—তোমার আশিসধন্য সাধুদের মত!" (৭০—৭১ পৃ:)

ক্যারেল শুধু মনীষী ছিলেন না, ছিলেন ধ্যানী। তাই তিনি ধরতে পেরেছিলেন যে লূর্দ-এর অঘটন বিশ্বাস করার ফলে—ওরফে অলৌকিক করুণার অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বকে মঞ্জুর করার সঙ্গে সঙ্গে —জীবন সম্বন্ধে আমাদের মূলগত ধারণাই বদলে যাবার সম্ভাবনা আছে। কারণ রোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার অঘটন বাহ্য ও দৃশ্যমান হলেও এ-আরোগ্যকে মানার সঙ্গে সঙ্গে না মেনেই উপায় নেই অন্তরালের সেই দৈবী করুণাকে যার পরিচালনায় বেদনামুক্তির নাটক প্রত্যক্ষ জীবনমঞ্চে অভিনীত হ'তে পারে পদে পদেই। অঘটনকে যথার্থ ধর্মার্থীরাও এইভাবে দেখেন ব'লেই তাঁরাও নিশ্চয়ই এ-প্রার্থনার বেদনা ও মহিমায় সাড়া দিতে পারবেন। কারণ এইই তো অঘটনের সবচেয়ে বড় দান—দৃশ্য চমকের ডাকে অদৃশ্য দেবতার

কাছে আমাদের পৌঁছে দেওয়া ভক্তি বিশ্বাস কৃতজ্ঞতার বাহনে। যে-করুণাময়ী বিশ্বশক্তি যুগে যুগে আমাদের দুঃখ দেন তিনি আমাদের প্রার্থনায় দীক্ষা দেন তো শুধু তাঁর পায়ে টেনে আনতে বেদনার টানে, দুঃখ থেকে মুক্তি দেনও তো কেবল তাঁর কৃপার স্পন্দনে ভক্তি জাগাতে। রোগমুক্তির আনন্দে বিস্ময়ে যে কৃতজ্ঞতা বোধ না করেছে তার রোগমুক্তি বৃথাই বলব, কারণ জীবনের অন্তিম লক্ষ্য—জগদ্ধাত্রী করুণার পায়ে আত্মনিবেদন ক'রে সে-চিরন্তনীকে ভালোবাসতে শেখা। ক্যারেল মারির রোগমুক্তির মাধ্যমে এই পরম সত্যের দেখা পেয়েছিলেন ব'লেই তাঁকে জ্ঞানী বলি, তিনি প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন ব'লে নয়।

ভগবানের প্রতি শক্তিই আমাদের চোখের ঠুলি খুলে দিতে পারে যদি সে-শক্তিকে আমরা ঠিক ম'ত গ্রহণ করতে পারি—অর্থাৎ সরল ভক্তি বিশ্বাসের তাগিদে সর্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী করুণাকে বরণ করতে শিখি আমাদের অজ্ঞানান্ধ গর্ব মোহের আত্মঘাতী মদমত্ততাকে পাশ কাটিয়ে। এরই জন্যে চাই দীনতার দীক্ষা—এই সরল স্বীকার যে, আমরা জেনেও জানি না, দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না—শুধু মিথ্যা আত্মাভিমানকে সাদরে কোল দিই ব'লে। না দিলে আমাদের এত ভুগতে হ'ত না—সহজ পথের পথিক হয়ে আমরা সহজ সুরেই বরণ করতে পারতাম চির-সহজিয়াকে, দেখতে পেতাম প্রতি লীলার পিছনেই তাঁর বরাভয় হাতের অমিতাভ আশ্বাস—যেমন পেয়েছিল অশিক্ষিতা বার্নাদেৎ—দিনমজুরের মেয়ে।

কী দেখেছিল সে? দেখেছিল হঠাৎ গুহার সামনে এক অপরূপাকে—যাকে দেবী ব'লে বরণ ক'রে নিতে তার বাধে নি, কারণ সে জননী মেরীকে ভালোবেসেছিল প্রথম দর্শনেই। সে-সুষমা সে-চাহনি, সে-হাসি—ভালো না বেসে পারে? মা মা মা-ডাক জেগে উঠেছিল তার মনে।

কিন্তু দেবতার লীলা তো! মা এসেছিলেন সবাইকেই তাঁর

করুণা দিতে বটে, কিন্তু হাজার হাজার সরল বিশ্বাসীর মনে তাঁর জননী কান্তির বর্ণনায় সরল ভক্তি জেগে উঠলেও যুক্তিকুটিল বিদ্বান্ বুদ্ধিমন্তেরা বেঁকে দাঁড়ালেন। সুরু হ'ল বার্নাদেৎ-এর 'পরে অত্যাচার, তর্জন গর্জন। পুলিস মেয়র মান্যগণ্য সবাই ব্যঙ্গ সুরু ক'রে দিল : "কোথাকার কে—এক নগণ্য দিনমজুরের অশিক্ষিতা মেয়ে—তাকে দর্শন দেবেন কি না স্বয়ং জগজ্জননী ভার্জিন মেরী—সেধে এসে নিজের পরিচয় দেবেন Immaculate conception ব'লে ?* একশত সমাজের স্তম্ভ থাকতে মা কিনা এক গ্রাম্য বালিকাকে করবেন তাঁর চারণী, বলবেন তাকে : 'বলো সবাইকে গিয়ে যে লূর্দ-এ আমি একটি গির্জা তুলতে চাই ?' এ যদি আষাঢ়ে গল্প না হয় তবে আষাঢ়ে গল্প কার নাম শুনি ? "ভাবো তো"—বললেন সমাজপতিরা—"একি সত্যি বিশ্বাস করা যায় যে, যেই ভার্জিন মেরী বললেন বার্নাদেৎকে মাটি খুঁড়তে আঙুল দিয়ে—অমনি সে-শিলাচলে জেগে উঠল চিরস্রোতা ঝর্ণা—যার প্রসাদে হাজার হাজার রোগীর রোগমুক্তি হ'তে থাকল, অবিশ্বাসীর মনে বিশ্বাস গজালো, নাস্তিকের প্রাণ ভক্তিতে ভরভর করতে লাগল ? এ উনবিংশ শতাব্দীতে —যখন মানুষের বিচার বুদ্ধি সাবালক হয়েছে—এ-রটনাকে কি পাগলামি ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় ?"...এমনি সে কত গুরুগম্ভীর তর্জন-গর্জন—শেষে শুধু যে জজ পুলিস মেয়র প্রমুখ গণ্যমান্যের সংসদ বার্নাদেৎকে বুজরুক বা উন্মাদ ব'লে ধমকানো সুরু করলেন তাই না, খৃষ্টান পাণ্ডাপুরুত ধর্মধ্বজেরাও রেগে আগুন : "ভার্জিন মেরী আমাদের কাছে না এসে কিনা ধর্ণা দিলেন গিয়ে তোর কাছে ? তুই কোথাকার কে রে !" .....ইত্যাদি। আহত অহঙ্কারের ফোঁশফোঁশানি, চোখরাঙানি, আক্রোশ......

---

* খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন মানুষ জন্ম নিয়েছে আদম-এর পাপে—যার নাম original sin ; ভার্জিন মেরী অপাপবিদ্ধা তাই তিনি মানবী হ'য়েও মানবী নন, দেবী-প্রকৃতি তাঁর জন্মসিদ্ধ। এরই নাম ইম্মাকুলেট কনসেপশন।

কিন্তু সম্ভ্রান্তের দল রাগ করলে হবে কি—দলে দলে জনসংঘ যে বার্নাদেৎকে দেবীর তুলালী ব'লে বরণ করল, তার হাজার হাজার ফটো বিলি সুরু হ'ল, লকেটেও তার মুখ সাজিয়ে কণ্ঠহার করা হ'ল! হবে না? তারই আহূত জলে যে একের পর এক রোগী নিরাময় হচ্ছে! দেবীর গুহার সামনে সে দিনের পর দিন তাঁর দর্শন পেয়ে ভাব সমাধিস্থ হ'য়ে যায়—কী জ্যোতির্ময় দেখায় তখন তাকে! আহা! চোখ জুড়িয়ে যায় যে রে! অথ, দেখতে দেখতে গ'ড়ে উঠল এক বিচিত্র ড্রামা—নাটকের ম'ত নাটক: একদিকে সরল বিশ্বাসী শ্রমিকরা হ'ল বার্নাদেৎ-এর ভক্ত পূজারী—অন্যদিকে মান্যগণ্যের দল সবাই মিলে হলেন সরলার 'পরে চড়াও। বললেন হুহুঙ্কারে: "বল তুই—কিছুই দেখিস নি, কথা দে আর যাবি নি ও-গুহার দিকে, ঝর্ণায়। নৈলে তোকে পাঠাব জেলে—পাগলাগারদে। তোর বাপের চাকরি যাবে। সাবধান!" ইত্যাদি।

কিন্তু বার্নাদেৎ সরলা হলেও অবলা ছিল না। কেউ তাকে এতটুকুও টলাতে পারল না ভয় দেখিয়ে। সত্যবাদিনীর এক কথা: "আমি দেখেছি দেবীকে, বেসেছি তাঁকে ভালো। আমি যাবই যাব গুহায়—তিনিও যে আমাকে ডেকেছেন আমি কি সাড়া না দিয়ে পারি?"

ধন্য দেবতুলালী! সাধে কি তুমি পেয়েছিলে জগন্মাতার অপার কৃপা? সত্যকে যে প্রাণের চেয়েও ভালোবেসেছে, মাতৃশক্তির করুণার কাছে যে সরল প্রেমে হাত পেতেছে তার হৃদয়ে কি বিশ্বজননী না এসে পারেন? গীতায়ও ঠাকুরও তো এই কথাই গেয়েছিলেন: যে একান্ত হয়ে আমার শরণ চাইবে তার সম্পূর্ণ ভার—যোগক্ষেম—আমি বহন না ক'রে পারি না।

কিন্তু বিচিত্র তাঁর লীলা! তাই দেখতে দেখতে দেবীর তিলক-ধারী পাণ্ডাপুরুতই হয়ে দাঁড়াল দেবীর আদর-তুলালীর রূক্ষতম প্রতিপক্ষ। (বলে না প্রদীপের নিচেই অন্ধকার সব চেয়ে বেশি

গাঢ় ?) বলল তারা ভ্রুকুটি ক'রে : "সব বুজরুকি—ধাপ্পা ! ঝর্ণার জলে রোগ সারা ! ননসেন্স !" মেয়রের আদেশে পুলিস মোতায়েন হ'ল, উঠল দেয়াল—ঝর্ণার সামনে। কেউ যেতে পাবে না ওদিকে।

দরিদ্র শ্রমিকরা ক্ষেপে উঠল। এ কী অত্যাচার! আমাদের অসুখ সারছে—ওখানে গিয়ে প্রার্থনা ক'রে আমরা মনে শান্তি পাচ্ছি, এতে পুলিস বাধা দেবার কে ? সুরু হ'ল হানাহানি, মারামারি —পুলিসও বারবার দেয়াল তুলবে, ওরাও বারবার ভাঙবে।

এই সমস্যাটির বড় চমৎকার নাটকীয় রূপ দিয়েছেন ফান্‌ৎস তাঁর Song of Bernadette রমন্যাসে। সংক্ষেপে বলি।

সারা ফ্রান্সে র'টে গেল এ-কাহিনী। কেউ কেউ নিল বিশ্বাসের পক্ষ—কিন্তু অধিকাংশ বুদ্ধিবাদীই অবিশ্বাসের তরফে কোমর বেঁধে দাঁড়াল—যাদের দলে নাম লেখালেন স্বয়ং সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন। কিন্তু হ'লে হবে কি, তাঁর মুমূর্ষু শিশুপুত্র সেরে উঠল লূর্দ থেকে আনা জলের প্রসাদে। কৃতজ্ঞ সম্রাজ্ঞী বায়না ধরলেন : "খুলে দেওয়া হোক ঝর্ণা। সবাই যাক দেবীর প্রসাদ পেতে।" শুধু সম্রাজ্ঞী তো নন গৃহিণী ! অগত্যা সম্রাট্‌কে তার করতে হ'ল লূর্দ-এ মেয়রকে। বহু দুঃখ পেয়ে শেষে দুঃখিনী বার্নাদেৎ হ'ল জয়-যশস্বিনী। এক বিশপেরও চোখ খুলল। তিনি তাকে দেবীদুহিতা বলে বরণ ক'রে পাঠালেন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ মঠে—নেভার্স কনভেণ্টে যেখানে বার্নাদেৎ-এর দেহান্ত হয় মাত্র চৌত্রিশ বৎসর বয়সে। অন্তিম মুহূর্তে জননী মেরী এসে দেখা দিলেন ফের দীপ্তিদুলালীকে—তাকে অশান্ত জগতের আঁধার থেকে তার শান্তিকোলে টেনে নিতে। মা-অন্ত-প্রাণ মেয়ের রোগক্লিষ্ট মুখে ফুটে উঠল দিব্য হাসি : "মা আমার ! এসেছিস—দিনের শেষে ?" ব'লে শেষ নিশ্বাসে শুধু বলল : "Je t' aime—আমি ভালোবাসি মা তোকে।" প্রেমময়ী পরম স্নেহে প্রেমের দুলালীকে টেনে নিলেন তাঁর সর্বতাপহরা স্নেহবক্ষে, ১৬ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে।

তারপর ? শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার আঁকলেন এক বিচিত্র ছবি ! বার্নাদেৎ-এর দেহরক্ষার ঠিক চুয়ান্ন বৎসর পরে ১৬ই এপ্রিলে (১৯৩৩) য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যাথলিক গির্জা সেণ্ট পিটার্স-এ দেবীর আদরিণীকে এক বিরাট্ ধর্মোৎসবে সেণ্ট পদবী দেওয়া হ'ল অচিন্তনীয় ধূমধামে। পঞ্চাশ হাজার ভক্ত ভক্তিমতী এলেন তাঁর স্মৃতিতর্পণে দেশ দেশান্তর থেকে। তাদের মধ্যে ছিলেন একজন— যাঁর নাম আগে করেছি, যাঁর মা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন লূর্দ-এর ঝর্ণায়— যখন ডাক্তারে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন : Justin Marie Adolar Duconte Bouhouhorts. যে-শিশুকে যমের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছিল বার্নাদেৎ-এর আহূত ভাগীরথী, সে প্রাণদাত্রীর স্মৃতিবাসরে তার অন্তরের প্রণাম নিবেদন করতে লূর্দ থেকে গেল রোমে এ-মহিমময়ীর দিব্য অভিষেকে (canonisation-এ)।—এসে সাশ্রুনেত্রে শুনল স্বয়ং পোপের বন্দনা :

"সেণ্টরা যেন দূরবীন। যেমন দূরবীনের প্রসাদেই আমরা দেখতে পাই যেসব তারাদের চোখে দেখা যায় না, তেমনি সেণ্টদের প্রসাদেই আমরা জানতে পারি সেই সব চিরন্তন সত্যকে—দুনিয়াদারির পর্দা যাদের আড়াল ক'রে রাখে। এ-অশান্ত জগতে বহু নাস্তিক্য-মোহমুগ্ধ অন্ধ অবোধকে আজ আত্মঘাতী ঢালুপথে নিয়ে চলেছে হাজারো ক্রুর যুক্তিকুটিল আসুরিক মনোবৃত্তি। আজ মানুষের অন্তরাত্মার এ-ভয়াল দুর্লগ্নে লূর্দ শুধু যে দেদীপ্যমান আলোর প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে তাই নয়, সেণ্ট বার্নাদেৎ-এর মহিমময় জীবনসঙ্গীতে আমরা চিরদিন শুনতে পাব মর্ত্য মানুষের কণ্ঠে কীভাবে জেগে উঠেছিল দেবীপ্রেম, খৃষ্টভক্তি, পবিত্রতা, আত্মোৎসর্গ—যার ঝঙ্কার যুগে যুগে বুকে বুকে ঢেউ তুলবে।"

লূর্দ সম্বন্ধে পোপের এ-প্রশস্তি একটুও অত্যুক্তি নয়। লূর্দ-এর দুটি হাঁসপাতালে খৃষ্টান নার্স ডাক্তারেরা ভক্তির প্রেরণায় বৎসরের পর বৎসর শুধু যে হাজার হাজার আর্তের অবিশ্রান্ত সেবা ক'রে

আসছেন তাই নয়—অজস্র ট্রেনে তাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থাও ক'রে আসছেন দিনের পর দিন।

কিন্তু এই-ই লূর্দ-এর সবচেয়ে বড় অবদান নয়। দুঃখীর দুঃখ-মোচন, রোগীর রোগমুক্তি মস্ত কথা— সত্য। কিন্তু আরো বড় কথা —এ-সূত্রে দেবী-করুণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে অগুন্তি লোকের মনে ধর্মভাব জেগে ওঠা যার খবর মিলতে পারে না কোনো বাইরের ছকে—পরিসংখ্যানে (statistics)। কত শত ভক্ত, বিশ্বাসী, আদর্শবাদী প্রতি বৎসর লূর্দ-এ গিয়ে রোগীদের সেবা করে বিনা বেতনে, কত শত যুবক তাদের bnancard খাটিয়া ক'রে নিয়ে যায় ঝর্ণার জলে স্নান দিতে, কত শত পূজারী প্রাণ অন্তর-মন্দিরে দেবীর প্রতিষ্ঠা ক'রে তাঁকে ডাকে তাঁর চরণে শরণ চেয়ে! কত শত খৃষ্টান নানা দেশ থেকে অচেনা রোগীর কল্যাণার্থে মাস মাস চাঁদা পাঠান নানা গির্জা-প্রতিষ্ঠানে—যাতে ক'রে দুঃস্থ রোগীদের লূর্দ-এ তীর্থযাত্রা সম্ভব হ'তে পারে। খৃষ্টের সৌভ্রাত্র্য-মন্ত্রের যেন নতুন ক'রে দীক্ষা দিল লূর্দ—যুগপৎ ঐশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমের প্রতীক হয়ে। এক কথায়, য়ুরোপে এক বিরাট বিশ্বব্যাপী জীবসেবার আন্দোলন স্থুরু হয়েছে—একশো বৎসর আগে এক নিরক্ষরা গ্রাম্যবালিকাকে ভার্জিন মেরী দর্শন দিয়ে তাঁর মৃতসঞ্জীবনী করুণার অমৃতধারা ঝরিয়েছিলেন ব'লে, যার প্রবাহে আজও ভাঁটা পড়ে নি। হাজার হাজার দীন দুঃখী আর্ত ক্লিষ্ট ত্রস্ত অশান্ত আজো লূর্দ-এ গিয়ে মনে শান্তি, প্রাণে অভয়, চিত্তে সান্ত্বনা ও অন্তরে দেবী করুণায় নবজাগ্রত বিশ্বাসের বর পায়। তাই রুথ অত্যুক্তি করেন নি যখন তিনি লিখলেন তাঁর Miracle of Lourdes-এর শেষ অধ্যায়ে: "লূর্দ আজকের দিনে জগতে শুধু যে ধর্মের আলোকস্তম্ভ ও পরার্থনিষ্ঠার চারণী ব'লে গণ্য হবার দাবি করতে পারে তাই নয়, সে জগৎজোড়া সংশয়ী ও তাপিতদের যেন নতুন ক'রে দীক্ষা দিতে এসেছে এই দিব্য খৃষ্টমন্ত্রের—It is more blessed to give than to receive." সুখ নেই সঞ্চয়ে, স্বার্থ-

সিদ্ধিতে ইন্দ্রিয়ভোগে, লোভে, কাড়াকাড়িতে—সুখ মেলে কেবল দানে, পরার্থনিষ্ঠায়, দরদে, প্রেমে। মানুষ আজকের দিনে দেশে দেশে একদিকে দীন দুঃখীর 'পরে অত্যাচার করছে, ও অন্যদিকে উৎপীড়িতেরা আগুন হ'য়ে অত্যাচারীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ডিক্‌টেটর হ'য়ে নিষ্ঠুরদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে শ্রীমন্ত হ'তে চাইছে ব'লেই জগতে আজ এত হানাহানি হিংসাদ্বেষ দুঃখকষ্ট। লূর্দ ঘোষণা করছে ঃ ভালোবাসো ভগবানকে, কোল দাও ভাইকে, মনে রাখতে চেষ্টা করো সদা সর্বদা খৃষ্টের বাণী ঃ "ভগবানকে পেলে আর যা যা পাবার আছে তাও পাবে, তিনিই দেবেন।" (Seek ye first the kingdom of God and His righteousness ; and all these things shall be added unto you.) দেশে দেশে যুগে যুগে পরম ভাগবতদের কণ্ঠে এই মহাবাণীই ঝঙ্কৃত হয়ে এসেছে আবহমানকাল।

এরই নাম অলৌকিকী করুণা, যে আবহমানকাল বুকে বুকে নিত্যনব ভাবে রঙে রসে নানারূপে নিজেকে জানান দিয়ে এসেছে। নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আরো নিষ্ঠুর হ'তে চেয়ে রুখে উঠলে নিষ্ঠুরতার প্রতিষ্ঠা কম্‌বে না—হিংসার মধ্যে দিয়ে মৈত্রী আসতে পারে না। প্রেমেই কেবল অপ্রেমের উচ্ছেদ হ'তে পারে, আর কোনো উপায়ে নয়। তাই পুণ্যসলিলা লূর্দ নির্ঝরিণী মিডীভাল কুসংস্কারের স্তোকবাক্য নয়, সে ধর্মের বাণীবাহিনী হয়েই হাজার হাজার জিজ্ঞাসুকে দিয়ে এসেছে বিশ্বাসে বলের, বিপ্লবে শক্তির, আঁধারে আলোর পাথেয়—যেমন দিয়ে এসেছে আমাদের দেশে পতিতপাবনী গঙ্গা, দেবতাত্মা হিমালয়, নানা ধন্য তীর্থ পীঠ মন্দির। এর নাম নিষ্প্রাণ প্রতীক-পূজা নয়—মর্ত্যলোকে অমৃত-করুণার আবাহন। এ-লীলা অলৌকিকী কেবল এই অর্থে যে, যারা চোখ চেয়ে দেখতে চায় না তারা সে দৈবী করুণার দেখা পেলেও তাকে করুণা ব'লে চিনতে পারে না, পারে কেবল তারা যারা মনে প্রাণে ধর্মার্থী, পরার্থনিষ্ঠ,

অমৃতপন্থী ; তারাই পায় দিব্যদৃষ্টি দিব্যশ্রুতি, দিব্যকণ্ঠ—যার প্রসাদে তারা দেখতে পায় ঠাকুরের করুণা প্রতি আনন্দে, শুনতে পায় তাঁর বাঁশি প্রতি ঝঙ্কারে, সব শেষে গাইতে শেখে তাঁর স্তবগান প্রতি পদক্ষেপে বাদলে কিরণে, আঁধারে আলোকে, বিরহে মিলনে, জীবনে মরণে ঃ

জীবনে সহচারী, মরণে কাণ্ডারী ! বন্ধু তোমা সম কে আর আছে ?
হাস্যে অতুলন, লাস্যে বিমোহন—তোমারে প্রিয়, কার হিয়া না যাচে ?
প্রভাতে স্নেহারুণ, দিবসে দিশারি—যে নিশীথে চন্দ্রমা তিমির নাশে,
বিয়োগে সান্ত্বনা, মিলনে মূর্ছনা, চাহনি-তারামণি নয়নাকাশে ।
বিশ্বরাজ হ'য়ে নিঃস্বসখা, বলো নিরুপমের কোথা উপমা ভবে ?
যা-কিছু ধরণীর কাটায় ধূলিটান—ধেয়ানে তৃষ্ণায় বুনি' নীরবে
ছন্দবরষায় বসুন্ধরা-বুকে ফিরিয়া আসো চির-শ্যামল গুণী !
তোমারি জপি' নাম অবনী অভিরাম, গগন নীল তব শঙ্খ শুনি' ।

অনেকের মুখেই আজকাল শোনা যায় একটি অসার নাস্তিক বুলি ঃ যে, ধর্মের ধারণ, করুণার অঘটন, ভক্তির সাধন, প্রেমের বন্দন এসব সেকেলে কথার যুগ গত—এ-যুগ হ'ল তীক্ষ্ণ বাস্তব রাজ্যপাট যার রাজা—বিজ্ঞান, সারথি—বুদ্ধি আর অবদান—ভোগ । আমার মনে হয়—বিজ্ঞান ভোগ বুদ্ধি সবই কাজে আসতে পারে কেবল তখন যখন ধর্ম আমাদের নিয়ন্তা হ'য়ে আমাদের রক্ষা করে । নৈলে এ-দানবিক বৈজ্ঞানিক বোমার যুগে মানুষের শোচনীয় সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী । মহাভারতে এই কথাটি যুধিষ্ঠির বলেছিলেন যক্ষকে ঃ

"ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"

অর্থাৎ—

করিলে বধ ধর্মে, ফিরে করিবে বধ সেও তোমাকে হায় ।
করিলে তারে রক্ষা, জেনো রক্ষিবে সে তোমাকে বসুধায় ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১৪	ইনো	ইৎনা
১৫	১০	সাড়ে	বলি সাড়ে
১৯	৩	বলেন	বললেন
২৬	৯	ভেদং ভিন্ন	ভেদভিন্নং
২৯	৮	জপতে	জপ্যতে
৪০	৮	মাদকতার ক্ষণিক	লালসার ক্ষণিক উদ্দীপনা ও
৪২	১০	করে	সেরে
৫৩	শেষ	একটা	একটা গজিয়ে ওঠে
৬০	১০	সর্বাঙ্গজ স্তনমুঘাৎ	সর্বাঙ্গজং স্তনমুখাৎ
৬২	২	টাকা করে	টাকা
৬৩	১৮	পিঠাপিঠি	পিঠপিঠ
৬৩	২১	ক্রোধ না	ক্রোধন
৬৫	১৯	বলেই	ব'লেই
৮৩	শেষ	ফেনিয়ে না বলে	আর না ফেনিয়ে
৮৪	৫	একবার	এক একবার
৮৪	৬	মনে	মায়া মনে
৮৫	১৮	তার	তান
৮৭	৮	একটা	প্রথম শ্রেণীর
৯১	২৩	আগেই	আসেই
৯২	৩	কুকর্মের	কুচিন্তার
৯৭	১২	হয়েছে	হয়েছে তার
৯৭	১৫	ওর	এর
৯৮	২১	অন্ধকারে	ভাগবতে
১১০	১৪	ভবিষ্যতকে	ভবিতব্যকে
১১৫	শেষ	আসন	আমল

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৬	৩	নির্ভয়ের	নির্ভরের
১১৮	৬	guffow	guffaw
১২২	১১	পাটনা	তৃপ্তিপুর
১২২	২৫	শুনলাম	শুনেছিলাম
১২৩	২২	তৎ	তং
১২৫	৭,৮	বলল···চামচ ওঠাল	"না" ব'লে চামচ ওঠাল।
১৩১	১	ভূমিকা	পুনশ্চ
১৩১	২৩	যাই	চাই
১৪৪	১১	তোমায়	তোমারে
১৬০	১	পুনঃমূষিক	পুনর্মূষিক
১৬০	৭	সাঙ্গপাঙ্গ	সাঙ্গোপাঙ্গ
১৬৫	১৬	মধ্যে করে	মধ্যেকার
১৬৬	১১	ক্রিস্টালাইজ	ক্রিস্টালাইন
১৬৮	১৭	না একবার	বার্নার্ড শ একবার
১৬৯	৪	যোগাযোগে	যোগযাগে
১৬৯	১২	যোগাযোগ	যোগযাগ
১৭১	১৭	তবে	তাতে
১৭৪ ১৭৫		ইংরাজী উদ্ধৃতিটি পাদটীকা মাত্র অসিতের উক্তি নয়	
১৭৫	উনশেষ	প্রেরণায়	প্রেরণার
১৭৬	৫	চাইলেন	চাইছেন
১৭৭	১৭	এটা পর পর	পর পর
১৭৮	২২	করবেন	করতেন
১৭৯	১২	দেশেই	দেশেই যে,
১৮০	২৩	এলে বটে	টেনে আনলে বটে
১৮২	১৭	জাগাতে	জাগাতে চাই
১৮৩	২১	প্রভা	প্রজ্ঞা
		রঙ্গিন আঙ্গুল ভেঙ্গে	রঙিন আঙুল ভেঙে···পাঠ্য
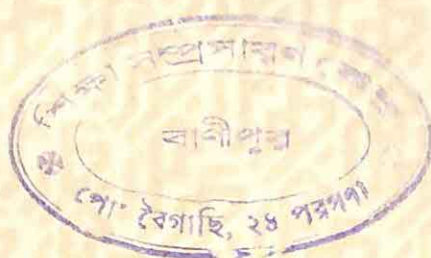
দিলীপকুমার রায়

জন্ম : কলকাতা, ২২শে জানুয়ারী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ

সাধক শ্রীঅরবিন্দের সন্তান প্রতিম দিলীপকুমার বর্তমান ভারতের অন্যতম জাগ্রত পুরুষ।

চৈতন্যের আবির্ভাবধন্য নদীয়া জেলায় ভক্ত শিরোমণি অদ্বৈত গোস্বামীজীর বংশে দিলীপকুমারের জন্ম। দেশপ্রিয় কবি ও নাট্যকার ৺দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পূজ্যপাদ পিতৃদেব। ঐতিহ্য সূত্রে তিনি গভীর সংস্কৃতি ও সাধনার অধিকারী।

আবাল্য সঙ্গীত-ভক্ত, বেদ, পুরাণ, মহাকাব্যের ঐশ্বর্যময় পরিবেশে লালিত দিলীপকুমার স্বভাবধর্মে সনাতন ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার ধারক বাহক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি ছিলেন সাহিত্য ও ভাবনার মধুর সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণ দিলীপকুমার সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন, তিনি সঙ্গীতের অন্যতম দিশারী এবং সাহিত্যে তাঁর অমূল্য অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

দিলীপকুমার ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁরা এই আশ্চর্য মানুষটির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

সঙ্গীত ও সাহিত্য, আলোকতীর্থ পথিক দিলীপকুমারের সাধনার দুই মার্গ। এই দুই বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ তাঁর যশস্বী লেখনী প্রসূত তাঁর অনুশীলিত ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠ এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সুষমার জন্য তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়। গুরু শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে তিনি তাঁর জীবনের ফলবান মুহূর্তগুলি অতিবাহিত করেছেন। গুরুর দেহ-রক্ষার পর তিনি তাঁর কন্যা প্রতিম শিষ্যা ইন্দিরা দেবী সহ বিশ্বের বহু-স্থানে ভ্রমণ করেন।

সঙ্গীতের মধ্যেই প্রসারিত ছিল তাঁর জয়যাত্রার পথ। বর্তমানে প্রাচীন মরমীয়া কবি-সাধকদের সঙ্গীতলীলার মধ্যে তিনি আত্মমগ্ন। পুণায় অবস্থিত হরিকৃষ্ণ মন্দিরে তিনি সর্বজনপ্রিয় দাদাজী এবং সেই স্থানে ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যানে ও নামগানে তিনি এক আলোকময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

অঘটনের শোভাযাত্রা
অঘটনের সূত্রপাত
করুণা অলৌকিকী
দিলীপকুমার রায়

রূপা

দশ টাকা

Cover Printed By Avenue Arts, 68 J. M. Avenue, Calcutta-5